শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

চরিত-সুধা

—অর্থাৎ—

শ্রীল শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের

জীবনচরিত

তৃতীয় খণ্ড

—:*:—

পঞ্চম সংস্করণ

—:0:—

প্রকাশক

শ্রীরামদাস বাবাজী

শ্রীধাম নবদ্বীপ

শ্রীতরুণ কুমার মণ্ডল, মোনালিসা প্রিণ্টার্স,
৮৩/৬, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

—০—

নিবেদন

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের কৃপায় এবং সাধুবৈষ্ণবগণের অনুগ্রহে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য **চরিত-সুধা** তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ শেষ হইয়া যাওয়ায় পঞ্চমবার মুদ্রাঙ্কণ করতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। সাধুমহাত্মাও সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, ভাষার অসংলগ্নতা বা অশুদ্ধি সংশোধনপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের পুণ্য চরিত-সুধা আস্বাদনেপরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

অলমতিবিস্তারেণ—

চৈতন্যাব্দ ৫০৩
বিজয়া দশমী

বিনয়াবনত
প্রকাশক

শ্রীগুরবে নমঃ

বন্দনা

দুর্গতান্ধ-কলিগ্রাহগ্রস্তানাং ক্ষুব্ধচেতসাম্
অশেষক্লেশহন্তারং করুণামৃতসেচনৈঃ।
শ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গমূর্ত্তিমৎপ্রেমবিগ্রহম্
করুণাসাগরং বন্দে শ্রীগুরুং দীনবৎসলম্ ॥

—*—

জয় জয় সিদ্ধিদাতা জয় গজানন।
কৃতাঞ্জলিপুটে করি চরণ বন্দন ॥
দেবী সরস্বতী জয় শঙ্করী শঙ্কর।
চরণে প্রণতি করি করুণা বিতর ॥
পতিতপাবন প্রভু গৌরনিত্যানন্দ।
অবনতশিরে বন্দি চরণারবিন্দ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ সঙ্গে সহচরীগণ।
ভক্তিভরে বন্দি সবার রাতুল চরণ ॥
করুণাসাগর প্রভু শ্রীরাধারমণ।
দয়াময় দীনবন্ধু অধমতারণ ॥
অধম পতিত জীবের দুর্গতি দেখিয়া।
উদ্ধার করিলা প্রভু ঘরে ঘরে গিয়া ॥
হাসিমুখে পাপতাপ অঙ্গীকার করি।
প্রেমামৃত পিয়াইলে শকতি সঞ্চারি ॥

সে সকল লীলা বর্ণিবার সাধ্য কার ।
নিজ লীলা নিজে প্রভু করহ প্রচার ॥
নবদ্বীপ দাদা ! পদে করি প্রণিপাত ।
নিজ জন জানি কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥
তোমাতে করিয়া প্রভু শকতি সঞ্চার ।
যত যত মহাপাপী করিলা উদ্ধার ॥
সে সব লীলার এক কণা প্রকাশিতে ।
অভিলাষ উপজিল অভাজন-চিতে ॥
নাহি ভাষাবোধ তবু লিখিতে বাসনা ।
যাহা ইচ্ছা কর, পদে করি এ প্রার্থনা ॥

—*—

সূচীপত্র

—*—

চরিত-সুধা

—ঃ**ঃ—

তৃতীয় খণ্ড

—ঃ**ঃ—

কটক যাত্রা

কটক জেলার অন্তর্গত মাহাঙ্গানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র ব্রহ্ম, বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার কটক সহরস্থিত বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীধাম পুরী আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা—বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার অন্তরঙ্গ দুই চারিজন মাত্র যান ; কিন্তু এ সম্বন্ধে বাবাজী মহাশয়ের নিকট কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস পাইতেছেন না। একদিন অপরাহ্নে আনন্দ বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে আজ কটক যাত্রা করিলে ভাল হয় না ?"

বাবাজী। হ্যাঁ, হবে হবে।

দুই চারিদিন যায়, একদিন আনন্দ বাবু বিশেষ আগ্রহসহকারে বলিলেন—"আজ্ঞে অনেক দিন হইয়া গেল। আজ রওনা হইলে ভাল হয় না কি ?"

বাবাজী। আজ বৃহস্পতিবার, আজ ধাম ছাড়িতে নাই।

আনন্দ। আজ্ঞে আপনারা মহাপুরুষ। আপনাদের আবার বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমা কি ? ও সমস্ত ত সংসারী লোকের পক্ষে।

বাবাজী। দেখ আনন্দ! এ সব বিষয়ে সংসারী বা উদাসী বলিয়া কোন কথা নয়। আমরা লোকাচার-প্রসিদ্ধির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া অনেক সময় ঐরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকি। ভাবিয়া দেখিলে সেটা আমাদের ভুল বই আর কিছুই নহে। আচ্ছা, এই বৃহস্পতিবারের কথাটাই আলোচনা করিয়া দেখ। বৃহস্পতিবারের অপর নাম গুরুবার। এই দিবসে কোথাও যাত্রা করিলে শ্রীগুরুদেবের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বৃহস্পতিবারের আর একটি নাম লক্ষ্মীবার। যে ধাম হইতে লক্ষ্মীবারে যাত্রা করা হয়, লক্ষ্মী সেই ধামেশ্বরকে পরিত্যাগ করেন। বল দেখি, এইটি কি কেবল গৃহস্থগত, না সাধুগত? সকলেরই গুরু আছেন। তাঁহার অসন্তোষে জগতের অসন্তোষের কারণ হয় না কি? আমি না হয় পরম বিরক্ত; আমার লক্ষ্মীর প্রয়োজন না থাকিতেও পারে; তাই বলিয়া ধামেশ্বরকেও কি লক্ষ্মী ত্যাগ করাইতে হইবে?

আনন্দ। আজ্ঞে এ কথাটি আমি ধারণা করিতে পারিলাম না। কারণ, আমি ক্ষুদ্র জীব; আমি সামান্য একটি কাজ করিলাম, সেই জন্য কি লক্ষ্মী ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাইবেন? তাহা হইলে ত শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে আমরা ইচ্ছা করিলেই বিয়োগ বা সংযোগ করাইতে পারি!

বাবাজী। এই লক্ষ্মী-ছাড়াইবার কথাটি কিরূপ—যেমন একাদশী-মাহাত্ম্যে আছে—

মৎশয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদি শূলং মমার্পয়েৎ॥

অর্থাৎ যাহারা আমার শয়ন, উত্থান এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে ফলমূল ও জল আহার করে, তাহারা আমার হৃদয়ে শূলবিদ্ধ করে। আমি জল খাইলাম, তাহাতে ভগবানের হৃদয়ে শূলাঘাত হইল, ইহার অর্থ কি?

অর্থ এই যে, উক্ত দিবসে ফলাদি আহার করিলে ভগবান্ শূলাহতবৎ দুঃখিত হন। তদ্রূপ বৃহস্পতিবারে স্থানান্তর গমন করিলে ভগবান্ লক্ষ্মী-দেবীর বিরহে যেরূপ কষ্ট অনুভব করেন, সেই জাতীয় কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব যে কার্য্যে ভগবানের কষ্ট হয়, সেই কার্য্য করা জীবের কখনও উচিত নহে।

আনন্দ। (করযোড়ে) প্রভু! এতক্ষণে বুঝিলাম যে আমাদের ব্যবহারিক কার্য্যাদির মধ্যেও অনেক মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকালে সঙ্গিগণকে বলিলেন, "দেখ, আনন্দ অনেকদিন বসিয়া আছে, আজ কটক যাইতে হইবে।" ললিতাদাসী জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে কে কে যাইবে?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "অনেক লোক যাইবার প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে চারি পাঁচজন যাইতে পার।" শুনিয়া আনন্দ বাবু মনে মনে আনন্দিত হইলেন। বুঝিলেন যে অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব আমার অন্তরের ভাব জানিয়াছেন। কে যে যাইবেন, ঠিক নাই; কাজেই সঙ্গিগণ কেহ বা আনন্দিত, কেহ বা চিন্তিত, কেহ কেহ বা দুঃখিত।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। বাবাজী মহাশয়ের কটক গমনবার্ত্তা শ্রবণে পুরীবাসী অনেক ভদ্রলোক ইঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে যত সত্বর হয় ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিবেন; কারণ আপনি পুরীধামে না থাকিলে আনন্দময় ধাম যেন নিরানন্দময় বলিয়া বোধ হয় এবং আমাদের যেন কিছুই ভাল লাগে না।" ইত্যাদি নানারূপ প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বাবাজী মহাশয় মধুর বাক্যে সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক খোল করতালযোগে নাম করিতে করিতে স্টেশনাভিমুখে রওনা হইলেন। মঠে একটী বৃদ্ধ বাবাজীকে রাখিয়া অন্য সকলেই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে গমন করিলেন। অনেক

বাবু-ভায়াগণও ইঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে স্টেশনে পেঁছিয়া বাবাজী মহাশয় একটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! গাড়ী ছাড়িবার কত বিলম্ব আছে?" ভদ্রলোকটি ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, দেড় ঘণ্টা দেরী আছে।" তখন বাবাজী মহাশয় একপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, যে যে আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর, ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া ঐ পার্শ্বে যাও।" শুনিয়া সকলেই ঐরূপভাবে অপর পার্শ্বে যাইতে লাগিলেন। মঠে সেবার উপযোগী লোক রাখিয়া আটাশ জনের যাওয়া স্থির হইল। উপস্থিত ঘটনায় আনন্দ বাবুর মনে একটু চিন্তার উদ্রেক হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে অন্ততঃ সাত আট জনের বেশী যাইবেন না। লোকসংখ্যা অতিরিক্ত দেখিয়া তিনি মনে মনে কি ভাবিতে-ছেন, এই সময় বাবাজী মহাশয় নিজের গামছাখানি সম্মুখে বিছাইয়া বলিলেন, "সকলে আমাকে কিছু কিছু ভিক্ষা দাও।" বলিবামাত্র উপস্থিত লোকসকল দুই এক টাকা করিয়া দিতে লাগিল। আনন্দবাবু যেমন কিছু টাকা দিতে গেলেন, অমনি বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আনন্দ! এখন থাক, যখন প্রয়োজন হইবে, আমি বলিব।" শুনিয়া আনন্দবাবু যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। বাবাজী মহাশয় বলরামবাবুকে টাকা পয়সা গণিতে বলায় তিনি গণিয়া বলিলেন, "তেইশ টাকা বার আনা হইয়াছে। ইহাতে ত্রিশ জনের কটক যাইবার ভাড়া হইতে পারে।"

এদিকে টিকিটের ঘণ্টা বাজিলে লোক সকল টিকিটের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এই সময় একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক অতি দ্রুত বেগে টিকিটের জন্য যাইতেছিলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! এই টাকা কয়টি লইয়া কটক যাইবার যে কয়খানা টিকিট হয় আনিয়া দাও ত।" ভদ্রলোকটি বিস্মিতভাবে স্থির হইয়া

দাঁড়াইলেন। বাবাজী মহাশয় পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা! ভাবিবার অবকাশ নাই, টিকিটের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়।" বলরামকে বলিলেন, "বলরাম! টাকাকয়টি উঁহার হাতে দাও ত।" বলরাম টাকাকয়টি ভদ্রলোকটির হাতে দিলে তিনি অগত্যা উহা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, আর এক একবার বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বাবুটি ইঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া পড়িলেন। প্রায় আধঘণ্টা অতীত হইতে চলিল—বাবুটি আসিতেছেন না দেখিয়া সঙ্গিগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কোথাকার অপরিচিত লোক, সে হয় ত টাকা লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।" কেহ বা বলিতেছেন, "মাদ্রাজী লোক, তাহাতে আবার জানাশুনা নাই। সে নিশ্চয়ই টিকিট করিয়া গাড়ীতে চাপিয়াছে।" কেহ বা বলিতেছেন, "বাবাজী মহাশয় যদি-আজ্ঞা করেন, তবে একবার এই সময় অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় তাহাকে ধরা যাইতে পারে।" ইত্যাদি আপন আপন মানসিক বৃত্তি-অনুযায়ী সিদ্ধান্ত লইয়া উপস্থিত সঙ্গীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি হে সিদ্ধান্ত-বাচস্পতিগণ! টাকার জন্য বড়ই ভাবিত হইয়াছ বোধ হয়।" কুঞ্জবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে ভাবনার বিষয়ই ত হইয়াছে। প্রায় আধ ঘণ্টার উপর হইল, কোন খবর নাই! সে কি আর আসিবে? কেন, আমরা এত লোক ত ছিলাম; আপনি আদেশ করিলে এতক্ষণ টিকিট আনিয়া গাড়ীতে উঠা হইত।" বাবাজী মহাশয় একটু ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "হাঁ, ওটা আমার বুঝিবার সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে; কারণ তোমরা পরিচিত লোক ছিলে; তোমাদিগকে দেওয়াই উচিত ছিল। আচ্ছা, বল ত কুঞ্জ! তুমি আমার কত জন্মের পরিচিত? যেদিন তোমাকে

প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেইদিন যদি অপরিচিত বলিয়া তোমাকে অবিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আর কি কখনও তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন হইত? তুমি কি বলিতে চাও—এই স্থূল দেহটির সঙ্গে দুই চারি দিন সংসর্গ হইলে পরিচয় হইয়া গেল? অপরের কথা ত দূরে; আচ্ছা তোমার নিজের সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছে কি? তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? তোমার স্বরূপ কি? কেন আসিয়াছ? তুমি কি জাতীয় লোক? বলিতে পার কি?

কুঞ্জ। কেন বলিতে পারিব না! আমার নাম কুঞ্জবিহারী রায়। আমি এই পুরীতে চাকরী করিতে আসিয়াছি। জাতিতে কায়স্থ, আমার নিজ জন্মস্থান হইতে চাকরী করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আমাদের পরিচয় কাগজে কলমে দিতে না পারিলে কোন চাকরীই মিলিবে না।

বাবাজী। বেশ কথা! বল দেখি, যখন মরা বলিয়া তোমাকে ঘরের বাহির করিবে, তখন তোমার এই সমস্ত পরিচয়ের কোনওরূপ অভাব হইবে কি? কায়স্থ কুলোদ্ভব, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, দশেন্দ্রিয়বিশিষ্ট কুঞ্জবিহারী রায় ত বর্ত্তমানই রহিয়াছে, তবে স্ত্রীপুত্র, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণ অস্পৃশ্য বলিয়া তোমাকে স্থানান্তরিত করে কেন? এমনকি, তখন তুমি এতই অশুচি হইবে যে, যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহারা পর্য্যন্ত এক মাস কাল অশৌচ ভোগ করিবে। এত সাধের যে পুত্রের সহিত তোমার পরিচয় ছিল, সে অকাতরে তোমার মুখে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। পিতা বলিয়া মমতা না করিয়া তোমার এমন সুন্দর দেহখানিকে ভস্মসাৎ করিবে। ইহাকে কি বলে পরিচয়? ইহাকেই কি তুমি সম্বন্ধ বা মমতা বলিতে চাও? কি ভ্রম! কি অবিদ্যার মোহময় কুহক! একটু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখ, সচ্চিদানন্দ আদিপুরুষ গোবিন্দের এক কণামাত্র লাভ করিয়া এত অশুচি অচেতন

পদার্থও জগতে অতি পবিত্র বোধে আদরণীয় হইতেছিল ; আবার তাঁহার অভাবে পূর্ব্ববৎ অচেতন অশুচি হইয়া পড়িল। সম্বন্ধ সচ্চিদানন্দ গোবিন্দের সহিত, পরিচয় তাঁহারই সহিত ; তাঁহার সত্তায় জগতের সত্তা। ভ্রমাচ্ছন্ন তুমি যাহাকে সংপ্রতি অপরিচিত মনে করিতেছ, সে হয় ত জন্মান্তরে তোমার পিতা বা মাতা, পুত্র কিংবা স্বামী অথবা স্ত্রী ছিল। আবার ভবিষ্যৎ জন্মে কে কাহার কি হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? জীবমাত্রেই একস্থান হইতে আসিয়াছে, আবার কালে একস্থানে যাইবে। শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস।" যদি সকলেই এক ভগবানের দাস হইলেন, তবে আবার অন্য পরিচয় লইয়া পরিচিত অপরিচিত ভেদ কোথায় রহিল? এ ত দূরের কথা। সংপ্রতি তোমাদের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সে ত সম্পূর্ণ অলীক। কারণ কাহারও স্বোপার্জ্জিত অর্থ আজ কটক যাইবার জন্য টিকিট ক্রয় করিতে দেওয়া হয় নাই। বুঝিয়া দেখ, ভগবান্ ইচ্ছা করিয়া কটক যাইবার জন্য টাকা দিলেন ; আবার তাঁহার যদি ঐ টাকা দ্বারা অপর কাহারও অভাব পূরণ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সে বিষয়ে তোমার আমার আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে? যিনি দাতা, তিনি তাঁহার দত্ত বস্তু দ্বারা যাহা করিতে ইচ্ছা করিবেন, সে বিষয়ে গ্রহীতার আপত্তি করার অধিকার নাই। আমার এমন কোন বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই যে অদ্য কটক না গেলেই চলিবে না। ইচ্ছাময় নিতাইচাঁদের যদি ইচ্ছা হয় লইয়া যাইবেন।"

এই কথা শুনিয়া সঙ্গিগণ সকলেই একটু অপ্রতিভ হইলেন। ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত মাদ্রাজী বাবুটি টিকিট লইয়া আসিলে তাহাকে দেখিবামাত্র সঙ্গিগণ আরও লজ্জিত হইলেন। বাবুটি ত্রিশ খানি টিকিট বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিগদগদভাবে ইঁহার চরণে দণ্ডবৎ

প্রণাম করিলেন। তৎপরে সকলে গাড়ীতে উঠিলে বাবুটি অবকাশ পাইয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বাবু। বাবাজী মহারাজ! আপনার কোথায় থাকা হয়?

বাবাজী। বাবা! কয়েকদিন প্রভু শ্রীজগন্নাথধামে রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি কটক লইয়া যাইতেছেন। কি উদ্দেশ্যে কোথায় লইয়া যাইবেন তিনিই জানেন।

বাবু। আজ্ঞে, আপনি কি কখনও আমাকে দেখিয়াছেন?

বাবাজী। জানি না বাবা! কোথাও দেখিয়াছি কি না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, কোন না কোন জন্মে অবশ্যই দেখাশুনা ছিল!

বাবু। আচ্ছা, আমি অপরিচিত বিদেশী লোক; আমাকে হঠাৎ দেখামাত্র আপনি কি বিশ্বাসে এতগুলি টাকা আমার হাতে দিলেন?

বাবাজী। বাবা! আমি ত আমার কোন নিজ সম্পত্তি তোমাকে দিই নাই। প্রভু আমাকে এই স্টেশনেই ইঁহাদের কটক যাইবার খরচ বাবদ কয়েকটি টাকা দিলেন। আমিও দেখিলাম, তুমি টিকিট কিনিতে যাইতেছ, তাই তোমাকে টাকাগুলি দেওয়া হইল। তোমার কি খুব কষ্ট হইয়াছে বাবা?

বাবু। আজ্ঞে না, আমার কোন কষ্ট হয় নাই। কেবল মনে মনে আপনার ব্যবহারটি ভাবিতেছিলাম। এইরূপ ব্যবহার মানুষে সম্ভবে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। আমার বিশ্বাস—আপনি মানুষ নহেন।

বাবাজী। বাবা! আমি মানুষ নহি, একথা বলিতে পার; কারণ মানুষের কর্ত্তব্য অনেক। মানুষ নিজ কর্ম্মবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারে; আবার বৈরাগ্যবলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব তৃণতুল্য পরিত্যাগ করিতেও পারে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ব্রজগোপীগণ মানুষ; কিন্তু আমরা সামান্য

জীব। মানুষে দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি থাকিতে পারে না। মানুষ কাম ক্রোধের দাস নয়। কেবল কুটুম্ব ভরণপোষণ বা নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য মানবদেহ নয়; মানবদেহ ভগবদ্‌ভজনের জন্য। নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্‌
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

দয়া ও ক্ষমা মানব দেহের ভূষণ। যে মানব নিজ সুখাভিলাষে পরসুখ বা পরের জীবন বিনাশ করিতে পারে, তাহাকে মানবের মধ্যে গণনা করা ভুল। আমরা মানব-দেহ ধারণ করিয়াছি সত্য; কিন্তু মানব-দেহের কর্ত্তব্যপালন আমাদের দ্বারা কিছুই হইতেছে না। তাই বলি বাবা! আমি মানুষ নই—সামান্য জীবাধম।

বাবু। আপনি যতই বলুন না কেন, আমাদের মনে হয় আপনি ভগবানের অবতার। বাবা! আমরা ত বিষয়ী; আমাদের কি সদ্‌গতি হইবার কোনও উপায় নাই? এমন মানবজন্ম কি বিফলেই কাটাইব? প্রভু কি আমাদের প্রতি একবার তাকাইবেন না? তবে ত ভগবানেও পক্ষ-পাতিত্ব দোষ বর্ত্তিল!

বাবাজী। বাবা! ভগবানে কখনই পক্ষপাতিত্ব দোষ সম্ভবে না। তিনি নিরপেক্ষ; সর্ব্বজীবে তাঁহার সমান দয়া। তাঁহার আপন-পর কেহই নাই। জীব নিজ নিজ কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। চন্দ্র সর্ব্বত্রই শীতল বিতরণে সকলের তাপ দূর করেন; কিন্তু বিরহি-জনের পক্ষে উহা অতিশয় তাপের কারণ হয় এবং সেই কিরণে পদ্ম ম্লান হইয়া যায়। কোকিলের সুমধুর রবে কাহার শ্রবণ পরিতৃপ্ত না হয়?

কিন্তু বিরহি-হৃদয়ে উহা বজ্রনাদসম বোধ হয়। এটিকে কি তুমি চন্দ্র বা কোকিলের পক্ষপাতিত্ব বলিতে চাও? ভগবান্ যদি প্রিয় বা অপ্রিয়জ্ঞানে জীবকে অনুগ্রহ-নিগ্রহই করিতেন, তবে কি পুতনাকে ধাত্রীগতি প্রদান সম্ভব হইত? তাই বলি বাবা! ভগবান্ সংসারে বিষয়-ভোগ করিতে দিয়াছেন, কর; কিন্তু অভিমান-মদিরাপানে মত্ত হইও না। ভগবান্‌কে লইয়া বিষয় ভোগ কর। কৃষ্ণ-দাসদাসী জ্ঞানে পুত্রকন্যার লালন পালন ও যত্ন কর। অপরের অনিষ্ট চেষ্টা না করিয়া ভগবদ্দত্ত বস্তু অনাসক্তভাবে উপভোগ কর। সংসারাশ্রমের যে যে কর্ত্তব্য শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, অবিচারে তাহা পালন করিতে যত্নবান্ হও। পিতৃঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধ করিবার জন্য উদ্‌যোগী হও, এই সংসারই সুখের আগর হইবে, এই বিষয়ই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধক হইবে, এই স্নেহ-মমতাই তোমাকে অপ্রাকৃত সম্বন্ধরাজ্যে লইয়া যাইবে। এই স্ত্রীই তোমার গোপীভাবে কৃষ্ণসেবার শিক্ষাগুরু হইয়া অনুকুল আচরণ করিবে। জীব নিজেই নিজের অনিষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমবশতঃ অপরের দোষ দিয়া ভগবানের নিকট অপরাধী হয়।

এতক্ষণ গাড়ী চলিতেছিল। বাবুটি নীরবে বাবাজী মহাশয়ের উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন। হঠাৎ গাড়ী থামিলে বাবাজী মহাশয়ও চুপ করিলেন; বাবুটির হৃদয়ের বাঁধও ভাঙ্গিয়া গেল, একেবারে অধৈর্য্য হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বাবাজী মহাশয়ের চরণ দুইখানি বুকে ধরিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, বাবা! এত দিনে আমার কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচিল। আপনার কৃপায় আমি পরম শান্তিলাভ করিলাম। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মে জন্মে আপনার শ্রীচরণের দাস হইয়া পরম পুরুষ ভগবানের সেবা করিতে পারি।" বাবাজী মহাশয় বাবুটিকে আলিঙ্গন প্রদানে

সুস্থ করিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কোন্ ষ্টেশন ?"

সে বলিল, "আজ্ঞে কটক ষ্টেশন।"

বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া সঙ্গিগণসহ গাড়ী হইতে নামিলেন। বাবুটি কলিকাতার টিকিট করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনিও নামিলেন।

আনন্দ বাবু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে গাড়ী হইয়াছে, আসুন গাড়ীতে উঠিবেন।"

বাবাজী মহাশয় আনন্দবাবুকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "আনন্দ! তুমি তোমার বাসায় যাও, আমি অন্য সময় তোমার ওখানে যাইব। আজ আর তোমার বাসায় যাওয়া হইবে না।"

আনন্দবাবু বলিলেন, "বাবা! কটকে ত অন্য কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় নাই ; এত রাত্রে কোথায় যাওয়া হইবে ? আহারাদিরই বা কিরূপ ব্যবস্থা হইবে ?"

বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন নিতাইর ইচ্ছায় কাঠজুড়ি নদীর জল ত আছে! তাহার তীরে বড় বড় গাছগুলিও ত আছে! চিন্তা কি ?" এই বলিয়া ষ্টেশনের পার্শ্ববর্ত্তী একটি স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মাদ্রাজী বাবুটি প্রাণের আবেগে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সকলে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কাঠজুড়ি নদীর তীরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে নদীতীরবর্ত্তী বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অগ্রে অগ্রে দুইখানি খোল বাজিতেছে। পশ্চাতে বাবাজী মহাশয় প্রেমোন্মত্তভাবে চরণে চরণ রাখিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন। সঙ্গে প্রায় ত্রিশজন লোক। কাহারই বাহ্যদৃষ্টি নাই—

সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য-পরায়ণ। ক্রমে স্থানীয় লোক সকল আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। নূতনধরণের সংকীর্ত্তনের দল দেখিয়া এবং নূতন রকমের নাম শুনিয়া লোকসংখ্যা যতই অধিক হইতে লাগিল, সংকীর্ত্তনের ধ্বনিও যেন ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে লাগিল।

—*—

ভূতের বাড়ীতে বাসা

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা অতীত হইতে চলিল, এই সময় জনৈক ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গী ভীমচন্দ্র সিংহ নামক একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাইবেন?"

তিনি বলিলেন, "যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।"

শুনিয়া পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কৌতুকী ব্যক্তিহাসিতে হাসিতে বলিল, যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকে, তবে ভূতের বাড়ী বাসা করিলেইত ভাল হয়।" 'ভূতের বাড়ী' কথাটা বাবাজী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইবামাত্র ইনি একটু উৎসাহের সহিত সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! ভূতের বাড়ীটি কোথায়? আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিবে কি?"

লোকটি এবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা পারি বই কি! এই সোজা রাস্তা ধরিয়া বালুবাজারের মধ্যে উকীল তিনকড়িবাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া তিন চারিখানি বাড়ী অতিক্রম করিলেই কৃষ্ণ পালিতের যে

দোতলা বাড়ীখানি আছে, ঐ বাড়ীটিই ভূতের বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বাড়ীতে কেহই বাস করিতে পারে না। তবে আপনারা সাধু; আপনাদের কথা বলিতে পারি না।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় নির্দিষ্ট রাস্তা ধরিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা নাই; বহুদিনের সুপরিচিতের ন্যায় একেবারে সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি কাপড়ের দোকানের মালিক শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ চৌধুরী নামক জনৈক বৃদ্ধ ভক্ত সংকীর্ত্তনের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা! এই বাড়ীর মালিকের নিকট হইতে চাবি আনিয়া বাড়ীটির দরজা খুলিয়া দিতে পারিবে কি?"

হৃদয়বাবু। আজ্ঞে এ বাড়ীতে কেহ বাস করিতে পারে না।

বাবাজী। সেই জন্যই আমাদের এত আগ্রহ।

শুনিয়া হৃদয় বাবু অতি দ্রুতগতি কৃষ্ণ পালিতের বাড়ী হইতে চাবি আনিয়া বাড়ীটির দরজা খুলিয়া দিলেন। ইঁহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রতি ঘরে সংকীর্ত্তন করতঃ ছাদের উপর গিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলের পদভরে ছাদটি এরূপভাবে কম্পিত হইতেছে যে, বোধ হইতে লাগিল যেন অবিলম্বেই উহা ভূমিসাৎ হইবে। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ দোতলার একটি ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অন্যান্য সঙ্গিগণ কেহ কেহ দোতলায়, কেহ কেহ বা নীচের তলায় নিজ নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা! যে বাড়ীর নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া লোক চলাচল করিতে ভীত হইত, আজ সেই বাড়ীর উপর নীচ লোকে লোকারণ্য! সকলেই আনন্দময়! আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে ইঁহাদের সমালোচনা। কেহ বা দম্ভ করিয়া বলিতেছেন, "রাত্রে দেখা যাইবে। কত কত লোক

দেখিলাম—কত কত সাহসী মুসলমান পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়া গেল ; ইহারা ত সামান্য বৈরাগী।" কেহ বা বলিতেছে, "ভাই! ঐ যে দীর্ঘাকার বাবাজীটি, উঁহাকে দেখিলে যেন ভক্তির উদ্রেক হয়। আমার বিশ্বাস—উনি কোন মহাপুরুষ।" কেহ বা বলিতেছে, "কত কত মহাপুরুষ দেখিলাম। ভূত প্রেতের কাছে মহাপুরুষগিরি খাটিবে না।" ইত্যাদি ভাবে সমালোচকগণ যাহার মুখে যাহা আসিতেছে, সে তাহাই বলিতেছে। কয়েকটি ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইত্যবসরে হৃদয়বাবু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা! আদেশ হয় ত কিছু চা'ল ডা'ল আনিয়া ভোগের যোগাড় করিয়া দিই।"

বাবাজী। ইচ্ছাময় নিতাইচাঁদের ইচ্ছা।

হৃদয়বাবু। আজ্ঞে, কত কি আনিতে হইবে?

বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে দেখাইয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার ইচ্ছা হইলে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা হয় ব্যবস্থা করিতে পার। আমাকে ও সব জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।" অবসর বুঝিয়া ললিতা-দাসী রান্নার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় বৃদ্ধ হৃদয়বাবুকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কাজে কাজে তিনি সকলেরই বাবা হইলেন। তিনি সকলকেই সন্তান-বাৎসল্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে হৃদয়বাবু নীচে নামিয়া নিজ কন্যার ন্যায় ললিতা দাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া বাজার হইতে চা'ল, ডা'ল, তরকারী প্রভৃতি ভোগের দ্রব্য আনিতে লাগিলেন। রান্না আরম্ভ হইল। ইঁহাদের যাহার যাহা প্রয়োজন, হৃদয় বাবু সমাধা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ বাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, আপনি আদেশ করেন ত আমি একটি বাসা স্থির করিয়া দিই। কারণ আমার এই বাড়ীতে অপদেবতার অত্যাচারে কেহই বাস করিতে পারে না।

আপনারা বিদেশী, তাহাতে বৈষ্ণব; আপনাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে আমার ঘোরতর অপরাধ হইবে।"

বাবাজী। ভয় কি ভাই! আমরাও অপদেবতা বিশেষ, দেখা যাক্ নিতাইচাঁদ কি খেলা খেলেন! সে একা ভূত—আমরা অনেক ভূত। পঞ্চ ভূতে সকলেরই দেহ গড়া, তবে ভূতকে এত ভয় করিলে চলিবে কেন? আচ্ছা দুই একদিন যাক্, পরে যদি দরকার হয়, ব্যবস্থা করা যাইবে। তুমি যেন ভাই মনে কিছু দুঃখ করিও না।

কৃষ্ণ। আমি না হয় বুঝিলাম, কিন্তু আমার মা ঠাকুরাণী ত কিছুতেই বুঝিবেন না। তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

বাবাজী। আচ্ছা, তিনি তোমারও মা, আমারও মা,। সন্তানের কথা তাহাকে বলিও, তিনি অবশ্য বুঝিবেন। তিনি পতিব্রতা সতী। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলে কোনই ভয়ের কারণ নাই।

এইরূপ মিষ্টবাক্যে বাবাজী মহাশয় কৃষ্ণবাবুর মনস্তুষ্টি করত তাঁহাকে মায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। ক্রমে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহাদের সহিত নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনায় বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। সকলের অনুরোধে স্নানাহ্নিকাদি করিয়া ঠাকুরের ভোগের পর মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় আগন্তুক ভক্তবৃন্দের সহিত নানারূপ ভগবৎকথা প্রসঙ্গে সন্ধ্যা হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

লোকে লোকারণ্য। লোক সকল চারিদিক্ হইতে যেন আত্মহারা ভাবে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আজ আর ভূতের বাড়ী বলিয়া কাহারও মনে ভয় নাই। শ্মশানতুল্য স্থান আজ আনন্দকাননে পরিণত হইল। দলে দলে লোক আসিতেছে—আবার দলে দলে যাইতেছে। রাত্রি দশটা অতীত হইয়া গেল—কাহারও হুঁস নাই—সকলেই আত্মহারা—সকলেই যেন কি এক অভিনব ভাবে বিভাবিত। সকল শ্রেণীর লোকই

আসিতেছে। কেহ বা ভূতের বাড়ীতে সাধু আসিয়াছে শুনিয়া তাহাদের কিরূপ অবস্থা, কিরূপ ব্যবস্থা এই সমস্ত পরীক্ষা করিতে আসিতেছে। কেহ বা বাবাজী মহাশয়কে একজন ভূতের ওঝা ভাবিয়া মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা কিরূপভাবে বাড়ী শোধন করেন, তাহা দেখিবার জন্য আসিতেছে। আবার কেহ কেহ ইঁহাদের উপর ভূতের অত্যাচার দেখিতে আসিতেছে। যে যে অবস্থায় আসুক না কেন, আসিয়া দেখে সবই বিপরীত। বাবাজী মহাশয় একটি ঘরে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছেন এবং সঙ্গিগণ ইঁহার দোহারকি করিতেছে। বাড়ী শোধনও নাই—তন্ত্রমন্ত্রও নাই। সকলেই দেখিয়া অবাক। কোন কোন ব্যক্তি বা বলিতেছে, "আচ্ছা দেখা যাবে, দুদিন যাক না! আপনিই সমস্ত বুজরুকী বাহির হইয়া পড়িবে।" এইরূপ যাহার যেরূপ মনোবৃত্তি, সে সেইরূপ বলিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে নামকীর্ত্তন সমাপ্ত করতঃ সকলের সহিত নানাবিধ ইষ্টালাপ করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। সকলে অবেলায় আহার করার দরুণ সে রাত্রে আহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও হৃদয়বাবু কিছু মিষ্টি আনিয়া দিলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়া সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক অবশেষ হৃদয়বাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর আপন আপন রুচি অনুসারে কেহ উপরে কেহ বা নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। যে ঘরে কীর্ত্তন হইতেছিল, বাবাজী মহাশয় সেই ঘরে শয়ন করিলেন। সেবার জন্য দুইচারিজন মাত্র ইঁহার নিকট রহিলেন।

শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জীউর বাড়ীতে

অষ্টপ্রহর

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে লোকসংঘট্ট বাড়িতে লাগিল। কেহ বা কীর্ত্তন শুনিতে, কেহ বা রাত্রে ইঁহাদের উপর কোনও অত্যাচার হইয়াছে কি না তাহারই অনুসন্ধান, আবার কেহ বা বাবাজী মহাশয়কে পরীক্ষা করিবার জন্য, কেহ বা কৌতুক দেখিবার জন্য ইত্যাদি নানাভাবে নানাশ্রেণীর লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। বাবাজী মহাশয় কিন্তু আত্মানন্দী; যে, যে ভাব লইয়াই ইঁহার নিকট আসিতেছে, ইনি সকলকেই প্রীতির চোখে দেখিতেছেন এবং ভগবানের আরাধনাই যে মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, কীর্ত্তনে ইহাই সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেল।

এইরূপে বেলা অনুমান আটটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিবেন, এই সময় হৃদয়বাবু বলিলেন, "বাবা! আমাদের বিনোদবিহারী জীউকে দর্শন করিতে যাইবেন কি?" বাবাজী মহাশয় বিশেষ উৎসাহিতভাবে বলিলেন, "চলুন বাবা! এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা!" ঐই বলিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম ধরিয়া সদলে বাহির হইলেন। বাজারের মধ্য দিয়া যখন কীর্ত্তন যাইতেছে, তখন দোকানী পসারী দোকান ফেলিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতেছে। কীর্ত্তনানন্দে এক এক স্থানে এরূপ লোকসংঘট্ট হইতেছে যে, কাহারই যেন সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যদিও

বালুবাজারের মধ্যেই বিনোদবিহারী জীউর মন্দির, তথাপি কীর্ত্তন লইয়া মন্দিরে যাইতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। ক্রমে বহুলোক-সমভিব্যাহারে বিনোদবিহারী জীউর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সকলেই রাধাবিনোদ জীউর অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় প্রেমবিহ্বলভাবে ভাব-গদগদকণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিলেন ঃ—

(হের দেখ) বিনোদ নাগর রায়।
(উহার) বিনোদ চিকুরে, বিনোদ বরিহা,
দুলিছে বিনোদ বায়॥
বিনোদ নয়ানে, বিনোদ চাহনি,
বিনোদ টেরছ ছাঁদে।
বিনোদ নাসায়, বিনোদ মুকুতা,
হেরিয়া পড়িনু ফাঁদে॥
বিনোদ অধরে, বিনোদ হাসি
বিনোদ বিনোদ বোল।
বিনোদ বাঁশের, বিনোদ বাঁশরী,
বিনোদ বিনোদ রোল॥
বিনোদ গলায়, বিনোদ মালা,
বিনোদ বিনোদ দোলে।
কোন্ বিনোদিনী, বিনোদ গাঁথনি,
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে॥
বিনোদ হেলন, বিনোদ দোলন,
বিনোদ বাঁকুয়া শ্যাম।
বিনোদ কটিতে, বিনোদ ধটী,
বিনোদ বিনোদ ঠাম॥

বিনোদ চরণে, বিনোদ নূপুর,
বিনোদ বিনোদ বাজে।
বিনোদ বসনে, বিনোদ ভূষণে,
বিনোদ বিনোদ সাজে ॥
বিনোদের বামে, শোভে বিনোদিনী,
বিনোদ মোহন রূপ।
(জনু) চাঁদে চকোরিণী, জলদে দামিনী,
পীরিতি রসের কূপ ॥
আহা মরি মরি, যুগল মাধুরী,
ছটায় ভুবন তোলে।
(জনু) শ্যাম সরোবরে, হেম কমলিনী,
রসের হিল্লোলে দোলে ॥

এইরূপে স্বরচিত বহু বহু পদ গান করিতে লাগিলেন। বিনোদ-বিনোদিনীর অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে যেন প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। উপস্থিত লোক সকল ইঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তনপ্রভাবে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল। আনন্দের অবধি নাই। ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইল বাবাজী মহাশয় ভক্তগণের মন জানিয়াই যেন কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ বিনোদবিহারী জীউর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। সকলে ইঁহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিলে হৃদয়বাবু বলিলেন, "বাবা! বিনোদবিহারী জীউর সম্মুখে অহোরাত্র নামকীর্ত্তন হয়, আমার প্রাণে এই বাসনার উদয় হইয়াছে। এখন আপনার কৃপা।

বাবাজী। ভক্তের ইচ্ছা হইলেই ভক্তবৎসল নিতাইচাঁদ অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিবেন। আনন্দময় শ্রীরাধাবিনোদ জীউর নিকট আসিবা মাত্র আমার মনে হইয়াছিল যে, এইস্থানে একদিন অষ্টপ্রহর নামসংকীর্ত্তন

হইলে ভাল হয়। যাহা হউক, নিতাইচাঁদ ভক্তের হৃদয়ে সেই ইচ্ছার উদয় করাইয়াছেন—পরম আনন্দের কথা।

হৃদয়বাবু। আজ্ঞে আমরা ত কিছুই জানি না। কিরূপ কি যোগাড় করিতে হইবে?

বাবাজী। কাল প্রাতঃকাল হইতে পরশ্ব প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নাম-কীর্ত্তন চলিবে। কখনও বিরাম দেওয়া হইবে না। অন্য আর কিছুর প্রয়োজন নাই; একটি তুলসী বৃক্ষ, পাঁচটি কলসী এবং দুই একখানি চিত্রপট হইলেই হইবে।

এই কথা শুনিয়া হৃদয়বাবু বিশেষউৎসাহিতভাবে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সেদিন ইঁহাদের বিনোদবিহারী জীউর মন্দিরেই মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল। মহাপ্রসাদ পাইয়া সকলে বাসায় আসিলেন।

সন্ধ্যার পর অধিবাস কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে কটকে কখনও এইরূপভাবে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হয় নাই; কাজেই লোকসকল নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করিতে করিতে বিনোদবিহারী জীউর বাড়ীতে গিয়া অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আনন্দের অবধি নাই। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন প্রাতে নাম আরম্ভ হইল। অপূর্ব্ব আকর্ষণ! কি হিন্দু, কি মুসলমান, যে কেহই নাম শুনিতে বা ইঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে আসিতেছে, সেইঠিকচুম্বকাকৃষ্ট লৌহেরন্যায় কীর্ত্তনে যোগদান করিতেছে। স্কুলের ছেলেরা দূরে থাকিয়া নাম শুনিতেছিল, হঠাৎ একেবারে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া নাচিতে লাগিল। কাহারও

হাত হইতে বই পড়িয়া গিয়াছে—চৈতন্য নাই ; কেহ বা বই হাতে করিয়াই উন্মত্তভাবে নাচিতেছে ; কেহ কেহ বা প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া জামা জুতা সহই কীর্ত্তনের মধ্যে গড়াগড়ি দিতেছে। কি গৃহস্থ, কি উদাসী, কি বালক, কি বৃদ্ধ—কাহারই দেহস্মৃতি নাই। সকলেই যেন গ্রহগ্রস্তের ন্যায় আবিষ্টভাবে নৃত্য করিতেছে, আর "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতেছে। বিনোদ-বিহারী জীউর মন্দিরে আজ যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। ঠাকুরের সম্মুখে কীর্ত্তন। তিনি যেন আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। যে একবার যুগল চন্দ্রবদন দর্শন করিতেছে, সেই বলিতেছে, "কি আশ্চর্য্য ! আমরা ত চিরদিনই রাধাবিনোদজীউকে দর্শন করিয়া থাকি ; কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব হাসি, অপরূপ রূপলাবণ্য ত আর কখনও দেখি নাই। দেখিলেই বোধ হয় যেন ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন।" ক্রমে বেলা যতই অধিক হইতে লাগিল, লোকসংখ্যাও ততই বাড়িতে লাগিল। নামের ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইল। প্রেমময়ের কৃপায় সকলেই যেন প্রেমময় হইয়া গেল।

আজ বিনোদবিহারী জীউর বাড়ীতে প্রেমানন্দের বাজার বসিয়াছে। কে আর সেই নিরানন্দময় বালুবাজারে যাইবে ? কাজেকাজেই বিনোদ-বিহারী জীউর বাড়ীতেই বাজার। একদিকে নামের বাজার, প্রেমের বাজার, আনন্দের বাজার এবং সাধু-সজ্জনের বাজার বসিয়াছে ; আবার অপর দিকে শাকওয়ালী শাক লইয়া বিভোরভাবে কীর্ত্তন শুনিতেছে। মুটে মোট মাথায় করিয়া চিত্তপুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহ বা বাজার করিয়া বাড়ী যাইতে যাইতে বিনোদবিহারী জীউর বাড়ীর আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে ; বাড়ীর কথা মনে নাই—হাতে বাজার, কীর্ত্তনেনৃত্য করিতেছে। গোয়ালা দুধ লইয়া যাইতেছিল,নামের আকর্ষণে দুধের কলসী কাঁধে করিয়াই নৃত্য করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য !

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংগ্রাম উপস্থিত। নিবৃত্তির আকর্ষণে প্রবৃত্তির দাস দাসীগণ প্রবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়াই নিবৃত্তির চরণে শরণ লইতেছে।

বাবাজী মহাশয় কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে ভগবৎকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল; কিছুই আহার হয় নাই—লীলাকথায় মাতিয়া গিয়াছেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু কিছুই বলিতে সাহস পাইতেছেন না। এমন কি, যেরূপভাবে লোকজন চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছে, তাহাতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট যাওয়াই দুঃসাধ্য। সকলেই চিন্তিত।

এইসময় ঈষৎ-অবগুণ্ঠনবতী একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক একহস্তে একটি দুধের বাটি অপর হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নপূর্ণ একখানি থালা লইয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহার দুইটি চোখে জল; দেখিবামাত্রই বোধ হয় যেন বাৎসল্যের মূর্ত্তি স্নেহময়ী মা যশোমতী। উৎকণ্ঠাভরে বাবাজী মহাশয়ের দিকে এক এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, আর যেন সকলের মনপ্রাণ বাৎসল্যরসে ডুবাইয়া দিতেছেন। কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না; আপনা-আপনিই সকলে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। ক্রমে মা আমার বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া থালাখানি একপার্শ্বে রাখিলেন এবং বামহস্তে ইঁহার মস্তক ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে দুধের বাটিটি মুখে ধরিলেন। ইনিও ঠিক পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় মায়ের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। মা ছেলেকে দুধটুকু পান করাইয়া একটি একটি করিয়া মিষ্টি কয়টি খাওয়াইলেন। যেমন খাওয়ান শেষ হইল, অমনি চারিদিকে চাহিয়া লজ্জাবনতমুখী মা আমার মাথার কাপড় টানিলেন। তখন যেন কি করিয়া কাহার সঙ্গে এতটা অপরিচিত পথ চলিয়া আসিলেন এবং কি করিয়া বাহিরে যাইবেন ইত্যাদি চিন্তায়

উঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। উপস্থিত জনগণ সকলেই সেই বাৎসল্যের প্রতিমাখানিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আপনি নিঃসঙ্কোচে এই রাস্তায় চলিয়া আসুন। জগৎ আপনার সন্তান, আপনি জগৎমাতা, ভয় কি?" তখন মা অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বিনোদবিহারীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! ইনি কে? এরূপ অপূর্ব্ব ভাববিহ্বলতা আমরা ত আর কখনও দেখি নাই!"

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ইনি মাণিক ঘোষ বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত মহাশয়ের পত্নী। ইঁহারা জাতিতে গন্ধবণিক্। এমন অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসের মূর্ত্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। সর্ব্বদা ভাব-নিমগ্না। উঁহার বাড়ীতে গোবিন্দদেবের সেবা আছে। বাৎসল্যময়ী মা আমার বাৎসল্যভাবে গোবিন্দের যেরূপ সেবা করেন, দেখিলে অতি-বড় পাষণ্ডীরও হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। ব্যক্তিগত লক্ষ্য নাই; যে কেহই বাড়ীতে উপস্থিত হউক না কেন, তাহাকে কিছু না কিছু খাওয়ান চাই। এই নির্হেতুক বাৎসল্যরসের স্থান একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীগুরুকৃপায় এই প্রেমের এক কণাও যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনি জগৎপূজ্য। বাৎসল্যভাবের নিকট কাম পরাভূত, মধুর ভাব লজ্জিত, ঐশ্বর্য্যভাব সুদূরে পলায়িত, জাতিকুলমান তিরোহিত এবং ভেদজ্ঞান ভয়ে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। বাৎসল্যপ্রেমে সংকোচতা নাই।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে প্যারীবাবু আসিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার মা যেমন শুনিল যে এত বেলা পর্য্যন্ত তুমি কিছুই খাও নাই, অমনি খাবার হাতে করিয়া দ্রুতগতি বাহির হইল। আমি গাড়ী বা পাল্কী করিয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কিছুতেই সে মানিল না। কি আশ্চর্য্য! সে স্নানের জন্য নদীতে

যাইবার সময় রাস্তা ভুলিয়া যায়—সঙ্গে লোক না লইয়া যাইতে পারে না, সে আজ এতটা অপরিচিত পথ এরূপ নিরপেক্ষভাবে নিঃসঙ্কোচে চলিয়া আসিল যে, আমি চেষ্টা করিয়াও উহার সঙ্গে আসিতে পারিলাম না। ইহার এত দ্রুত চলন আমি আর কখনও দেখি নাই।" শুনিয়া উপস্থিত সকলেই অবাক্! বাবাজী মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! মা আমার বাৎসল্যের সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। অনুরাগবাতাসে উৎকণ্ঠা-রূপ তরঙ্গ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, অপরিচিত পথও অতি শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছেন। কুলমানমর্য্যাদা বাৎসল্যের নিকট লজ্জিতভাবে দূরে পলায়ন করে। মা যেন বাৎসল্যময়ী মা যশোমতীর প্রতিমূর্ত্তি! আমরা পরম ভাগ্যবান্ যে এ হেন বাৎসল্যের মূর্ত্তিখানির বাৎসল্য পাইয়াছি।" শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আমরা জীবনে এরূপ বাৎসল্যভাব আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই—করিব বলিয়া আশাও ছিল না। কেবল আপনার কৃপায় এই সৌভাগ্য হইল।"

এইরূপ নানা কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয় বিনোদবিহারীর মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে নাম করিবার জন্য সঙ্গিগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। সকলেই স্ব স্ব সময় অনুসারে নাম করিতে লাগিল। কোথা দিয়া যে দিবারাত্র কাটিয়া গেল, কাহারই সংজ্ঞা নাই। শেষ রাত্রে ভৈরবী-রাগিণীতে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নামগান হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব আনন্দ! মধুময় নাম, মধুময় স্বর, মধুময় সময়, মধুময় সঙ্গত, মধুময় তানে মনপ্রাণ মাতিয়া গেল। সকলেই মাতোয়ারা! বাবাজী মহাশয় এক একবার চরণে চরণ রাখিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। ইঁহার বিশাল দেহখানি নৃত্যকালে যেন নাচের পুতুলের মত চলিতেছে। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ইঁহার ভুবনমোহন নৃত্যদর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইভাবে বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। কাহারই ইচ্ছা হইতেছে

না যে, নাম সমাপ্ত হয় বা এ হেন আনন্দ ভঙ্গ হয়। জানি না ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা! বেলা দশটার সময় বাবাজী মহাশয় ঐরূপভাবে নৃত্য করিতে করিতে সদলে বাহির হইলেন। সঙ্গে অসংখ্য লোক। কটকবাসীর নিকট ইঁহাদের ভাবভঙ্গি, চলন-বলন, কীর্ত্তন-নর্ত্তন সকলই যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। সকলেরই প্রাণে নূতন উৎসাহ। বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষ সকলেই একবাক্যে বলিতেছে, "আহা মরি! কি অপূর্ব্ব আনন্দ! কি সুমধুর কীর্ত্তন! কি মনোহর নৃত্য! আমরা বহু বহু গান শুনিয়াছি বা নৃত্য দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক প্রভাব আর কখনও অনুভব করি নাই।" ক্রমে নগর পরিভ্রমণপূর্ব্বক বিনোদ-বিহারীর অঙ্গনে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া কাঠজুড়ি নদীর জলে স্নান করিতে গেলেন। কাঠজুড়ি নদীর জল এবং তীরবর্ত্তী ভূমি সকল দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কাঠজুড়ি নদীটিকে আমার ঠিক গঙ্গা বলিয়া মনে হয়। এমন নির্ম্মল জল এবং এরূপ অপূর্ব্ব শোভা সাধারণ নদীতে প্রায়ই দেখা যায় না।"

বাবাজী মহাশয় যতদিন কটকে অবস্থান করিতেন, কাঠজুড়ি নদীর জল ভিন্ন অন্য কোন জল ব্যবহার করিতেন না। এমন কি, কাঠজুড়ি নদীতে স্নানকালে তিনি গঙ্গার স্তব পাঠ করিতেন। ক্রমে স্নান শেষ করিয়া নাম করিতে করিতে বিনোদবিহারী জীউর মন্দিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আহ্নিকাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে বিনোদবিহারী জীউর ভোগরাগ শেষ হইলে বহু ভক্তগণ সঙ্গে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সদলে বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

—*—

স্বামী কেশবানন্দের সহিত মিলন

একদিন অপরাহ্নে একটি লোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "আজ্ঞে, কাশী হইতে একজন সাধু আসিয়াছেন। তিনি আপনার সহিত দেখা করিতে চান।"

শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে বলিলেন, "বাবা! তিনি কোথায় আছেন? চল, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব।"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে, তিনি শ্রীযুক্ত বনবিহারী পালিত মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন, চলুন।"

শুনিয়া বাবাজী মহাশয় লোকটির সঙ্গে বনবিহারী বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর দর্শনমাত্র বাবাজী মহাশয় নমস্কার করিলেন। স্বামীজীও প্রতিনমস্কার করতঃ নিকটে বসাইয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

বাবাজী। এ দাসকে সকলে রাধারমণ চরণ দাস বলিয়া থাকে।

স্বামীজী। কোথায় থাকা হয়?

বাবাজী। থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। তবে অনেক দিন শ্রীজগন্নাথদেব নিজ ধামে রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি জানি না কি উদ্দেশ্যে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

এইরূপ নানা কথোপকথনের পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, গৌরাঙ্গদেব কেশব ভারতীর নিকট শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া গৈরীক বসন ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মালা-তিলকাদি কিছুই ছিল না, তবে তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভ্র বসন পরিধান এবং শিখাসূত্র-মালা-তিলকাদি ধারণ কোথা হইতে আসিল?

বাবাজী। বাবা! ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার আচরণ জীবের আচরণীয় হইতে পারে না। তিনি জীবকে যেরূপভাবে চলিতে শিক্ষা দিয়াছেন, আমাদের সেইরূপ ভাবে চলাই কর্ত্তব্য। বিশেশতঃ ভবিষ্যতে লোকের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হয়, এই ভয়ে মহাপ্রভু তাঁহার নিজ মতাবলম্বী সম্প্রদায়কে মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারিভাগে বিভক্ত;—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য। এই চারি সম্প্রদায়ই শুভ্র বসন ও শিখাসূত্র-মালাতিলকধারী।

স্বামীজী। মহাপ্রভুর মতাবলম্বিগণ অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন কেন?

বাবাজী। মহাপ্রভু আজ্ঞা করিলেন, "যে জন আমাকে ভালবাসিবে বা গুরুবুদ্ধি করিবে, সে নিজেকে মাধবাচার্য্য সম্প্রদায় বোলাইবে; অতএব মহাপ্রভুর আজ্ঞাপালন ও সন্তোষবিধান করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্বামীজী। আচ্ছা, মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের প্রণালীতে পাওয়া যায়—তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা নারায়ণ, ধাম বদরিকাশ্রম এবং উপাস্য ব্রহ্ম। তবে আপনারা সেই সম্প্রদায়ী হইয়া রাধাগোবিন্দ উপাসনা করেন কেন?

বাবাজী। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাগমার্গের উপাসনাপ্রণালীতে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন ব্রজজনের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন উপদেশ করিয়াছেন। ব্রজগোপীগণ নারায়ণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন। কাজেই ব্রজভাবে ভজন করিতে হইলে নারায়ণকেই দেবতা বলিয়া মানিতে হইবে। মহাপ্রভুর মতাবলম্বিগণের মতে কাহাকেও অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নহে। "সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর। সবার নিকট মেগে লবে কৃষ্ণভক্তিবর॥" গোপীগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়া

কৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন। গোপেশ্বর মহাদেব ব্রজের অধীশ্বর। মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। যখন তিনি দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন, তখন যে স্থানে যে দেবতার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহাকেই মর্য্যাদা ও প্রণামবন্দনা করিয়া ইষ্টবর প্রার্থনা দ্বারা জগৎকে শিখাইয়াছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনলীলা অপ্রাকৃত নরলীলা। ঐশ্বর্য্যগন্ধ থাকিতে বা রাধা-গোবিন্দকে নারায়ণাদির সমদেবতা জ্ঞান থাকিতে ব্রজপ্রাপ্তি হইবে না। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ ধামাতীত ধাম; কাজেই বাহিরে থাকিয়া আমাদের উপাসনাতত্ত্ব সহজে বোধগম্য করা কঠিন।

স্বামীজী। আচ্ছা, আপনি বলিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ পালন করাই আপনাদের কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তিনি ত আর নিজেকে ভজিতে বলেন নাই! এমন কি অনেক স্থানে দেখা যায়—তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিলে বা তাঁহার নাম কীর্ত্তনাদি করিলে তিনি অসন্তুষ্টই হইতেন। তবে আপনারা তাঁহাকে ভজনা করেন কেন?

বাবাজী। যেরূপ বৃন্দাবনবিহারী নন্দনন্দন বংশীধারীকখনই নিজেকে ভজিতে বলেন নাই; শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশে আমরা তাঁহাকে ভজনা করি, সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নকলেবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, নিত্যপার্ষদ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতির আদেশে আমরা শ্রী গৌরাঙ্গদেবকে ভজনা করিয়া থাকি। নিতাই বলিয়াছেন ঃ—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ॥

দিনগেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার।
সে জন আমার হয় আমি হই তার ॥

আবার শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন :—

জনম ধরিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যে লয় নিতাইএর নাম।
আমি বিকাই তারে দেখাই যুগল রাধাশ্যাম ॥ ইত্যাদি

অতএব আমরা উভয়ের আদেশে উভয়কেই ভজনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ জীবের যদি প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে, তবে নিতাই-গৌরাঙ্গ-চরণে চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে ভজন ও স্মরণ করা উচিত। কারণ যদি নিতাই গৌরাঙ্গ কৃপা করিয়া চির-অনর্পিত নাম, প্রেম এবং রাধাগোবিন্দের যুগল উপাসনা আপামরসাধারণ জীবগণকে অবিচারে বিতরণ না করিতেন, তাহা হইলে অনাসিদ্ধ মায়ামুগ্ধ কলিহত জীবগণের কি দুর্দ্দশা হইত ভাবিয়া দেখুন দেখি! আমরা এমনই ভ্রান্ত জীব যে সামান্য কোন বিষয়ে যদি কাহারও দ্বারা উপকৃত হই বা সামান্য কোনও বস্তু প্রাপ্ত হই, তবে তঁাহার নিকট শত শতবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি; কিন্তু যঁাহারা আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজ নিজ সুখৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া দ্বারে দ্বারে কঁাদিয়া কঁাদিয়া ব্রহ্মাদির দুর্লভ পরমধন প্রেমসম্পত্তি আমাদিগকে অবিচারে বিতরণ করিলেন, আমরা কিনা তঁাহাদিগকে ভজিতে বা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হই!”

বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয়ের চোখে জল আসিল—কণ্ঠ গদগদ হইল—সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবলীতে ভূষিত হইল। স্বামীজী ইঁহার অপূর্ব্ব প্রেমবিকার দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, “আজ আমি আপনার সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইলাম। এরূপ সরল ভাষায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত আমি আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট শুনি নাই।” বাবাজী মহাশয় করযোড়ে

বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনারা মহাত্মা, আপনাদের কৃপায় কাঠের পুতুলও নাচিতে পারে—পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়; আমাদ্বারা বলাইবেন এ আর কত কথা?" ইত্যাদি নানারূপ দীনতা-সূচক-বাক্য শ্রবণে স্বামীজী উঠিয়া আত্মহারাভাবে বাবাজী মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন। আর কাহারও গুরুবুদ্ধি নাই; পরস্পর সখ্যসূত্রে বাঁধা পড়িলেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ভাই! জীবের মুখ্য সাধন কি? কোন্ পথে গেলে জীব সহজে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে?"

বাবাজী। আমাকে একথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনার বলাই উচিত। আমি শাস্ত্রাদি কিছুই জানি না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার প্রাণে যাহা ভাল লাগে বা তিনি যাহা বলান, আমি তাহাই বলিতে পারি।

স্বামীজী। আমি ওরূপ দৈন্য শুনিতে চাহি না। তোমার প্রাণে যাহা ভাল লাগিয়াছে, তাই বলিলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

বাবাজী। জীবের মুখ্য সাধন ভক্তি। ভগবান্ ভক্তিসূত্রে যেরূপ আবদ্ধ হন, অন্য কোনও ভাবে সেরূপ আবদ্ধ হন না। ভক্তিপথ অতি সুগম, অনায়াসসাধ্য এবং নিত্যসুখপ্রদ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

স্বামীজী। কেন, যোগমার্গেও ত ভগবান্ আবদ্ধ হন। যোগই ত প্রধান উপায়। তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

বাবাজী। যোগ আপেক্ষিক শব্দ। যোগের দুইটি লক্ষণ ; প্রথম—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। এই চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে যোগ, ইহা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। যোগ বলিতে একটা পথকে বুঝায় না। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" ভক্তি, জ্ঞান বা কর্ম্মের পথ চিনিবার কৌশলকেই যোগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, শাস্ত্রে যে হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে শরীররক্ষা বা মনের স্থিরতা ভিন্ন আর কিছুই আছে কি? যোগশাস্ত্রেও যাহা বলিয়াছেন, ভক্তিশাস্ত্রেও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। কেবল ক্রমভেদে ফলাফলের বিভিন্নতা। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "চিত্তের বৃত্তিসকলকে অবরোধ করিয়া রাখ। ধৌতি, বস্তি, নেতি, আসন এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা কফপিত্তাদির বৈষম্যদোষ দূর করতঃ নাড়ীসকলের সরলতা বিধান কর—ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে সমাধি লাভ করিতে পারিবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "চিত্তের বৃত্তিসকলকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে যখন কোনও না কোনও কারণে তাহারা উন্মুক্ত হইবে, তখন কি কুপথে গমন করিবে না? একটি পাগলকে যদি কেহ গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে সময়ে সে যদি কোন কারণে মুক্তি পায়, তবে কি সে পূর্ব্ববৎ পাগলামি করিবে না? অবশ্যই করিবে। অতএব এত কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি আবদ্ধ না করিয়া অনায়াসে যাহাতে তাহার বৃত্তিপরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা ইত্যাদি রূপে যদি ইন্দ্রিয়সকলের গতিপরিবর্ত্তন করা যায়, তবে আর বিপদের আশঙ্কা কোথায়? আসন প্রাণায়ামাদি দ্বারা নাড়ীর সরলতা বিধানপূর্ব্বক ধ্যানধারণাযোগে চিত্ত স্থির হইলে তবে সমাধি লাভ হইবে। এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? উচ্চৈস্বরে নামকীর্ত্তন, উদ্দণ্ড নৃত্য, দণ্ডবৎ নমস্কার, পরিক্রমা প্রভৃতি দ্বারা

দেহের জড়তা ও নাড়ীর বক্রতা বিনষ্ট হইয়া অতি সহজে আপনা আপনিই সমাধি লাভ হইবে।" যোগ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ—যোজনা করা। যথা,—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ,ভক্তিযোগ প্রভৃতি। কর্ম্মণা ভগবতা সহ যোগঃ কর্ম্মযোগঃ। এইরূপ জ্ঞানেন ভক্ত্যা বা ভগবতা সহ যোগঃ। তবেই বুঝা গেল যোগ একটি পৃথক পথ নহে; জ্ঞান কর্ম্ম বা ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভগবানের সহিত চিত্তবৃত্তির যোগই যোগ নামে অভিহিত হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জ্ঞান কর্ম্মাদি অপেক্ষা ভক্তিদ্বারা পূর্ণপূর্ণতম শ্রীভগবানের সহিত অতি সহজেই যোগ হইয়া থাকে। তাই ভক্তিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই ভক্তি আবার বৈধী ও রাগভেদে দ্বিবিধ। বৈধী ভক্তি চৌষট্টি অঙ্গে নয় প্রকারে বিভক্ত। রাগভক্তির ক্রমনির্দ্দেশ করা যায় না; কারণ রাগমার্গাবলম্বী ভক্তের প্রাণ যে কোন পথে যাইবে, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা বেদবিধির পারে চলিয়া গিয়াছেন। তবে পূর্ব্বাচরিত ভক্তগণের মুখ্য মুখ্য পন্থা কিঞ্চিৎ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাগাত্মিকা ভক্তিরই নামান্তর সম্বন্ধভক্তি। ইহার মুখ্য সাধন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটি ভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার প্রভু, আমার সখা, আমার পুত্র, আমার কান্ত এইভাবে উপাসনা করিলে অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাধ্য হইয়া থাকেন। এই চারিভাবই শ্রেষ্ঠ তবে তটস্থ হইয়া বিচার করিলে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা হেতু গোস্বামীগণ মধুরভাবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এসব কথা বলিতে গেলে ফুরায় না। এই মধুর ভাবের অনেক বিভাগ; অনেক আবরণ ভেদ করতঃ সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন হইয়া উপাসনা করিলে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। সেও আবার গোপীগণের আনুগত্য না হইলে পাইবার উপায় নাই।

স্বামীজী। এত সাধনে ব্রজপ্রাপ্তি হইল বুঝিলাম; কিন্তু জীবের মুক্তির উপায় কি? সেবাই করুক আর পরিচর্য্যাই করুক, সেও ত একটা কর্ম্ম বটে!

বাবাজী। ভগবৎ-উদ্দেশে কৃত কর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে গণনীয় নহে; সুতরাং সেই কর্ম্ম জীবের বন্ধনের কারণ হইতে পারে না।

স্বামীজী। কর্ম্মের মধ্যে গণনীয় হউক বা নাই হউক, কর্ম্ম ত বটে। মুক্তিই জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয়। কর্ম্ম থাকিতে মুক্তি হইবে কিরূপে?

বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তি মুক্তির বাঞ্ছা করা ত দূরের কথা, বরং তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন:—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সাযুজ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

সেবানিষ্ঠ ব্যক্তি সেবা ভিন্ন অপর কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না; এমন কি, ধ্যানাদিকে পর্য্যন্ত হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ব্রজভাবের উপাসকগণের ত কথাই নাই। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্যই প্রমাণ। তিনি রাধাভাবাবেশে বলিয়াছেন—

পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে করিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।
তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥

নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদ-কমল
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।

তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটী নাটী,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥

দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হইতে না চাহে উদ্ধার।

বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লেহ তার পর ॥

যাঁহারা সংসারকে কৃষ্ণসংসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সংসার দুঃখের বা বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। তাঁহাদের অখিল চেষ্টা কৃষ্ণেরই সুখের জন্য। কৃষ্ণে সমর্পিত দেহদ্বারা কখনই অধর্ম্মাচরণ বা কাহারও কোনরূপ অনিষ্টাচরণ হইতে পারে না। যদি বা ক্বচিৎ কোথাও ইহার বৈপরীত্য দেখা যায়, তাহার জন্য সে ব্যক্তি দায়ী নহে; কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন, "মন্নিমিত্তে কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।"

এতক্ষণ স্বামীজী নীরবে বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলেন। এই-বার আনন্দে অধীর হইয়া ইঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। উভয়ের সেই বিশাল দেহদুইটি পুলক-পরিব্যাপ্ত এবং সমভাবে কম্পিত। কখন উভয়ের নয়নজলে উভয়ে সিক্ত, কখন উভয়ের মুখে উচ্চ হাসি, কখনও বা উভয়েই প্রেমভরে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। তৎকালে ইঁহাদের মনে যে কি আনন্দস্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল, তাহা ইঁহারাও জানেন। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ হিব্বলভাবে ইঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর সেই অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-লহরীর এক এক কণা আস্বাদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে স্থির হইলে বাবাজী মহাশয় স্বামীজীর নিকট সখ্যভাবে বিদায় গ্রহণানন্তর স্বীয় বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন।

প্যারীবাবুর বাড়ীতে মহোৎসব

ক্রমে যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই কটকবাসিগণ বাবাজী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। একদিন প্যারীবাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা। তুই ত সর্ব্বত্রই আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছিস্। একদিন গোবিন্দের বাড়ী যাবি না?" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সস্ত্রীক প্যারীবাবু বাৎসল্যরসের উপাসক এবং সগণ বাবাজী মহাশয়ের প্রতি ইঁহাদের সন্তানবাৎসল্য।

বাবাজী। কেন বাবা। গোবিন্দ ত আমাদের, আমরাও তোমাদের। আদেশ করিলেই হইল।

প্যারী। বেশ! আজই হউক।

বাবাজী। তাহাই হইবে। আমার কোন আপত্তি নাই।

প্যারী। কত লোক হইবে বাবা?

বাবাজী। সেজন্য কোনই চিন্তা করিতে হইবে না। আপনি যাহা যোগাড় করিয়া গোবিন্দকে ভোগ দিবেন, তাহাতেই নিতাইচাঁদ পূরণ করিয়া দিবেন। সম্ভব চল্লিশ পঞ্চাশ জন হইতে পারে।

শুনিয়া প্যারী বাবু হৃষ্টচিত্তে বাড়ী চলিয়া গেলেন এবং বাবাজী মহাশয়ের কথানুসারে পঞ্চাশ ষাট জনের উপযোগী দ্রব্যাদি যোগাড় করিলেন। দুইজন ব্রাহ্মণ পূজারী রশুই করিতে লাগিলেন। বেলা অবসানপ্রায়, এই সময় বাবাজী মহাশয় নামকীর্ত্তন করিতে করিতে বালুবাজার, চৌধুরী বাজার, বক্সী বাজার, চাঁদনি চক, সাহেবজাদা বাজার প্রভৃতি ঘুরিয়া অবশেষে মাণিকঘোষ বাজারে গমন করিলেন।

প্যারীবাবুর বাড়ী মাণিকঘোষ বাজারের মধ্যে। যখন সংকীর্ত্তনের দল প্যারীবাবুর বাড়ীর সম্মুখে, তখন লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই শতের কম নহে। বাবাজী মহাশয় দরজার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকলকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন। সকলে প্রবেশ করার পর নিজে ঢুলিতে ঢুলিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গোবিন্দ-জীউকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক যে স্থানে রান্না হইতেছিল, সেই স্থানে গিয়া দেখেন যে, প্যারীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অতিরিক্ত লোকসংঘট্ট দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়াছেন। তখন মাকে (প্যারীবাবুর স্ত্রীকে) প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! তুমি নিরুদ্বেগে নামকীর্ত্তন শ্রবণ কর। লোক-জন খাওয়াইবার জন্য কোন চিন্তা নাই; নিতাইচাঁদ সকল অভাব পূরণ করিবেন। ক্ষুধার্ত্ত কেহই ফিরিয়া না গেলেই ত হইল।" স্নেহময়ী মা ইঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা! সমস্তই ত তোমাদের; যদি কেহ বিমুখ হয়, সেও ত তোমাদেরই অপযশ! আমার কি বাবা?" বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হউক। নিতাইচাঁদের প্রসাদে কেহই বঞ্চিত হইবে না। চল, সকলে কীর্ত্তন শুনিবে" বলিয়া নিজে নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নাম করিতে লাগিলেন। রাত্র প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়া গেল। কাহারই সংজ্ঞা নাই—আবালবৃদ্ধযুবা সকলেই নামে মাতোয়ারা। কাহারই বাহ্যানুসন্ধান নাই। যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারাও একাগ্রমনে একদৃষ্টে বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আবার যাঁহারা ইঁহার সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারাও একপ্রাণে একতানে ইঁহার সুরে সুর মিলাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। প্যারীবাবুর তিনটি পুত্র কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছে; নিজেও সেই নামানন্দে বিভোর।

এইরূপে বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর নামসমাপ্তি করিলেন। বাড়ীতে স্থান অতি সংকীর্ণ। বসিবার অসুবিধা হইবে বলিয়া বাবাজী মহাশয় নিজে সকলকে বসাইয়া দিতে লাগিলেন। সকলেই নির্ব্বিকারে একত্রে বসিয়া যাইতে লাগিল। পংক্তি বা জাতির বিচার যেন ভয়ে সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করিল। পরিবেশনের ভার ললিতাদাসী ও কুসুম-দাসীর উপর। ইঁনি নিজে একবার ভোগের ঘরে গমনপূর্ব্বক প্রসাদ দেখিয়া ললিতাদাসীকে বলিলেন, "পরমানন্দে প্রাণখুলিয়া পরিবেশন কর নিতাইচাঁদ আছেন।" ললিতাদাসী বলিল, "আপনি মহাপ্রসাদ পাইতে বসুন, কোন চিন্তা নাই।" তখন বাবাজী মহাশয় কয়েকটি ব্রাহ্মণকে লইয়া মধ্যস্থানে পঙ্গতে বসিলেন। পঙ্গত আরম্ভ হইল—আনন্দের অবধি নাই। স্থানাভাবে সকলে একসঙ্গে বসিতে পারেন নাই। ইঁহার সঙ্গী রাধাবিনোদ, কিশোরীগোপাল, অদ্বৈতদাস প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি এক এক কোণে এক এক জন দাঁড়াইয়া নিতাই-গৌর এবং রাধাগোবিন্দের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে ঢুলিতেছেন। ভোগের ঘর হইতে যতই মহাপ্রসাদ বাহির হইতেছে, ততই যেন নিতাইচাঁদ যোগাইতেছেন। নিতাইচাঁদের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ পরমানন্দে সে পঙ্গত উঠিতে না উঠিতেই অপর একদল সেই পাতায় বসিয়া গেল। তাঁহাদের পঙ্গত শেষ হইলে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন স্ত্রীলোক সেই পাতায় প্রসাদ পাইবার পর প্যারীবাবুর স্ত্রী ভোগের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, তখনও প্রায় সাত আট জনের উপযুক্ত প্রসাদ রহিয়াছে। ভক্তির মূর্ত্তি প্যারীবাবুর স্ত্রী একেবারে বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইঁহার অলৌকিকী শক্তি দর্শনে সকলেই বিস্মিত। পঞ্চাশ ষাট জনের উপযুক্ত মহাপ্রসাদ প্রায় তিনশত লোকে পরিপূর্ণভাবে পাইল। যাহারা রান্না করিয়াছে, তাহারা

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরিবেশনকারিণী ললিতাদাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপে এত লোকের পূরণ হইল ?" তিনি বলিলেন, "আমি কি জানি ? প্রয়োজনমত ডাল তরকারী মহাপ্রসাদ লইয়া পরিবেশন করিতে যাই, এই পর্য্যন্ত জানি। তারপর কোথা হইতে যে আসিল বা কিরূপে সকলের পূরণ হইল, তাহা একমাত্র গুরুদেব জানেন। আমার তখন এসব ভাবিবার অবকাশ থাকে না।" এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। এদিকে রাত্রি অধিক হওয়ায় আর বিলম্ব না করিয়া ইঁহারা নাম করিতে করিতে বাসায় রওনা হইলেন। বাবুভায়াগণ বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ইঁহারাও বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। উড়িষ্যাভ্রমণকালে প্রায় প্রত্যহই বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ ঐশ্বর্য্যবিকাশ দেখা যাইত।

—*—

শাক্ত ও বৈষ্ণবের তত্ত্বমীমাংসা

একদিন প্রাতঃকালে জনৈক ভক্ত আসিয়া সগণে বাবাজী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিবার প্রার্থনা করিলে বাবাজী মহাশয় স্বীকৃত হইলেন। ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে সঙ্গে অনুমান কত লোক হইবে ?" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কতজনকে বলিবার ইচ্ছা ?"

ভক্ত।—আজ্ঞে আমার কোনই ইচ্ছা নাই। আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

বাবাজী। আমি আর কি বলিব ? কীর্ত্তনের সঙ্গে যদি দশজন অধিক যায়, তাহা হইলে তোমার পরম সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে।

ভক্ত। আজ্ঞে তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। তবে পূর্ব্ব হইতে না জানিলে কিরূপভাবে যোগাড় করিব ?

বাবাজী। আচ্ছা, তবে শতাবধি লোকের পরিমাণে আয়োজন কর। দুইচারিজন কমও হইতে বেশীও হইতে পারে।

তখন ভক্তটি হৃষ্টচিত্তে বাড়ী চলিয়া গেল। বাবাজী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে যাওয়ার নিয়ম রাত্রে ; কারণ দিবসে নিমন্ত্রণ হইলে সকলে সমানভাবে যোগদান করিতে পারে না ; অথচ কীর্ত্তন শুনিবার জন্য বহু লোকের প্রাণে উৎকণ্ঠা থাকে ; কাজেই দিবসে বাসায় ঠাকুরের ভোগ হয় ; রাত্রে নিমন্ত্রণে যাওয়া হয়। সে দিনও তাহাই হইল। অপরাহ্ন সময় ইঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ভক্তটি আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ নাম ধরিয়া বাহির হইলেন। ক্রমে বালুবাজারের রাস্তা ধরিয়া কটক শহর পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভক্তটির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

ভক্তটি জাতিতে ময়রা, যথেষ্ট অর্থশালী। প্রবাদ যে লোকটি একটু ব্যয়কুণ্ঠিত ; কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয় খুলিয়া গিয়াছে। বাবাজী মহাশয় একশত লোকের কথা বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি প্রায় দুই শত লোকের পরিমাণে আয়োজন করিয়াছেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত দেখিয়া ভক্তটি চিন্তিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় নামসমাপ্তি করিয়া যেমন উপবেশন করিলেন, অমনি দুর্গাপ্রসাদ দত্ত এবং বলরাম মহাপাত্র নামক দুইটি যুবক আসিয়া ইঁহার সম্মুখে বসিল। ইহাদের মধ্যে আজ তিন দিন হইতে বাদবিসম্বাদ চলিতেছে। এ বিবাদ, বিষয় বা ধন জন লইয়া নহে ; এ বিবাদ উভয়ের ইষ্টদেব লইয়া। দুর্গাপ্রসাদ জাতিতে গন্ধবণিক্, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত। উহার মত—কৃষ্ণভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র

ঈশ্বর ; অপরাপর দেবদেবীগণ তাঁহার অংশকলা বিশেষ। বলরাম মহাপাত্র দুর্গাপ্রসাদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বলেন, শক্তি উপাসনাই সর্ব্বপ্রধান। জগতে যাবতীয় কার্য্য একমাত্র শক্তির খেলা। শক্তি ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্যই হইতে পারে না। কৃষ্ণও শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। আদ্যাশক্তি ভগবতীকে না ভজিলে মনুষ্যজীবন বৃথা। ইত্যাদি ভাবে উভয়ের নিজ নিজ ইষ্টপক্ষ সমর্থন জন্য তিন দিনকাল সমানভাবে উহাদের বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে। কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া আজ উভয়ে বড় বাবাজী মহাশয়কে মধ্যস্থপদে বরণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন ; কিন্তু কেহই বলিতে সাহস পাইতেছেন না। বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের দুই জনের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমরা কিছু বলিতে আসিয়াছ। কি সন্দেহ, বল। আমি নিজে না জানিলেও অপরের নিকট জানিয়া তোমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিব।" তখন সাহস পাইয়া উভয়েই বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে শক্তির উপাসনা শ্রেষ্ঠ, কি কৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ ?"

বাবাজী। তোমরা কোন্‌টিকে বড় মনে কর, আগে বেশ প্রাণ খুলিয়া বল, তার পর আমি বলিব।

দুর্গাপ্রসাদ। আজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণই বড় ; কারণ ভাগবত বলিয়াছেন,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—"যুগ প্রবর্ত্তন হয় অংশকলা হইতে। আমা বিনু কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" যখন আমাদের প্রেমেরই প্রয়োজন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে না ভজিলে কিরূপে চলিবে ? আরও বলিয়াছেন, —"শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।" এ ত গেল শাস্ত্রের কথা। স্বভাবতঃ ব্যবহারিক জগৎ দেখিতে গেলেও ত শাক্তদের

আচরণ কত ঘৃণিত দেখুন। মদ্যমাংসাদি লইয়া কি কখনও ভগবানের উপাসনা হয়? ও সব ত আসুরিক ব্যাপার। কালী দুর্গার যত কিছু লীলাখেলা, তাহার মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ভিন্ন কোন্‌টি আছে? আপনি বলুন দেখি, যাঁহাকে ভজন করিব, তিনি যদি খড়গ, ত্রিশূল, মূষল, মুদ্‌গরধারী হইলেন, তবে তাঁহাকে ভজিয়া সত্ত্বগুণ কোথা হইতে আসিবে?

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌॥"

কালী, দুর্গা প্রভৃতি সকাম দেবতা ভজিয়া কখনই পরমার্থলাভ হইতে পারে না। শাক্তের সহিত বৈষ্ণবের তুলনাই অসম্ভব।

বাবাজী। আচ্ছা, এ ত একপক্ষের কথা শুনিলাম। তুমি কি বল বাবা?

মহাপাত্র। আমি প্রথমে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আচ্ছা, শক্তি না থাকিলে কোনও কার্য্য হইতে পারে কি? দৃশ্যাদৃশ্য (স্থূলসূক্ষ্ম) জগৎ শক্তি হইতে উৎপন্ন। শক্তির অভাবে শক্তিমান্‌ কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। যদি শক্তি ব্যতীত শক্তিমান্‌ কোনও কার্য্য করিতে না পারিলেন, তবে শক্তি বড় হইলেন না কি? ব্রজগোপীগণ শক্তির আরাধনা করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বনে গিয়া ভগবতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন। মাও কৃষ্ণকে কোলে লইয়া দশহস্তে নবনী খাওয়াইয়াছেন। ইহাতে আমরা কি বুঝিলাম? দেবতাদিগের রক্ষার্থ তাঁহারা মায়ের নিকট প্রার্থনা করায় মা অসুরদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। মা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহার নিকট ভক্ত যাহা প্রার্থনা করিবেন, তিনি কি তাহা পূর্ণ করিবেন না? রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কখনও অস্ত্রধারণ করেন নাই কি? অতএব যখন শক্তি না হইলে কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না,

তখন শক্তিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ কথায় সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বাবাজী। আচ্ছা, তোমাদের মতামত শুনিলাম। এখন দুইজনেই হৃদয়ের দ্বেষভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কথা শুন। হিংসাদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে বিশুদ্ধ বস্তুর ধারণা হইতে পারে না। আমার মতে তোমাদের দুইজনের ধারণাই ভুল। শক্তি এবং শক্তিমানের গুরুত্ব লঘুত্ব লইয়া বিচার সম্ভবে না; কারণ "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।" প্রাকৃত রাজ্যের কথা ভাবিয়া দেখ,—অগ্নি এবং দাহিকা শক্তি, ইহাদের লঘুত্ব বা গুরুত্ব, অথবা দুইয়ের পৃথকত্ব কেহ নির্দ্ধারিণ করিতে পারেন কি? "সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর। সবার নিকট মেগে লবে ইষ্টভক্তি বর ॥ গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অন্যত্র—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। পুরাণান্তরে—দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি চাম্বিকা। ইত্যাদি যাবতীয় শাস্ত্রবাক্য শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ ভিন্ন ভেদ কল্পনা করেন নাই। তুমি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দেখাইলে—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" বেশ! কৃষ্ণ অংশী, অপর সমস্ত তাঁর অংশকলা বিশেষ। ইহাতে কি বুঝিলাম? অংশী এবং অংশে বা অবতারী এবং অবতারে পার্থক্য সম্ভবে কি? এক একটি কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেশ, কাল, পাত্রানুযায়ী ভগবানের এক একটি রূপ ধারণ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবানের কোন অবতারের ক্রিয়াকলাপ বা লীলাখেলা লইয়া সমালোচনা করা সম্পূর্ণ সাধনাবিরুদ্ধ। আমাদের প্রাকৃত চক্ষু এবং সংকীর্ণ বুদ্ধি লইয়া

আমরা যে কোন লীলা দেখিতে যাইব, তাহাতেই দোষের সংস্রব, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থপরতা দেখিতে পাইব। যদি ভগবৎস্বরূপেই দোষের সংস্রব রহিল, তবে জীবের আর উপায় কি? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র, ইতিহাসাদিতে ঋষিদিগের যে মতদ্বৈধতা দেখা যায়, সে কেবল উপাসকের রুচি বা অধিকার বিভেদের জন্য বই আর কিছুই নহে।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

আমাদের নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে উপাসনা এবং আচারগত এতই পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে যে, ঐ পার্থক্য উপাসকদিগকে অতিক্রম করিয়া উপাস্যদিগের উপর পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়াছে; নির্ব্বিকার, নিষ্কাম, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে কল্পিত উপধর্ম্মভাব অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। স্ব স্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতামূলক ঐ উপধর্ম্মের প্রভাবে মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ পথে লোক কতই না কলঙ্ক আরোপ করিতেছে। এমন কি শিক্ষিত ভদ্রসমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি এতই অশ্রদ্ধা আসিয়াছে যে, ঐ অশ্রদ্ধা ধর্ম্মযাজকদিগকে অতিক্রম করিয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। এইরূপ শাক্তদিগের মধ্যেও হইয়াছে; তন্ত্রাদিতে শক্তির উপাসনাপ্রণালী যেরূপ পাওয়া যায়, তাহাতে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে আচার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সমস্ত অনুসন্ধান না করিয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তির বলে যথেচ্ছাচার প্রয়োগ বশতঃ লোকের দৃষ্টিতে নানারূপ বিরুদ্ধভাব প্রকাশ পাইয়া ঐ আচারভ্রষ্টতা উপাসকদিগকে অতিক্রম করতঃ উপাস্যগণের উপর পর্য্যন্ত ন্যস্ত হইতেছে। তাই পঞ্চদেবতার উপাসকগণ প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা করিয়া থাকেন। তন্ত্রে

দিব্যাচার, বীরাচার এবং পশ্বাচার এই ত্রিবিধ আচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দিব্যাচার দেবতাগণের পক্ষে এবং বীরাচার ও পশ্বাচার মনুষ্যগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। ক্ষাত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী রাজস প্রকৃতির লোকসকল বীরাচারমতে এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ পশ্বাচারমতে শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। এমন কি, তন্ত্রাদিতে অনেক স্থানে কলিতে একমাত্র পশ্বাচারেই মায়ের উপাসনার বিধান করিয়াছেন। পশ্বাচার অর্থাৎ সাত্ত্বিক আচার, যাহাতে মদ্যমাংসাদির সংস্রব নাই। অনেকে পশ্বাচারমতে উপাসনা করিতে গিয়া হয় ত তন্ত্রোক্ত বীরাচারের দুই একটি শ্লোক অভ্যাস করতঃ নিজ নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে পশুহিংসা বা মদ্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকেই কি মায়ের উপাসনাপ্রণালী বলিতে হইবে? এই সমস্ত লইয়াই শাক্ত বৈষ্ণবের মতদ্বৈধতা। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া বাহিরের ব্যবহার লইয়া বিবাদ করা সম্পূর্ণ ভুল। আমি ত বহু অনুসন্ধান করিয়াও শাক্ত এবং বৈষ্ণবের কোনও পার্থক্য অবগত হইতে পারিলাম না; কারণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রধান অবলম্বনই যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবী। যোগমায়ার কৃপা না হইলে লীলায় প্রবেশের অধিকারই হইতে পারে না। ব্রজগোপীগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুক্মিণী দেবী অম্বিকার সেবা করিয়া কৃষ্ণলাভ করিয়াছিলেন। মা যশোমতী হরগৌরীর আরাধনা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। শচীমা পোড়ামাতা নাম্নী নবদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং পুণ্যসলিলা মা গঙ্গার উপাসনা করিয়া গৌরাঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। প্রধান পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস ঠাকুর গ্রাম্য দেবতা বাশুলীর আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দলীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব যে কোন ভাবের বৈষ্ণব হউন না কেন, শক্তির কৃপা ব্যতীত কে

ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন ? আবার যাঁহারা শাক্ত বলিয়া অভিমান করেন বা 'বৈষ্ণবগণ কিছুই নয়' ইত্যাদিভাবে অবজ্ঞাপ্রদর্শন বা বাদপ্রতিবাদ করেন, তাঁহারা কি শালগ্রাম শিলা সেবা করেনা ? বিষ্ণুর পূজা বা আরাধনা ভিন্ন কোন আরাধনাই সিদ্ধ হইতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিষ্ণু পূজাবিহীনা যা সা পূজা নিষ্ফলা মতা।" অন্যত্র "চক্রহীনন্তু যৎ স্থানং তত্তু শৌচবিবর্জ্জিতং। ন হি দেবগণাস্তত্র তিষ্ঠন্তি শঙ্করোহব্রবীৎ॥" এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, যিনি অন্তিমকালে হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ রাম নারায়ণ ব্রহ্ম প্রভৃতি নাম উচ্চারণ না করেন ? তবে কাহাকে শাক্ত বলিব, আর কাহাকেই বা বৈষ্ণব বলিব, আমি ত বুঝিতে পারিলাম না। এ ত গেল সাধনের কথা। আবার ভগবৎস্বরূপের কথা দেখ, রামচন্দ্র রাবণবধের সময় অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনলীলা আস্বাদনের জন্য যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম, বন্দনা এবং দেবী দশভুজাকে মাতৃসম্বোধনে নবনীত গ্রহণ প্রভৃতি বহু বহু কার্য্য করিয়াছেন। আবার দেবাদিদেব মহাদেব রামনামে উন্মত্ত হইয়া দিবানিশি শ্মশানে মশানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মহামায়া ভগবানের অধরামৃত পাইবার জন্য বহু তপস্যা করিয়া শ্রীজগন্নাথধামে বিমলারূপে বাস করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপ দেবদেবীগণ পরস্পর পরস্পরকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহা লইয়া বিবাদ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। "নিন্দাশূন্য নম্রভাবে সবারে স্তবন। অভ্যাগত আহূত ব্যক্তির চরণ বন্দন।" এটি সাধারণ বাক্য। ধর্ম্মযাজক মাত্রেরই ইহা পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাতে গৃহী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর ভেদাভেদ নাই। যে কোন ভাবেই হউক, "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে ত একেবারেই

বিরুদ্ধ, কারণ—

ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি ॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি ॥

এই মহাবাক্যটি বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলভিত্তি। শাস্ত্র যখন আচণ্ডাল কুক্কুর পর্য্যন্তকে প্রণাম বন্দনাদি করিবার বিধান করিলেন, তখন শিব দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবীগণ কি তাহা হইতেও তুচ্ছ হইলেন? যাহারা কিছুই মানে না, তাহারাও বরং ভাল; কিন্তু একদেশব্যাপিনী ভক্তি অনর্থের মূল। এ কথা শাস্ত্রেও লিখিয়াছেন ঃ—

কিছুই না মানে হয় সেহ ত পাষণ্ড।
একে মানে আরে না মানে সেই মত ভণ্ড।
পাষণ্ডের উদ্ধার হইবে অবহেলে।
ভণ্ডের নিস্তার নাহিক কোন কালে ॥

তোমাদের এই বিবাদের কথায় আমার একটি গল্প মনে পড়িল—এক গুরুদেব কোন শিষ্যবাড়ি গিয়াছেন। শিষ্যটির পুত্রকন্যাদি কিছুই নাই। কেবল স্বামী স্ত্রী দুইজন। স্ত্রীটি গুরুদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন, "গুরুদেব! শিষ্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান বা উদ্ধারের উপায় কি?" গুরুদেব বলিলেন, "মা! শ্রীগুরুপাদপদ্মই শিষ্যের একমাত্র অবলম্বন। গুরুপাদপদ্মসেবা ভিন্ন ভবপারে যাইবার আর উপায় নাই। গুরুবাক্যৈক-নিষ্ঠ শিষ্যপত্নী মনে মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া রাখিলেন যে, গুরুপাদপদ্মই শ্রেষ্ঠ—গুরুপাদপদ্মসেবাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। শিষ্যটি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,

আর না করিহ মনে আশ।" শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মন্ত্রাত্মক বর্ণ যদি কর্ণদ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ না করিত, তবে কিরূপে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইত? অনাদিকাল হইতে ত্রিতাপে তাপিত হৃদয় মরুভূমিসদৃশ কঠিন এবং শুষ্ক ছিল। অযাচিত কৃপাকারী পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব করুণা করিয়া উপদেশামৃত সিঞ্চনে সেই হৃদয়-মরু সুশীতল ও স্নিগ্ধ করিয়াছেন। অতএব গুরুদেবের শ্রীমুখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একদিন স্বামীস্ত্রী উভয়ের মনঃ-কথা প্রকাশ করিতে গিয়া উভয়ের বাদানুবাদ হইতে লাগিল। স্ত্রী বলেন, গুরুদেবের চরণ শ্রেষ্ঠ; স্বামী বলেন মুখ শ্রেষ্ঠ। কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া গুরুদেবকে সংবাদ দিলেন। গুরুদেব আগমন করিবামাত্র শিষ্যপত্নী উঁহার চরণের যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্য উপদেশামৃত পানে বিভোর। গুরুদেব মহাবিপদ্‌গ্রস্ত। শিষ্য শিষ্যপত্নী উভয়ে মুখ এবং চরণ লইয়া ব্যস্ত; বসিবার আসন বা আহারাদির ব্যবস্থা করে কে? গুরুদেব দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে বাতাস করিয়া সুস্থ করিবে? কারণ তাঁহার মস্তক বা উদরের সেবক ত আর কেহই নাই! ইহাকেই বলে একদেশব্যাপিনী ভক্তি। আমার যে বস্তুর প্রয়োজন, আমি যাঁহার নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইব, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; তাঁহার অপর কেহ বাঁচুক আর মরুক। যেমন স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র সেব্য বস্তু—স্বামিসেবাই স্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর বা ভাসুর প্রভৃতির সেবা ত আর শাস্ত্রে উল্লেখ নাই; তাহাদের সেবা করার প্রয়োজন কি? পূর্ণপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণকে যিনি ভজনা করিবেন, শিব দুর্গা ত দূরের কথা—তৃণলতা কীট পতঙ্গকে পর্য্যন্ত যদি তিনি প্রীতি বা ভক্তির চোখে না দেখেন বা পূজা না করেন, তবে তাঁহার কৃষ্ণভজনের অঙ্গহানি হইবে। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—যাঁহারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব এবং যাঁহারা

শক্তির উপাসনা করেন তাঁহারা শাক্ত। বেশ কথা! যাঁহারা শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব তাঁহাদিগকে শাক্ত বলিবে, না বৈষ্ণব বলিবে? তাঁহারাও ত শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। মাধুর্য্যভাবে ব্রজ-উপাসকগণ শ্রীমতী রাধারাণীর আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও শাক্ত। যদি বল, বিষ্ণু শক্তিকে ভজিলেই বৈষ্ণব বলিব, অপর শক্তিকে ভজিলে শাক্ত বলিব; বেশ কথা! মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর নারায়ণীমাহাত্ম্য দেখ,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্তু তে॥

ইত্যাদি শত শত স্থানে ভগবতীকে নারায়ণী বলিয়াছেন। তাই বলি, এ বিভেদ উপাস্যগত নহে—এ বিভেদ আচারগত। সাত্ত্বিক ভাবে যিনি যাঁহাকেই ভজন করুন না কেন, তিনিই বৈষ্ণব; কারণ বিষ্ণুর একটি নাম সত্ত্ব। যে স্থানে সাত্ত্বিকভাব থাকিবে, সে স্থানে অপর কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব বলি, ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহার যেরূপ রুচি, তদনুসারে ভগবৎপথে অগ্রসর হও। যে সময়ে যেটুকু দরকার, প্রভু আপনি মিলাইয়া দিবেন। শঙ্করশঙ্করী পরম বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী—জগতের পিতামাতা। সমস্ত জগৎ প্রকৃতি; সচ্চিদানন্দ গোবিন্দই একমাত্র পুরুষ। উপযুক্ত পাত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে পিতামাতাই করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে পরম বৈষ্ণব জগদ্‌গুরু শঙ্কর ও শঙ্করীর আরাধনা কর। তাঁহাদের কৃপা হইলে তবে শ্রীরাধাগোবিন্দ লাভ হইবে।

তখন যুবকদ্বয় ব্যাকুলভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলে ইনি উভয়কে আলিঙ্গনদানে সুস্থ করিলেন।

উপস্থিত ভক্তগণ বাবাজী মহাশয়ের মুখে শাক্ত বৈষ্ণবের সমন্বয় শ্রবণে চিরকাল উপাস্যগত দ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ হেতু নিজে নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ইঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "ভাই সকল! ধন্য কলিকাল! পরম দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গ কোনরূপ অপরাধের বিচার করেন না। ব্যাকুলপ্রাণে 'হা নিতাই গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাক—তাঁহাদের চরণে আত্মসমর্পণ কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।" এইরূপে সকলকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাদশ গোপাল

একদিন বিমলাপ্রসাদ সেন নামক জনৈক ভক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে সদলে বাবাজী মহাশয়ের মহাপ্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ হইল। সেন মহাশয়েরা জাতিতে বৈদ্য। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস কয়েরপুরে। কার্য্যো-পলক্ষে ইনি এবং ইঁহার কয়েকটি স্বজাতি সপরিবারে কটকে বাস করেন। ইঁহাদের মেয়েরা ফুলের দ্বারা সুন্দর মালা, চূড়া এবং অন্যান্য নানাবিধ অলংকার প্রস্তুত করিতে পারেন। জানি না আজ তাঁহারা কাহার প্রেরণায় চূড়া এবং মালা প্রভৃতি নানারূপ ফুলের আভরণ প্রস্তুত করিতেছেন। কাহাকেও বলা কহা নাই; আজ যেন প্রত্যেকের হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের খেলা খেলিতেছে।

ক্রমে বেলা অবসান দেখিয়া বাবাজী মহাশয় সগণে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে কটক সহরের অনেক স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক বিমলা বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হইতেছে, এই সময় বাবাজী মহাশয় একজনকে বলিলেন, "হ্যাঁ হে! তোমাদের বাড়ীতে

নাকি অনেক রকম ফুলের আভরণ প্রস্তুত হইয়াছে? লইয়া আইস দেখি।" ছেলেটি সে বাড়ীর নয়; কিন্তু বিমলাবাবুর স্বজাতি ও আত্মীয়। সে একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে আমি ত কিছুই জানি না। আচ্ছা দেখিয়া আসি। বলিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখে অপূর্ব্ব ঘটনা! মেয়েরা ফুলের দ্বারা নানারূপ চূড়া, বলয়, কঙ্কণ, বাজু, হার, আঁচলা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থালায় থালায় রাখিয়াছেন। তখন সে বিস্মিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই ইনি সর্ব্বান্তর্যামী মহাপুরুষ; নতুবা আমরা নিকটে থাকিয়াও যাহা জানিতে পারি নাই, ইনি তাহা কিরূপে জানিলেন?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ফুলের থালা লইয়া বাহিরে আসিলে ফুল দেখিয়া বাবাজী মহাশয় মনে মনে কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন; সঙ্গিগণকে নাম করিতে আদেশ করতঃ নিজে হৃষ্টচিত্তে এক প্রান্তে বসিয়া এক একটি যুবককে সাজাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পালিত, রাধাকৃষ্ণ মহান্তি, ব্রজবাবু প্রভৃতি দ্বাদশজন যুবককে ইঁহার মনোভাব অনুযায়ী দ্বাদশ রাখাল বেশে সুসজ্জিত করতঃ সারি সারি দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং এক এক জনের কর্ণে যেমন এক একটি রাখালের নাম ও মন্ত্র প্রদান করিলেন, অমনি তাহারা ঠিক সেই সেই ভাবে বিভাবিত হইল। তখন বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে সঙ্গিগণ উহাদের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অপর দিকে ললিতাদাসী প্রভৃতি সখীগণকে অবলম্বন করিয়া অপর আট জনকে সখীবেশে সুসজ্জিত করতঃ মণ্ডলী-বন্ধনে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং সকলের কর্ণে সেই সেই সখীমঞ্জরীর নাম ও মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক ভাবোন্মত্ত অবস্থায় গিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। কৃষ্ণলীলার দ্বাদশ রাখাল গৌরলীলায় দ্বাদশ গোপাল হইয়াছেন, ইহা এবং তাঁহাদের যাবতীয় লীলাখেলা পদে গান করতঃ উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে সমকালীন কৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলার প্রকট ভাব জাগাইয়া দিতে

লাগিলেন। প্রেমসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। সকলেই বিভোর—সকলেই প্রকট লীলা অনুভব করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। বাবাজী মহাশয় সখ্য রসগানের পর ঠিক সময়ানুসারে মধুর লীলায় প্রবেশ করিয়া সেইভাবে গান আরম্ভ করিলেন। সখীবেশধারীগণ অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন লীলায় বিভোর! কাহারেই বাহ্যস্মৃতি নাই। বাবাজী মহাশয় নিজকৃত পদে যেরূপ ভাবের বিকাশ করিতেছেন, সখা বা সখীবেশধারী যুবকগণ ঠিক সেই সেই ভাবানুযায়ী নৃত্য বা অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করিয়া দর্শক ভক্তবৃন্দের আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেছেন এবং নিজেরা প্রেমানন্দসাগরে ভাসিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! যে সমস্ত যুবকগণ কৃষ্ণলীলা বা গৌরলীলা কাহাকে বলে তাহা একেবারেই জানেন না, আজ মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাবে তাঁহারাও ভাবসাগরে নিমগ্ন, আত্মহারা এবং বাহ্যস্মৃতিরহিত হইয়া এমনভাবে নৃত্যকীৰ্ত্তনাদি করিতেছেন যে, তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্রই অনুভব হইতেছে যেন সকলেই প্রকট লীলায় বিচরণ করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিল দেখিয়া একজন সঙ্গী বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে রাত্রি প্রায় তিনটা হইল।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীৰ্ত্তন সমাপ্ত করতঃ উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। তখনও যেন সকলের নেশা ছুটে নাই। এক এক জন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ বা কাঁদিয়া অধীর। এইরূপে রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটার সময় মহাপ্রসাদ সেবা শেষ করিয়া পুনরায় নামকীৰ্ত্তন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবৰ্ত্তন করিলেন।

—*—

বাগানবাড়ীতে বাউল বাবাজী

একদিন বাবাজী মহাশয় সদলে কটক সহর ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন—স্থানীয় লোকজনও অনেকে সঙ্গে আছেন। যাইতে যাইতে বনবাবুদের বাগানবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে একটি বাউল মতাবলম্বী সিদ্ধ বাবাজী ছিলেন। কিছুদিন হইল তিনি নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার একটি শিষ্য গুরুদেবের কাঁথা এবং পাদুকা প্রভৃতির সেবা করেন। বাবাজী মহাশয় সেস্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সিদ্ধ মহাত্মাগণ স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন; প্রকট-অপ্রকট তাঁহাদের একটি খেলামাত্র। তাঁহারা করুণা করিয়া যাহাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, সে অনায়াসেই দর্শন পাইয়া থাকে। শুনিয়া একজন ভক্ত করযোড়ে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে আপনার কথায় আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই স্থূলদেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঞ্চভৌতিক। ইহাতে সাধু-অসাধু, জ্ঞানী-অজ্ঞানী ভেদ নাই। এই স্থূলদেহ হইতে যখন সূক্ষ্মদেহ স্থানান্তরিত হয়, তখন ইহাকে প্রথানুসারে হয় রজে প্রোথিত, না হয় জলে নিক্ষিপ্ত অথবা অগ্নিতে দগ্ধ করা হইলে স্থূল পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়া যায়। মহাত্মাগণ ইচ্ছানুসারে আবার সেই দেহে প্রত্যক্ষীভূত হইবেন কিরূপে? আর যদি সেই দেহেই আবির্ভূত না হইবেন, তবে তিনি যে সেই মহাত্মা ইহাই বা কিরূপে বুঝা যাইতে পারে?"

বাবাজী। বাবা! অচিন্ত্যপ্রভাব ভগবানের কার্য্যাদি যেমন জীব-বুদ্ধির অগোচর, সিদ্ধ মহাত্মাগণের কার্য্যাদিও সেইরূপ অলৌকিক; সুতরাং তাহা লইয়া বিচার বা যুক্তি তর্কাদিদ্বারা সমন্বয় করা সম্পূর্ণ

অসম্ভব। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" যোগবলে যদি পরকায় প্রবেশ বা অণিমা লঘিমা সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তবে ভগবদ্‌ভজন করিয়া কি সামান্য একটা স্থূলদেহ ধারণ করা অসম্ভব? এই কথায় একটি প্রস্তাব মনে পড়িল—শ্রীপাট অম্বিকা কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয় একদিন নিজ আসনে বসিয়া নিমীলিতনেত্রে ভজন করিতেছেন, এই সময়ে একটি বিষয়ী বড়লোক তাঁহার দর্শনেচ্ছায় আসিলেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় অতি ত্রস্তভাবে "আ রে মার্‌ মার্‌! তাড়া তাড়া! ঠাকুরের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিস, বের বের!" এইরূপ বলিতে লাগিলেন। বাবুটি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিতভাবে মনে করিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি সাধুদর্শন করিতে আসিলাম; কিন্তু সাধু আমার প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? যাহা হউক, ইহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া যাওয়া হইবে না" ভাবিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বাবুটিকে দেখিবামাত্র আস্তেব্যস্তে বলিলেন, "বাবা! কখন আসা হ'ল? বেশ আনন্দে ভজন চলিতেছে ত?" বাবুটি একটু স্তম্ভিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! অত কটু ভাষার পর এত আদর-যত্ন! এ কিরূপ?"

বাবাজী। কেন বাবা! কে কটু কথা বলিল? "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ। অভ্যাগত ব্যক্তি নারায়ণসদৃশ। তাঁহাকে কটু কথাবলাও যা, ভগবানকে বলাও তাই।

বাবু। আজ্ঞে আমি বলিতে সাহস পাইতেছি না। আপনার আদেশানুসারে আমি তখনই চলিয়া যাইতাম; কেবল কি অপরাধে আমি আপনার বিরক্তিভাজন হইলাম, সেইটি জানিবার জন্যই এতক্ষণ এস্থানে রহিয়াছি।

বাবাজী। কি হইয়াছে বাবা? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বাবু। আজ্ঞে আমি আপনার দর্শনমানসে যেমন আসিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি আপনি "আ রে মার্ মার্! তাড়া তাড়া! ঠাকুরের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিস, বের বের!" এই বলিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিতেছিলেন।

ইহা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় লজ্জিতভাবে বলিলেন, 'বাবা! মনে দুঃখ করিও না, আমি তোমাকে কিছু বলি নাই বা তোমাকে দেখিও নাই। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দের মন্দিরস্থ একটি তুলসী গাছ ছাগলে খাইতেছিল; আমি সেই ছাগলটিকে তাড়াইয়াছি।" বাবুটি অতি বিস্মিতভাবে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া ঠিক ঘটনার সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক বৃন্দাবনে সংবাদ দিলেন। বৃন্দাবন হইতে উত্তর আসিল যে, গতকল্য ঠিক ঐ সময়ে গোবিন্দজীউর সম্মুখস্থ তুলসীগাছ একটি ছাগলে খাইতেছিল। কাল্না নিবাসী ভগবানদাস বাবাজী মহাশয় তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলাম—ভগবানদাস বাবাজী মহাশয় নামব্রহ্মের নিকট বসিয়া ভজন করিতেছেন। বল দেখি, বাবাজী মহাশয়ের স্থূলদেহখানি যদি বৃন্দাবনে না যাইত, তবে তাঁহাকে ভগবান-দাস বাবাজী বলিয়া কে চিনিত? ইহাকেই বলে সিদ্ধ অবস্থা। সিদ্ধ মহাত্মাগণ স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছামাত্রে যথাতথা স্থূলদেহও ধারণ করিতে পারেন। ভগবানের প্রকটাপ্রকটের ন্যায় মহাত্মাদিগের ঐটি একটি লীলামাত্র। এই সিদ্ধ মহাত্মাও সর্ব্বদা এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন।"

ইত্যাদিভাবে নানারূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময় একটি বাবাজী আসিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে আমাদের শ্রীরাধারাসবিহারী জীউকে

একবার দর্শন করিবেন, চলুন।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় অতিশয় আনন্দিতচিত্তে শ্রীশ্রীরাসবিহারী জীউর দর্শনে গেলেন। রাসবিহারী জীউর সেবাইত বৃদ্ধ শ্রীগদাধর দাস বাবাজী ও তাঁহার শিষ্য ভিক্ষা করিয়া সেবা চালাইয়া থাকেন। জানি না রাসবিহারীর কি ইচ্ছা—দর্শনমাত্রেই বড় বাবাজী মহাশয়ের মনপ্রাণ চুরি করিলেন। তখন ইনি সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! আপনার রাসবিহারী যে আমাকে অঙ্গীকার করিলেন! আমি ত বাবা, কোনও যত্ন-আগ্রহ বা সেবা জানি না, তবে আমার প্রতি এরূপ আদেশ কেন?" বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আমিও মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এতদিন পরে আমার মনের মতন লোক পাইলাম। ইঁহার হাতে রাসবিহারী জীউকে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! আমি ত ভগবৎ-সেবার অযোগ্য, তবে ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন।" ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনের পর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কয়েকদিন পরে গদাধর দাস বাবাজী সেবা চালাইতে অসমর্থ হওয়ায় এবং বাবাজী মহাশয় কটকে উপস্থিত না থাকা হেতু তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া অগত্যা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত মহাশয়ের হস্তে রাসবিহারী জীউর সেবার ভার অর্পণ করিলেন। ক্রমে প্যারীবাবুর চেষ্টায় এবং রাসবিহারী জীউর ইচ্ছায় উক্ত সেবা বাবাজী মহাশয় অঙ্গীকার করিলেন।

—ঃ*ঃ—

নগরকীর্ত্তন

একদিন প্রভাতে কয়েকজন ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া নানারূপে ভগবৎকথার আলোচনা করিতেছিলেন, এই সময়ে হৃদয়বাবু আসিয়া বলিলেন, "বাবা! প্রত্যহই নিমন্ত্রণে যাওয়া উপলক্ষ করিয়া নগরকীর্ত্তন হয়; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ত একদিনও নগরকীর্ত্তন হইল না!"

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! তোমাদের বিশুদ্ধ হৃদয়; তোমরা ব্যাকুলপ্রাণে নিতাইচাঁদকে জানাইলেই তিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

হৃদয়বাবু। আজ্ঞে আজ রবিবার; সকলেরই ছুটি আছে। আজ হইলেই ভাল হয় না কি?

বাবাজী। আচ্ছা! নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় তাহাই হউক।

শুনিয়া হৃদয়বাবু হৃষ্টচিত্তে নগরকীর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সংবাদ পরস্পরের মুখে সহরে প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই আজ নব উৎসাহে উৎসাহিত। বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণ সঙ্গে কাঠজুড়ি নদীতে স্নানাদি শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় বহুলোক আসিয়া একত্র মিলিত হইল। জনৈক ভক্ত প্রসাদী ফুলের মালা ও চন্দন আনিয়া বাবাজী মহাশয়কে সাজাইয়া দিলে ইনি প্রেমগদগদকণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিলেন :—

প্রকট অপ্রকট লীলার দুই ত বিধান।
প্রকট লীলায় করেন প্রভু নিজে নৃত্যগান॥

অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
কীর্ত্তন-বিহারী রূপে সদা বর্ত্তমান ॥
(প্রভুর) দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর ।
সম্মুখেতে নৃত্যাবেশে কুবের-কুমার ॥
গদাধরের বামে শ্রীবাস,আর নরহরি ।
চৌষট্টি মহান্ত দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করি ॥
সবাকার আগে নিতাই দুবাহু তুলিয়া ।
হরেকৃষ্ণ নামপ্রেম যান বিলাইয়া ॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি ।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥
এত বলি নাচে নিতাই হুঙ্কার করিয়া ।
আগুপাছু নাচে যত সঙ্গের সঙ্গিয়া ।
ভাবাবেশে গোরাচাঁদ নাচে বাহু তুলে ।
মুখ বুক ভেসে যায় নয়নের জলে ॥

(হের) ঐ গোরারায়, ভাই নিতাই সনে, আনন্দে হরিগুণ গায় রে ।
(গোরা) হরে কৃষ্ণ হরি বলি, প্রেমে দুটি বাহু তুলি রে,
কে নিবি কে নিবি বলি যাচিয়া বেড়ায় রে ॥
(গোরার) অরুণ কমল আঁখি, প্রেমে ঢুলু ঢুলু দেখি রে,
চরণে চরণ রাখি নাচি নাচি যায় রে ॥
(গোরা) রা রা রা রা রা রা বলি, ধা বলিতে পড়ে ঢলি রে,
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায় রে ॥
(গোরার) ঢল ঢল মুখচাঁদ, ভুবন মোহন ফাঁদ রে,
(যেন) অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদ উদিত ধরায় রে ।

চারিদিকে ভক্তগণ, করে হরিসংকীর্ত্তন রে,
হরি বলি গৌরহরি নাচে উভরায় রে ॥
ভকত মণ্ডলী মাঝে, নাচে গোরা নটরাজে রে,
হুঙ্কার করিয়া নাচে নিত্যানন্দ রায় রে।
পতিত পাষণ্ডী যত, নাচে গায় কত শত রে,
(আজ) প্রেমের বন্যায় ত্রিজগৎ ভেসে যায় রে ॥

এইরূপে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কটকের প্রতি গলি গলি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লোকে লোকারণ্য। সকলেরই দৃষ্টি বাবাজী মহাশয়ের উপর। মহাপুরুষ ভাবাবেশে কীর্ত্তন করিতেছেন, আর চরণে চরণ রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গিগণ লোকসংঘট্টের মধ্যে কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে ঠিক নাই। কি মনোহর দৃশ্য! ছোট বড় ভেদ নাই—ইতর ভদ্র দ্বেষাদ্বেষ নাই। শত শত মুখে কীর্ত্তন হইতেছে—শত শত হাতে তালি বাজিতেছে—শত শত লোক আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেছে। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। বালকবৃদ্ধ-যুবা সকলেই প্রেমবন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কটক সহর টলমলায়মান। যে রাস্তায় কীর্ত্তন যাইতেছে, সে রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এক অভিনব আনন্দে মাতোয়ারা হইতেছে। কেহ বা বাহিরে কেহ বা ছাতের উপরে, কেহ কেহ বা জানালার নিকট আসিয়া সংকীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করতঃ জীবন সফল মনে করিতেছে! সংকীর্ত্তন যে যে স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, সেই সেই স্থানের লোকসকল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে অবস্থান করিতেছে। আনন্দ জিনিষটি বাহিরের নয়, সুতরাং উহা ভাষায় ব্যক্ত করা বা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। আজ কটকবাসিগণ যে কি আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই

জানেন এবং শ্রীগুরুকৃপাবলে যাঁহারা সেই সঙ্গের সঙ্গী, তাঁহারাও সেই আনন্দ যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতেছেন। সকলেরই বাসনা যে, বাবাজী মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া ইঁহার সঙ্গসুখ অনুভব করেন এবং শ্রীমুখের সুধামাখা নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত করেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সকলের মনোভাব জানিতে পারিয়াই যেন এক এক বার চৌমাথার উপর দাঁড়াইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন। এই সুযোগে সকলেই একত্রিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেছেন।

যদিও জ্যোৎস্না রাত্রি তথাপি কেহ মশাল, কেহ লণ্ঠন, কেহ কেহ বা কেরোসিন আলোর যোগাড় করিয়া আনিতেছে। এ যোগাড় এক অপূর্ব্বভাবে; কাহারও বাধ্যবাধকতার বলে নয় অথবা কেহ কাহাকে প্রেরণাও করিতেছে না। নিতাইচাঁদ যাহার হৃদয়ে যেরূপ উদয় করিতেছেন, সে সেইরূপভাবে কার্য্য করিতেছে। কীর্ত্তনশ্রান্তিতে বাবাজী মহাশয় ঘর্মাক্তকলেবর। কেহ বড় পাখা, কেহ ছোট পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে; কিন্তু লোকসংঘট্ট হেতু কখন নিকটবর্ত্তী কখনও বা দূরবর্তী হওয়ায় সমানভাবে শ্রান্তি দূর হইতেছে না দেখিয়া নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী একখানি ছোট পাখা হাতে লইয়া বাবাজী মহাশয়ের মস্তকে বাতাস করিতে লাগিলেন। উড়িষ্যা ভ্রমণকালে নিত্যস্বরূপের প্রতি অপূর্ব্ব গুরুকৃপা সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন। নিত্যস্বরূপ খর্ব্বাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়, তথাপি সংকীর্ত্তনকালে বাবাজী মহাশয় দ্রুত বা ধীরভাবে যে অবস্থায়ই গমন করুন না কেন, অবিশ্রান্তভাবে ইঁহার মস্তকে বাতাস করিতেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি মধ্যাহ্ন, কি সায়াহ্ন, বাবাজী মহাশয় যে স্থানে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেন, নিত্যস্বরূপও পাখা-হাতে ঠিক সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

ক্রমে সহরের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া রাত্রি প্রায় এগারটার

সময় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। সে রাত্রে কোথাও নিমন্ত্রণ নাই ; কাজেই আশ্রমেই ঠাকুরের ভোগ দিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে সকলে শয়ন করিলেন।

বাবাজী মহাশয় শয়ন করিয়া আছেন, ললিতাদাসী বাতাস করিতেছে। রাত্র অনুমান দুইটার সময় বাবাজী মহাশয় হঠাৎ চমকিতভাবে ললিতা দাসীর বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "তুই কোন ভয় পাইয়াছিস কি ?"

ললিতা। (বিস্মিতভাবে) কই ! আমি ত কিছুই জানি না। কি হইয়াছে ?

বাবাজী। ছাতের সিঁড়ির উপর তুই কিছুই দেখতে পাস্ নাই কি ?

ললিতা। (ছাতের সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া) এতক্ষণ ত আমি কিছুই দেখি নাই ; আপনার কথা শুনিয়া এইমাত্র একটি স্ত্রীলোকের মত কে যেন উপরে যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। কি সুন্দর লম্বিত কেশকলাপ ! ও কে এবং কেনই বা এত রাত্রে ঐরূপভাবে যাইতেছে ?

বাবাজী। উনি এতদিন এই বাড়ীতেই ছিলেন। উঁহারই ভয়ে এ বাড়ীতে কেহ বাস করিতে পারে নাই। আজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থানত্যাগ করতঃ চলিয়া গেলেন।

ললিতা। তবে কি ও ভুত ?

বাবাজী। তা বই কি ! ভূত না হইলে অলক্ষিত ভাবে ঐরূপ চলিয়া যাইতে পারে কি ?

ললিতা। আপনাকে কি বলিল ?

বাবাজী। সে সমস্ত শুনিয়া কি হইবে ! তবে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল—"যে দিন আপনারা এই বাড়ীতে আসিয়া নামকীর্ত্তন করিলেন, আমি সেই দিনই চলিয়া যাইতাম, কেবল এমন অপূর্ব্ব সঙ্গ আর কখনও পাই নাই বা পাইব না বলিয়াই এ কয়দিন

ছিলাম। আজ আপনার নিকট বিদায় লইবার জন্য আসিয়াছি” বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক অন্যস্থানে চলিয়া গেল। মোট কথা—উহার উদ্ধার হইয়া গেল।

ললিতা। কি অপরাধে ও ভূত হইয়াছিল ?

বাবাজী। অপরাধ উহার জীবনে খুব কমই ছিল ; তবে প্রলোভনে পড়িয়া অনেক পাপকার্য্য করায় শেষকালে নিজের অপমৃত্যু হয়। তাই ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক সুকৃতি থাকা হেতু অল্প ভোগেই প্রভু উদ্ধার করিলেন।

এইরূপভাবে অনেক কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয় নিদ্রিত হইলেন। ললিতা দাসীও যথাস্থানে গিয়া শয়ন করিলেন।

পুরী প্রত্যাগমন

কাল কাহারও বাধ্য নয়। দেখিতে দেখিতে কটকে একমাস কয়েক দিন পরমানন্দে কাটিয়া গেল। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা নিকটবর্ত্তী দেখিয়া বাবাজী মহাশয় পুরী রওনা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কটকবাসী অনেক ভদ্রলোক আর কিছুদিন কটকে থাকিবার জন্য বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বাবাজী মহাশয় যখন একান্তই পুরী যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে কটক আসিবার জন্য সকলে বিশেষভাবে প্রার্থনা করায় ইনি নিতাইচাঁদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া মিষ্টবাক্যে সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করতঃ শ্রীধাম পুরী যাত্রা করিলেন।

স্টেশনে আসা হইল বটে, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলা কহা নাই এবং নিজ-সঙ্গিগণের নিকটও কোনরূপ অর্থের সংস্থান নাই। একজন সঙ্গী বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞে টিকিটের কিরূপ ব্যবস্থা

হইবে ?" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাবা ! আমার ত কোথাও যাইবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই ! যদি নিতাইচাঁদের প্রয়োজন হইয়া থাকে, ব্যবস্থা করিবেন, না হয় এই স্থানেই দশ দিন থাকা যাইবে। অগ্রপশ্চাৎ বিচারপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত করাই যদি দরকার হয়, তবে আর মিছামিছি একজনের দায় দিয়া লোকপ্রতারণা করিবার আবশ্যকতা কি ?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। মহাপুরুষ নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছেন। যাত্রিগণ ছুটাছুটি করিয়া টিকিট-ঘরে গমন করিতে লাগিল। হঠাৎ একটি কটকবাসী যুবক কয়েকখানি টিকিট আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে রাখিলে ইনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা ! তোমাকে কে টিকিট করিতে বলিল ?" যুবকটি ভীত-ভীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে আমাকে কেহই কিছু বলে নাই। আমি কাছারি হইতে বাসায় আসিয়া শুনিলাম, আপনি পুরী রওনা হইয়াছেন। তাই আপনার শ্রীচরণ দর্শন মানসে ষ্টেশনে আসিলাম। আসিয়াই কেন যেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কয়েকখানা টিকিট করিতে ইচ্ছা হইল। মনে ভাবিলাম—যদি বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, হয়ত তিনি নিষেধ করিবেন। তাই একেবারে আপনার সহিত দেখা না করিয়াই টিকিট আনিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "না বাবা ! অপরাধ কিছুই নয়, তবে আমি কেবল নিতাই-চাঁদের খেলা দেখিতেছি।" গাড়ী আসিলে সঙ্গিগণকে বলিলেন, "নাও, অভীষ্টলাভ হইয়াছে, আর অপেক্ষা কেন ? বড়ই ভাবিত হইয়াছিলে, তাই নিতাইচাঁদ দেখাইলেন। বলিয়া উপস্থিত কটকবাসী ভক্তবৃন্দকে মধুর বাক্যে আশ্বস্ত করতঃ গাড়ীতে উঠিলেন। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় শ্রীধাম পুরীতে আসিয়া নাম করিতে করিতে আশ্রমে পৌঁছিলেন।

রাঘবের ঝালি

আজ পুরীতে আবার নূতন আনন্দ। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন লইয়া জগন্নাথদেবের দর্শনে চলিয়াছেন। যাঁহার সহিত ইঁহার দেখা হইতেছে, তিনিই আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। যাহার জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা নাই বা নানা কাজে ব্যতিব্যস্ত, সেও আজ ইঁহার সঙ্গপ্রভাবে দর্শনে চলিয়াছে। "সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গঃ" এই শাস্ত্রবাক্যটির আজ প্রত্যক্ষানুভব হইতেছে। দোকানী দোকান ফেলিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে মন্দিরে যাইতেছে। উপবাসক্লিষ্ট রোগী প্রাণের বলে দর্শনে বাহির হইয়াছে। বালকগণ খেলা ছাড়িয়া আগে আগে ছুটিতেছে। বৃদ্ধগণ লাঠি ধরিয়া নাম করিতে করিতে পিছু পিছু চলিয়াছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য! অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি! এইরূপে ভক্তগণসমভিব্যাহারে মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীজগমোহনে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে লোকারণ্য। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাপূজারীগণ বহুদিন পরে আজ বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। জগন্নাথের শিঙ্গারী পাণ্ডা মাধব পশুপালক প্রসাদী মালা আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিবামাত্র ইনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিধ্বনি, উলুধ্বনি ও সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইল। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর! অনেক দিন পরে জগন্নাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন পাইয়া বাবাজী মহাশয় প্রাণের আবেগে নানারূপ পদাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর জগমোহন হইতে বাহির হইয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করতঃ ক্রমে গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল এবং সার্ব্বভৌমালয় দর্শনান্তে সমুদ্রস্নান করিয়া

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটাগোপীনাথ প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক ঝাঁজপিটা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইরূপ পরমানন্দে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তন-নর্ত্তনানন্দে স্নানযাত্রা উৎসব সমাপন করিলেন। পুরী ছাড়িয়া অনেকদিন স্থানান্তরে থাকাহেতু অনবসরে আর কোথাও যাওয়া হইল না। প্রত্যহ শেষ রাত্রে উঠিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে পঞ্চতীর্থ ভ্রমণ, স্নান এবং মন্দির পরিক্রমা প্রভৃতি আনন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিন অপরাহ্নে বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিটামঠে বসিয়া আছেন, হঠাৎ মনপ্রাণ-মাতাল সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণে বাহিরে আসিয়া দেখেন, প্রাণপ্রতিম প্রিয়শিষ্য শ্রীমান্ রামদাস বহু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রত্যেকের মাথায় এক একটি করিয়া দ্রব্য—চোখে জল—মুখে কেবল হা হুতাশ! সর্ব্বাগ্রে রামদাদা গাহিতেছেন ঃ—

দময়ন্তীদত্ত দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া।
আইলেন রাঘব পণ্ডিত যতনে লইয়া॥
(চলে রাঘব পথে পথে)
(ঝালি লইয়া মাথে)
(প্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে)

ইত্যাদি এক একটি করিয়া আঁখর দিতেছেন, আর আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রাণে “রাঘবের ঝালি” লীলাটির প্রকটতা জাগাইয়া দিতেছেন। ক্রমে ঝাঁজপিটামঠের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া ভাবুকচূড়ামণি রামদাদা পদ ধরিলেন—

গৌড় হইতে রাঘবের ঝালি সাজাইয়া।
আনিয়াছি তুয়া প্রাণগৌরাঙ্গ লাগিয়া॥
ঝালিমাথে গৌরাসাথে করিয়া মিলন।
শীতল করহ মোদের তৃষিত নয়ন॥
বড় সাধে আসিয়াছি নীলাচলপুরী।
তুয়া সহ দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
বারেক করুণা করি শ্রীরাধারমণ।
সেই লীলাখেলা মোদের করাও দরশন॥

গাহিতে গাহিতে মঠের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় প্রেমগরগরহৃদয়ে রামদাসকে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পঙ্গত ঘরে বসিলেন। ভক্তগণ একে একে সকল দ্রব্য বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে রাখিলে ললিতা দাসী এক একটি দ্রব্যের আবরণ মোচন করিয়া নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের নিকট পরিচয় দিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় এক একটি বস্তুর নাম শুনিতেছেন, আর চোখের জলে ইঁহার মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে এবং সর্ব্বশরীর পুলকপরিব্যাপ্ত হইতেছে। ক্রমে যেমন তিলের লাড্ডু ও পুরানো সুক্তাচুর্ণের নাম শুনিলেন, অমনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বহুসন্তর্পণে কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "দেখ, ভাইসকল! করুণাময় নিতাইচাঁদের কৃপায় কাল গম্ভীরায় রাঘবমিলনলীলা আস্বাদন করা যাইবে।" অনুরাগী ভক্তগণ বাবাজী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। যে ভক্তগণ দেশ হইতে কোনও দ্রব্য আনিতে পারেন নাই, তাঁহারা অতি আনন্দের সহিত বাজার হইতে নানাবিধ দ্রব্য আনিয়া প্রাণের আবেগ মিটাইতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে আদেশ করিলেন,

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাঘবের ঝালির যেরূপ বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে যে যে বস্তুর অভাব থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখ।" শুনিয়া ললিতাদাসী দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিতা হইয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। কাপড়ের কুথলি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানারূপ দ্রব্য ভরিয়া রাখিলেন। নানারূপ আচার, মোরব্বা প্রভৃতি ছোট বড় মাটির পাত্রে করিয়া ছোট ছোট ঝুড়ির মধ্যে রাখিলেন। ঝাললাড়ু, ব্যাসনলাড়ু, মুদগলাড়ু প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য ঘরে প্রস্তুত করিয়া এক একটি পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং শ্রীচরিতামৃত দেখিয়া দেখিয়া দ্রব্যসকল যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রাণের আবেগে এক একবার আসিয়া দেখিতেছেন, আর ইহাদিগকে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক একত্রিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় এক একজনের মস্তকে এক একটি দ্রব্য দিয়া সারি সারি দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং নিজেও একটি জিনিষ মাথায় লইয়া কীর্ত্তন ধরিলেন ঃ—

কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর গোরা নটরায়।
গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায় ॥

বহুদিন দেখি নাই ও চাঁদ বদন।
বারেক করুণা করি দেহ দরশন ॥

শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুঁহু অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাসাদি ধন্য ॥

বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥

মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান্ ॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই আইলা নাম না যায় গণন ॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর শিবানন্দ।
আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র ॥
দময়ন্তীদত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া।
আইলা রাঘব পণ্ডিত ঝালি সাজাইয়া।
তোমা না দেখিয়া সবে বিষাদে মগন।
একবার দেখা দাও শচীর নন্দন ॥

অতি ব্যাকুলভাবে এই পদ গান করিতে করিতে যেমন কাশী মিশ্রালয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, অমনি মহাপ্রভুর প্রতিনিধিস্বরূপ বলভদ্র দাস মহান্ত মহারাজ প্রসাদী মালা আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিলেন এবং পরস্পর প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক গম্ভীরা গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় ভাবাবেশে গোবিন্দজ্ঞানে গম্ভীরাগৃহাভ্যন্তরস্থ পূজারীর হস্তে এক একটি করিয়া দ্রব্য প্রদান করিতেছেন, পূজারীও উহা গৃহের এক পার্শ্বে রাখিয়া ইঁহাদের ভাবোদ্দীপন করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় গাহিতেছেন :—

ধর নাও হে গোবিন্দ রে'খ যতন ক'রে।
মনোভাব বুঝি তুমি দিও গৌরাঙ্গেরে ॥
দময়ন্তী দেবী সাক্ষাৎ বাৎসল্যের মূর্ত্তি।
দিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গে করি কত আর্ত্তি ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
অপরূপ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যেন করেন উপভোগ ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)

আমকাসুন্দি আদাকাসুন্দি ঝালকাসুন্দি আর।
লেম্বু আদা আম্রকোলি বিবিধ প্রকার ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
আম্‌সি আম্রখণ্ড আর তৈলাম্র আম্‌তা।
চুর্ণ করি দিয়াছেন পুরানো সুকুতা ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
সুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুক্তায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বাঁধি দিয়াছেন চিনিপাক করিয়া ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
শুণ্ঠীখণ্ড লাড়ু হয় আমাপিত্ত হর।
পৃথক্ পৃথক্ বাঁধা আছে কুথলি ভিতর ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
কোলি শুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর
কত নাম লব যত প্রকার আচার ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার দিয়াছে সকল ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
শালিকাচুটী ধান্যের আতপ চিড়া করি।
দিয়াছেন বড় বড় কুথলিতে ভরি ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
কতক চিড়া হড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে লাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
শালি তণ্ডুল ভাজা চুর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্তে লাড়ু কৈল চিনি পাক দিয়া ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)

ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূর দিয়া লাড়ু করি দিল॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
কভু নাহি জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা দ্রব্য দিল সহস্র প্রকার॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
গঙ্গা মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ী করিয়া দিল গন্ধ দ্রব্য দিয়া॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
কহিতে না পারি নাম কতেক প্রকার।
দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি-উপহার॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
যতন করিয়া সব করাঞো ভোজন।
যেমতে পায়েন প্রীতি শচীর নন্দন॥ (ধর নাও হে গোবিন্দ)
দময়ন্তীদত্ত দ্রব্য সঁপিনু তোমারে।
অবসর জানি দিও প্রাণ বিশ্বম্ভরে॥
হেনমতে রাঘব পণ্ডিত ঝালি সমর্পিল।
ভোজন গৃহের কোণে গোবিন্দ রাখিল॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈঞা॥

আনন্দের অবধি নাই। বহুলোক সমাগম; কিন্তু সকলেই একভাবে নিমগ্ন—সকলেই মহাপ্রভুর প্রকট লীলা অনুভব করতঃ প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইতেছেন। অধিকারী, মহান্ত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বাবাজী মহাশয়ের ভাবগদগদ কণ্ঠের সুমধুর পদাবলী শ্রবণে এবং নবাগত ভক্তগণের ভাব-ব্যাকুলতা দর্শনে অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ধন্য নিতাই-গৌরাঙ্গগতপ্রাণ বাবাজী মহাশয়! ধন্য ইঁহার ভক্তগণ! ইঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে প্রকটলীলা আস্বাদন করিয়া আজ আমরাও ধন্য হইলাম। বেলা অতিরিক্ত হওয়ায় ভক্তগণের শ্রম জানিয়া বাবাজী

মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। মহান্ত বলভদ্র দাস এবং অধিকারী হরিভজনদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণ মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহসহকারে বাবাজী মহাশয়কে সগণে সেই স্থানে রাখিলেন। বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিনিধি জ্ঞানে মহান্তের ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ পাইয়া সকলে নাম করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন দর্শন-মানসে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। পনের দিন পরে আজ জগবন্ধুর চাঁদবদন দর্শনে ভক্তগণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতেছেন। সকলেই বাহ্যস্মৃতি-রহিত। বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে সঙ্গে লইয়া ভাববিভাবিতচিত্তে অভিনব পদাবলী গান করতঃ নিজে ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিতেছেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন নর্ত্তন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

রাত্র প্রভাত হইল। আজ শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন। বলরাম বাবুর উপর যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহের ভার। তিনি সমস্ত যোগাড় করিয়া মঠে আসিলেন। বলরামের ভক্তিভাব এবং কার্য্যকৌশল দেখিয়া সকলেই উঁহার প্রতি পরম প্রীত হইলেন। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন লইয়া জগন্নাথ-দেবের দর্শনে গমন করিলেন। মন্দিরে যাঁহাদের সহিত দেখা হইল, তাঁহাদিগকে অপরাহ্নে গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমে সকলে স্নানাহ্নিকাদি শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দেব গোস্বামী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন-পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অতি সমারোহের সহিত মন্দির মার্জ্জন, ক্ষালন, জলকেলি, মহাপ্রসাদসেবা প্রভৃতি লীলা সমাধা করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকলেই নিজ নিজ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া প্রস্তুত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও স্নানাহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে গমন করিলেন। আজ রথযাত্রা। তিনখানি রথ আসিয়া সিংহদ্বারে লাগিয়াছে। রথে উঠিবার জন্য চার বাঁধা হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শুভ বিজয় করিলেন। সেদিন আর রথ টানা হইল না। পরদিবস বেলা নয়টার সময় টান আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ রথাগ্রে সগণে কীর্ত্তন নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সাতদিনে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ প্রত্যহ কীর্ত্তন লইয়া গুণ্ডিচা মন্দিরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবম দিনে যাত্রা শেষ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব নিজমন্দিরে শুভাগমন করিলেন। এইরূপ কীর্ত্তনানন্দে বাবাজী মহাশয় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

—:*:—

উড়িষ্যা ভ্রমণ *

—:**:—

কেন্দ্রাপাড়া গমন

কেন্দ্রাপাড়ার জমিদার ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর নরেন্দ্র জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম পুরীতে আসিয়াছেন। তিনি সগণে বাবাজী মহাশয়কে একবার কেন্দ্রাপাড়ায় লইয়া যাইবার জন্য বহুদিন হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। একদিন প্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক ঝাঁজপিটা মঠে বসিয়া আছেন, এই সময়ে শ্যামসুন্দর বাবু উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই দিনই কেন্দ্রাপাড়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্রস্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্নে বহু ভক্তসমাগম হইতে লাগিল। তাঁহাদের সহিত নানারূপ তত্ত্বকথা আলোচনার পর উড়িষ্যা ভ্রমণে যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে রাধাকান্ত দেবের আরতি দর্শন করতঃ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক রাধাকান্ত জীউর সেবার জন্য দুই তিন মূর্ত্তি রাখিয়া সগণে নাম করিতে করিতে পুরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

---

*কেন্দ্রাপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর নরেন্দ্র মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি পাওয়া গিয়াছে।

শ্যামসুন্দর বাবু পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহারা গাড়িতে উঠিয়াই নাম করিতে আরম্ভ করিলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও নামে বাধা দিবার ইচ্ছা থাকিলেও বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিলেন না। বাবাজী মহাশয় এবং ইঁহার প্রধান প্রধান কয়েকজন সঙ্গীদের জন্য শ্যামসুন্দর বাবু ইণ্টারক্লাসের টিকিট করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বাবাজী মহাশয় তাহাতে অমত করিয়া বলিলেন, "দেখ শ্যামসুন্দর! একসঙ্গে আহারে বসিয়া ব্যক্তিগত তারতম্য করা এবং যানবাহনাদিতে উচ্চ-নীচ বিচার করিয়া চলা সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মবিরুদ্ধ। মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। সময় সময় তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, "ভাল ভাল দ্রব্য-সকল ভক্তগণকে দিয়া আমাকে লাফরা ব্যঞ্জন দাও।" অতএব যদি আমাকে ভালবাস এবং আমাকে সুখী করিতে চাও, তবে যাহাতে অন্য বাবাজী বৈষ্ণবগণ বা ছেলেদের সহিত আহার-ব্যবহারে আমার কোনরূপ তারতম্য না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।" শ্যামসুন্দর বাবু একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে সকলেরই ইণ্টারক্লাসের টিকিট করি?" বাবাজী মহাশয় নিষেধ করিয়া বলিলেন, "বাবা! নিষ্প্রয়োজনে অর্থব্যয় করিবার দরকার নাই। তোমাদের বৈষ্ণবসেবার সংসার। সদ্ভাবে ব্যয় কর, আনন্দ পাইবে।" কাজেই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করিয়া সকলে পরমানন্দে কটক পেঁীছিলেন। তথায় একদিন থাকিয়া তৎপরদিন বোটে কেন্দ্রাপাড়া রওনা হইলেন।

যথাসময়ে বোট কেন্দ্রাপাড়ায় পেঁীছিল। শ্যামসুন্দর বাবুর ইচ্ছা—বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে করিয়া লইয়া যান; কিন্তু বাবাজী মহাশয় কিছুতেই সম্মত না হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পদব্রজে রওনা হইলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইল। চারিদিকে

হুলস্থুল পড়িয়া গেল।" "পুরী হইতে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি সখী আছেন, তাঁহারা নৃত্যাদি করিয়া থাকেন, ঐ মহাপুরুষ অতি মধুর সংকীর্ত্তন করেন" এই কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; সুতরাং চারিদিক্ হইতে বহুলোক আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। সাধু বৈষ্ণবগণ কেন্দ্রাপাড়ায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহারা যেন কেমন এক নূতন ধরণের বৈষ্ণব। সকলেরই নূতন ধরণের চাদর বাঁধা—নূতন ধরণের নাম—নূতন ধরণের কীর্ত্তন—নূতন ধরণের নৃত্য। দেখিয়া শুনিয়া লোকসকল অত্যন্ত বিস্মিত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের সেই সুমধুর নৃত্যভঙ্গি দেখিয়া আপামর সাধারণ যেন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই গোবিন্দ দেবের মন্দিরে* পেঁছিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। গোবিন্দদেবের ভুবনমোহন মূর্ত্তি দর্শনে দুইটি নয়ন-ধারায় বাবাজী মহাশয়ের বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী বিভূষিত। ইঁহার তাৎকালিক ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ইনি এ রাজ্যে নাই। তখন প্রেমে গরগর হইয়া ভাবগদগদকণ্ঠে পদ ধরিলেন।

আহা মরি মরি, কি রূপমাধুরী
নাগরী নাগররাজ।
এ তিন ভুবনে, নাহিক তুলনা,
মদনমোহন সাজ॥
আধ বরণ, চিকণ কালিয়া,
আধ কনক কাঁতি।
নব জলধরে, জনু সৌদামিনী,
মিলিল কতেক ভাঁতি॥

---

*শ্যামসুন্দর বাবুর ঠাকুর বাড়ীতে।

আধ শিরে শোহে, ময়ূর মুকুট,
ঈষৎ বামেতে হেলা।
আধ শিরে বেণী, জনু ভুজঙ্গিনী,
ময়ূর সহিত মেলা ॥
আধ ললাটে, চন্দন তিলক,
(জনু) জলদে মিলিত শশী।
আধ ভালে শোহে, সিন্দূর কস্তুরী,
(জনু) অরুণে তিমির রাশি ॥
আধ গলে দোলে, বনফুল হার,
আধ গলে গজমতি।
আধ নাসিকায়, মুকুতা দোলনী,
আধ নাসিকায় মোতি ॥
আধ কটিতে, পীত ধটি শোহে,
আধ নীলিম সাড়ী।
আধ করে শোহে, কনক বলয়া,
আধ করে নীলচূড়ি ॥
(দোঁহার) কটিতে কিঙ্কিণী, চরণে নূপুর,
মধুর মধুর বাজে।
ডাহিনে ললিতা, বামে শ্রীরাধিকা,
শোহে মনমথ রাজে ॥

এইরূপ ভাবে বহু বহু পদ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। আনন্দের অবধি নাই। চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন-সমাপ্তি করিলেন। শ্যামসুন্দর বাবুর অপর চারি সহোদর আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাবাজী

মহাশয় উঁহাদিগকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ নানাবিধ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা অতি বিনীত ভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া গোবিন্দ-দেবের ঝুলনঘরে ইঁহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় এবং ইঁহার সঙ্গীগণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন, এই সময়ে গোবিন্দ জীউর আরতি ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে ইঁহারা সকলে আরতি দর্শনান্তে আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এদিকে গোবিন্দদেবের নানাবিধ ভোগের যোগাড় হইতে লাগিল। রাত্র আন্দাজ একটার সময় সকলে পরমানন্দ সহকারে গোবিন্দ জীউর মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন

গোবিন্দজীউর বাড়ীতে প্রত্যহই সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। নিত্য নূতন পদ—নিত্য নূতনভাবে সংকীর্ত্তন। কয়েকদিন যায়—একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ শ্যামসুন্দর! অনেকদিন যাবৎ অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হয় নাই; অতএব নিতাইর ইচ্ছায় একটি অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হউক।" শুনিয়া শ্যামসুন্দর বাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "আজ্ঞে কিরূপভাবে কি কি যোগাড় করিতে হইবে এবং কোথায় স্থান নির্দ্দেশ করা হইবে?" তখন বাবাজী মহাশয় অষ্টপ্রহরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল উল্লেখ করতঃ উহাদের ওয়াসের* উত্তর পার্শ্বস্থ দোতলা কোঠার সম্মুখে অষ্টপ্রহরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ক্রমে সমস্ত যোগাড় হইতে লাগিল।

আজ অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের অধিবাস। বেলা আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় সংবাদ আসিল যে, শ্যামসুন্দর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল

*নিজ বাটীর।

বাবুর অবস্থা অতি শোচনীয়। বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামসুন্দর! গোকুলের কি অসুখ বল দেখি।"

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে অনেকদিন হইতে তাহার শূলবেদনা আছে। উহার প্রতিকারের জন্য বহু বহু চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। সংপ্রতি কয়েকদিন হইল, ভয়ানক কম্প উপস্থিত হইয়াছে। সে কম্প দেখিলে মনে হয় এই মুহূর্ত্তেই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখান হইল; কলিকাতা হইতে অনেক ঔষধ আনা হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। সংপ্রতি যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। এতই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে যে দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

বাবাজী। সে কোথায় আছে?

শ্যামসুন্দর। এই যে আমাদের কাছারীবাড়ীর একপার্শ্বে একটি কুঠরীতে রাখা হইয়াছে।

বাবাজী। কি খাওয়া দাওয়া করে?

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে খাওয়া ত দূরের কথা—একটু দুধ পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ হইতেছে না।

বাবাজী। আহা! ছেলেটি বড়ই কষ্ট পাইতেছে। চল, একবার দেখিয়া আসি।

এই বলিয়া শ্যামসুন্দরের সঙ্গে গোকুলের নিকট গমন করিলেন। গোকুল একখানি খাটের উপর শয়ন করিয়া আছে। অতি ক্ষীণকায়—অনবরত কম্প হইতেছে। চারি পাঁচজন উহার হাত পা ধরিয়া বসিয়া আছে। সকলেরই মুখ ম্লান। বাবাজী মহাশয় খাটের এক পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক গোকুলের বুকের উপর হাত দিয়া বলিলেন, "গোকুল!

কেমন আছ বাবা ?" গোকুলের বাক্‌শক্তি রহিত ; সে কম্পিত কলেবরে কাতর নয়নে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া যেন চিরকালের মত ইঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিল। বাবাজী মহাশয়ও মনে মনে কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন। হঠাৎ চোখে জল আসিল—সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবলীতে ভূষিত হইল। গোকুলের বুকের উপর বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত রহিয়াছে। ক্রমে ইঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্য ! উভয় দেহের কম্পে পাশ্বর্ঁস্থিত লোকসকল এবং দ্রব্যাদি যেন কি এক ভীষণ তরঙ্গ মধ্যে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে জলে জল মিশিয়া গেল অর্থাৎ বাবাজী মহাশয়ের কম্পের মধ্যে গোকুলের কম্প আসিয়া প্রবেশ করিল। গোকুল উঠিয়া বসিল এবং বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ নিজ মস্তকে ও বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া বহুজন্মার্জ্জিত তাপের শান্তি করিল। তখন বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোকুল ! এখন সুস্থ আছ ? কোনরূপ কষ্ট অনুভব হইতেছে না ত ?

গোকুল। আজ্ঞে আপনার কৃপায় আমি পরম শান্তি লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি দৈহিক বা আন্তরিক কোনরূপ জ্বালাযন্ত্রণা নাই।

বাবাজী। এই সমস্ত শিশি ও বোতলে কি আছে ?

গোকুল। আজ্ঞে এই অসুখের জন্য কলিকাতা হইতে ঔষধ আনা হইয়াছিল।

বাবাজী। আরও ঔষধ খাইবার মন আছে ?

গোকুল। আজ্ঞে আপনার যাহা আদেশ হইবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

বাবাজী। আচ্ছা, আমি যদি এইগুলি এখন জলে ফেলিয়া দিতে বলি, তুমি পারিবে কি ?

গোকুল। আপনার কৃপা হইলে নিশ্চয়ই পারিব।

বাবাজী। আচ্ছা! তবে এই ঔষধগুলি তোমাদের ঐ গোবরা নদীতে নিজ হস্তে ঢালিয়া ফেল ত।

গোকুল তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে অনুমান চারিশত টাকার ঔষধ বিনা বিচারে গোবরা নদীতে ঢালিয়া দিয়া আসিল। আসিয়াই বাবাজী মহাশয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিবামাত্র ইনি উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। হঠাৎ গোকুলের ঈদৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তনে সকলেই পরমানন্দিত ও বিস্মিত হইলেন এবং বাবাজী মহাশয়ের অলৌকিক শক্তির কথা লইয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দর বাবুর আনন্দের আর অবধি রহিল না। ক্রমে ইঁহারা স্নানাহ্নিকাদি করিয়া মহাপ্রসাদ পাইলেন। গোকুলও বাবাজী মহাশয়ের আদেশে স্নান করিয়া ইঁহার অধরামৃত পাইল।

দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় গোবিন্দ জীউর আরতি অন্তে আজ্ঞামালা ও চন্দনাদি লইয়া অধিবাস কীর্ত্তন করিলেন। যথানিয়মে পূর্ণঘটস্থাপন ও খোলমঙ্গলাদি সংকীর্ত্তন মহোৎসবের অধিবাস শেষ করিয়া শ্যামসুন্দর বাবুদের পাঁচ ভাইকে আদেশ করিলেন, "তোমরা পাঁচ ভাই আগামী কল্য অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গোবিন্দ জীউর মন্দিরে উপস্থিত হইবে।" শুনিয়া সকলে অতি হৃষ্টচিত্তে বাবাজী মহাশয়ের কথায় স্বীকৃত হইলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে শ্যামসুন্দর বাবুরা পাঁচ ভাই স্নানাদি করিয়া গোবিন্দজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইবামাত্র বাবাজী মহাশয় গোবিন্দজীউর বড় পূজারী আনন্দ পাণ্ডাকে বলিলেন, "দেখ, তোমাদের মন্দির মধ্যে যে গোপাল যন্ত্র আছে, তাহার একটু চরণামৃত দাও ত।" পূজারী শশব্যস্তে সেই যন্ত্রের চরণামৃত আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিবামাত্র ইঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং দুটি চোখের জলে মুখবুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তখন গদগদকণ্ঠে সঙ্গিগণকে নাম করিতে বলিলে সকলে সমস্বরে "ভজ

নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।” এই নাম ধরিল। জগমোহনে প্রায় শতাধিক লোক। বাবাজী মহাশয় গোবিন্দজীউর বারান্দায় থাকিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলনপূর্ব্বক প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন তিনিই জানেন। সংকীর্ত্তনরোলে কেবলমাত্র “ওঁ ওঁ” এই শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে উপস্থিত জনমণ্ডলী সমকালীন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। কেন কি উদ্দেশ্যে কাঁদিতেছে, কেহই অবগত নহে! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপ ভাবে কাটিয়ে গেলে বাবাজী মহাশয় সকলকে লইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব্ব নামের ধ্বনিতে দিঙমণ্ডল মুখরিত হইল। সকলেই মাতোয়ারা—বাহ্যস্মৃতি-রহিত। ক্রমে যেমন বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকসংখ্যা তেমনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! কেন্দ্রাপাড়া হইতে পাঁচক্রোশ মধ্যে যত সংকীর্ত্তনের দল আছে সকলেই আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। মানী মর্য্যাদা খুঁজিতেছেন না—অর্থকামী অর্থ প্রার্থনা করিতেছেন না দলপতি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করিতেছেন না—ভদ্রলোক নিজ সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না; যেন কি এক অভিনব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন। এক একটি দল খোল করতাল যোগে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল উত্তাল তরঙ্গমালায় নানাদিগ্‌দেশ প্লাবিত করতঃ গভীর গর্জ্জনশীল অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রে মিলিত হইতেছে। আনন্দসাগর যেন উথলিয়া উঠিল। নামের তরঙ্গ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। বালকবৃদ্ধ, পুরুষনারী আপামর সাধারণ জনগণ সেই তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কেন্দ্রাপাড়াবাসিগণ আজ অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছে। আবালবৃদ্ধযুবা সকলেই যেন কি এক অপ্রাকৃত নেশার ঘোরে মাতিয়াছে।

কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত বালকগণ আত্মহারাভাবে নৃত্য করিতেছে। এই সময় উহাদের মাতাপিতা উহাদিগকে কীর্ত্তনমণ্ডলী হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য হাতে ধরিয়াছেন ; কিন্তু উলঙ্গ বালকগণ সেই অবস্থাতেই "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বলিয়া নৃত্য করিতেছে। যদি বা কেহ বলপূর্ব্বক বাড়ী লইয়া যাইতেছে, সেও তাহাদের অজ্ঞাতসারে অতি দ্রুতবেগে আসিয়া পুনরায় কীর্ত্তনে যোগ দিতেছে। পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া রাখাল বালকগণ গোমহিষাদি লইয়া যাইতেছিল ; নামের আকর্ষণে গো-মহিষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। বোঝারিগণ বোঝা মাথায় করিয়াই সংকীর্ত্তনধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া গা দোলাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কীর্ত্তনমণ্ডলী আলাতচক্রের ন্যায় দ্রুত-বেগে ঘুরিতেছে। উহার মধ্যেই বাবাজী মহাশয় এক এক জনকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন, আর সে দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। সংকীর্ত্তনধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। এইরূপভাবে অতিবেগে নামের প্রবাহ চলিতে লাগিল। সে আনন্দের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

সুখের সময় যেন অতি শীঘ্রই চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে দিবারাত্র কাটিয়া গেল। পরদিবস বাবাজী মহাশয়ের আদেশে নিশান খুন্তি যোগাড় করিয়া নগরকীর্ত্তন বাহির করা হইল। বাবাজী মহাশয় অগ্রে অগ্রে নাম ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্য লোক পরমানন্দে নৃত্য করিয়া যাইতেছেন। কেন্দ্রাপাড়া-বাসিবাসিনীগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই ; কেন্দ্রাপাড়া আজ ধন্য হইল। ধন্য শ্যামসুন্দর বাবু ! তাঁহারই অনুগ্রহে আজ আমরা এহেন মহাপুরুষের দর্শন পাইলাম। আমরা এস্থানে অনেক সাধুবৈষ্ণবের দর্শন করিয়া থাকি ; কিন্তু এরূপ

মহাশক্তিসম্পন্ন রসময়বিগ্রহ আর কখনও দেখি নাই,—দেখিব বলিয়া আশাও নাই।" এই প্রকারে যাহার যেরূপ ধারণা, সে সেইরূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে কেন্দ্রাপাড়া গ্রাম পরিক্রমা করতঃ আপামর সাধারণকে প্রেমানন্দসাগরে ভাসাইয়া বেলা অনুমান একটার সময় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। সেদিন গোবিন্দদেবের বিশেষ ভাবে ভোগরাগের যোগাড় হইয়াছিল। ভোগের পর বহুসংখ্যক বৈষ্ণব এবং দুঃখী কাঙ্গালী মহাপ্রসাদ পাইল। বিদেশস্থ কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের লোকসকল বাবাজী মহাশয়কে একবার তাহাদের দেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে ইনি মধুর বাক্যে সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

—*—

পদ্মনাভ উদ্ধার

একদিন সদলবলে শ্রীগোবিন্দদেবের চন্দনপুকুরে স্নান করিতে গিয়া বাবাজী মহাশয়ের মনে কি খেয়াল হইল—বলিলেন, "দেখা যাক্, সাঁতার দিয়া কে আগে চন্দনপুকুরের মধ্যস্থিত মন্দিরে যাইতে পারে।" শ্যামসুন্দরবাবু বলিলেন, "তবে সকলে একসঙ্গে সাঁতার দিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "না, তোমরা সকলে আগে থাকিবে, আমি তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।" তাহাই হইল। বাবাজী মহাশয় হাতের সাহায্য ব্যতীত সাঁতার দিতে লাগিলেন; সুতরাং সকলেই মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই ইনি পশ্চাতে পড়িবেন। বুক পর্য্যন্ত জলের উপর রহিয়াছে; বুকের উপর দুইখানি হাত রাখিয়া করজপ করিতেছেন—দর্শকবৃন্দ দেখিয়া অবাক্! বোধ হইতেছে যেন পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছেন। ক্ষণকাল মধ্যে জানি না কি কৌশলে হঠাৎ উনি সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া একেবারে সেই জলমধ্যস্থিত পর্ব্বতাকার ভূমিতে গিয়া উপবেশন করিলেন। ক্রমে সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই পরিশ্রান্ত; বাবাজী মহাশয় কিন্তু কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করেন নাই। গোবিন্দজীউর বিহারভূমি দর্শন করিয়া পরমানন্দিতচিত্তে সকলকে বলিলেন, "দেখ, এই স্থানটি বড়ই মনোরম। এই স্থানে বসিলে শ্রীকুণ্ডাভ্যন্তরস্থ বিলাসমন্দিরের লীলাসকল মনে পড়ে।" কিছুক্ষণ এইভাবে নানারূপ লীলাকথা আলোচনা করতঃ সকলে তীরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শুষ্ক বস্ত্রাদি পরিধান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ আনন্দময়ের লীলাখেলা দর্শনে পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে নাম করিতে করিতে গোবিন্দদেবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে হঠাৎ অনুমান চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক একটি ব্রাহ্মণযুবক আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ দুইখানি ধারণপূর্ব্বক অতি ব্যাকুল-ভাবে রোদন করিতে লাগিল। কি জাতীয় ভাষায় কি যে বলিতেছে কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। কথার মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত কিছু কিছু ইংরাজী মিশ্রিত রহিয়াছে। সে স্থানে এমন কেহই ছিল না যে, উহার সেই রজে গড়াগড়ি, সেই আর্ত্তি, সেই হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন এবং ভক্তিমাখান গদগদ কণ্ঠের কাতরোক্তি প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাহার চোখে জল না আসিল। বাবাজী মহাশয় অতিশয় ব্যগ্রভাবে উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিবামাত্র সে পুনরায় ভূতলে পতিত হইয়া অতি ব্যাকুলভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মুখে কেবলমাত্র "গুরো! কৃপাং কুরু" এই বুলি। কার সাধ্য তাহাকে স্থির করে? তখন বলরামবাবু প্রভৃতি সকলেই উহাকে মন্ত্র প্রদান করিবার জন্য বাবাজী মহাশয়কে অনু-রোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ও উহার ব্যাকুলতা দর্শনে নিতাইচাঁদের অভিমত জানিয়া উহার কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিলেন। ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণযুবক এতক্ষণে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থজ্ঞানে "ধন্যোঽস্মি কৃত-কৃত্যোঽস্মি কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। মন্ত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যুবকের দেহে সাত্ত্বিক বিকারসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে কাতরভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণধারণপূর্ব্বক প্রাণের আবেগে মিশ্রিত ভাষায় নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল উপদেশ প্রদান করিলেন, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ইংরাজী ভাষায় তাহা উহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। বলরামবাবু উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে ইংরাজীতে বলিল, "আমার নাম পদ্মনাভ। জাতিতে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। নিবাস মলিয়ালম্‌ দেশে অর্থাৎ কুমারিকা প্রদেশে।

আমি এম্. এ, পাস্ করিয়াছি। সম্প্রতি বেদান্ত পড়িবার জন্য কাশীধামে যাইতে মনস্থ করিয়াছি।" শুনিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। এই দিন হইতে পদ্মনাভ একটি দেবপ্রকৃতির লোক হইল। কণ্ঠে পাঁচকণ্ঠী তুলসীমালা, ললাটে তিলক। হিংসা জিনিষটি তাহাতে আছে বলিয়া বোধ হইত না। এই হইতেই উক্ত পদ্মনাভ, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে রহিল। ক্রমে বলরাম বাবু, শ্যামসুন্দর বাবু, ব্রজসুন্দর বাবু, বৃন্দাবন বাবু, গোকুল বাবু, প্রভৃতি সকলেই বাবাজী মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন যায়—একদিন বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুর দোতলার উপরে বসিয়া আছেন। শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি কয়েকজন কাছে বসিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নীচের তলায় কয়েকজন চাকর ও অন্যান্য বাহিরের লোক রহিয়াছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণমান সিংহ নামক একটি লোক আস্তে আস্তে অপর একজনের নিকট বলিতেছে, "বড় বাবাজী মহাপ্রভু যেত্তে বড় বড় লোক মানঙ্কু ডাকি হাঁকি জোর জবরদস্তি করি মন্ত্র দেউছন্তি এ গরীবকু আর কিয়ে পচারে? কৃষ্ণার ত আউ পয়সা নাহি, মন্ত্র পাইবারও সম্ভব নাই।" এদিকে বাবাজী মহাশয় হঠাৎ অতি চঞ্চলভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন শ্যামসুন্দর বাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কই কৃষ্ণ ত এস্থানে নাই!"

বাবাজী। তুমি একজনকে পাঠাইয়া দাও। কৃষ্ণমান সিংহ নীচের তলায় রহিয়াছে। তাহাকে উপরে লইয়া আসুক।

তখন শ্যামসুন্দর বাবু একজনকে পাঠাইয়া দিলে সে কৃষ্ণকে বাবাজী মহাশয়ের কথা বলায় কৃষ্ণ অতি ভীতভীত চিত্তে দোতলায় যাইয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি রে কৃষ্ণ! তুই কি বলিতেছিলি—আমি কেবল বড় লোককে জোর জবরদস্তি করিয়া

মন্ত্র দিই, কিন্তু গরীবের প্রতি লক্ষ্য নাই। বাবা! এটা তোমার ভুল; মন্ত্রদাতা নিতাইচাঁদের কাছে ছোটবড় সকলেই সমান; বরং বড়লোক অপেক্ষা কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার করুণা অধিক—কেবল সময় সাপেক্ষ।" এই বলিয়া কৃষ্ণকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন কৃষ্ণ নিজ কল্পনার জন্য অপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া বড়ই দুঃখিত চিত্তে বাবাজী মহাশয়ের চরণ-ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অভয় প্রদান করিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে কৃষ্ণ কি বলিয়াছিল?"

বাবাজী। ওসব কিছুই নয়। উহার মনে একটা ভাব আসিয়াছিল যে, বড় বাবাজী মহাশয় কেবল বড়লোকদিগকেই জোর জবরদস্তি করিয়া মন্ত্র দেন; কিন্তু কৃষ্টার ত আর পয়সা নাই বা বড়লোক নহে, তাহাকে আর কে জিজ্ঞাসা করে?

শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করায় সে কাতরভাবে বলিল, "আজ্ঞে মু তলে বসি ঠিক এহি কথা কহুথিলি, অন্তর্য্যামী প্রভু ত সবু জানি পারিলে মু আউ কণ কহিবি।" শুনিয়া সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এইরূপে কেন্দ্রাপাড়ায় নানাবিধ ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়ী লীলা খেলায় পরমানন্দে দিন যাইতে লাগিল।

—*—

লক্ষ্মীনারায়ণ জগদেব

একদিন শ্যামসুন্দর বাবুর ভ্রাতা জমিদার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ জগদেব সগণে বাবাজী মহাশয়কে প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ যে একটু লীলাকীর্ত্তন হয়; কিন্তু প্রকাশ্যে কাহাকেও কিছু বলেন নাই। রাধাগোবিন্দের নৌকাখণ্ড উদ্দীপনের জন্য প্রাণের আবেগে নৌকা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে রাধাগোবিন্দ জীউকে বসাইয়াছেন। সন্ধ্যার পর বাবাজী মহাশয় নাম করিতে করিতে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত নৌকাখানি জলের উপর এরূপ অপূর্ব্বভাবে ভাসান হইয়াছে যে, দেখিয়া সকলেই অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু বাবাজী মহাশয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে একটি সখের যাত্রার দল আছে, আপনার আদেশ হইলে একবার উপস্থিত করা যায়।"

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বেশ ত! অতি আনন্দের কথা।" বলিবামাত্রই লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর ভাগিনেয় কৃষ্ণ বাবু বিশেষ উদ্যোগের সহিত গান আরম্ভ করাইয়া দিলে ইনি গান শুনিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন। যথাসময়ে গান সমাপ্ত হইলে বাবাজী মহাশয় স্বরচিত পদে মানস গঙ্গায় নৌকাবিহার কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। লীলাটি যেন প্রকট হইল। ইঁহার মুখে অপূর্ব্ব পদাবলী শ্রবণে সকলেই বিমুগ্ধ। লোকে লোকারণ্য। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু আনন্দে অধীর হইয়া অবিরতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন

করিতেছেন। রাত্র অধিক হওয়ায় বাবাজী মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। শ্যামসুন্দর বাবুরা পাঁচভাই তথায় উপস্থিত আছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ বাবু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "গুরুদেব! বহুদিন হইতে শ্যামসুন্দরদের সহিত আমার এরূপ মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছে যে, মহাবিপদাপন্ন হইলেও পরস্পরের বাড়ী যাওয়া ছিল না। আজ আপনার শ্রীচরণ-কৃপায় আমাদের সকলের মানসিক বৈরতা দূর হইয়া পরমানন্দময় ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন আমাদের প্রাণে সেই কুৎসিত ভাবের উদয় না হয়।"

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "এতদিন তোমাদের মায়ারাজ্যের বিষয়-সম্পত্তি লইয়া মায়ারাজ্যের সম্পর্কিত ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ ছিল। শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় আজ তোমরা পরমার্থভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের হিতৈষী। এখনও যদি হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ বৈরতা বা হিংসা-দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, তবে পরমার্থপথের পথিক বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ত ভুল। পরমার্থ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অতিতুচ্ছ পদার্থ লইয়া বিবাদ করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? পরশ-মণি পরিত্যাগ করিয়া কাচ লইয়া আর ঝগড়া করিও না। এইবার ছয় ভাইয়ে একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের উন্নতিকল্পে চেষ্টা কর। যেন তোমাদের আদর্শে জগৎ শিক্ষা পাইতে পারে।" বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ করুণাপূর্ণ উপদেশ শ্রবণে সকলেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুক্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিয়া প্রেমময়ের কৃপার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ইঁহারা পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। এইরূপ ভাবে প্রায়

প্রত্যহই এক এক স্থানে নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। যাহাদের বাড়ীতে যে দিন নিমন্ত্রণ হয়, তাহাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।

—*—

দ্যুতিসিংহের উদ্ধার

একদিন রাঘব মহান্তি নামক জনৈক ভক্তের বাড়ীতে সগণে বাবাজী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ। বাবাজী মহাশয় অপরাহ্নে সঙ্গিগণ সঙ্গে নাম করিতে করিতে তাহার বাড়ী যাইতেছেন পথিমধ্যে দ্যুতিসিংহ নামক একটি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে দ্যুতিসিংহ! যাহা করিবার যথেষ্ট করিয়াছিস্, আর কেন? এখনও কি চৈতন্য হইল না?" শুনিয়া দ্যুতিসিংহ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ কহিল, "বাবা! আপনি কি বলিতেছেন, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন বাবাজী মহাশয় তাহার জীবনের আদ্যোপান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত মুখস্থের ন্যায় বলিতে লাগিলেন। এক এক দিনের ঘটনা বলিতেছেন, আর দ্যুতিসিংহ কম্পিত হইতেছে। এই রূপে উহার ইহজন্ম এবং পূর্ব্বজন্মের সমস্ত পাপপুণ্যের কথা বলিবা মাত্র সে ইঁহার চরণদুইখানি ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন তাহার মনে এরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল যে, সে তাহার নিজের প্রত্যেক অঙ্গের অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন বাবা! আমি ঘোর পতিত! আমার হাতের অঙ্গুলি দেখুন, প্রায় খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পায়ের অঙ্গুলিতে বল নাই; যেন অসাড় হইয়া ক্রমে নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে, আমি আপনার চরণে শরণাপন্ন হইলাম। আমায় যদি এ পাপ হইতে আপনি নিস্তার না করেন, তবে আর আমার উপায় নাই। আমি এহেন অভিমানী মহাপাষণ্ড যে আপনি

ভিন্ন জগতে আমাকে উদ্ধার করে, এমন আর কেহই নাই। দয়াময়! শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, মহাপ্রভু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণদেশীয় কোন ব্রাহ্মণকে কোল দিয়া ব্যাধিমুক্ত করিয়াছিলেন। প্রভু হে! তাঁহার ভক্তি ছিল, আমার ভক্তি ত নাইই, উপরন্তু আমি বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী এবং দেব-দ্বিজ-গুরু-চরণে ঘোর অপরাধী। করুণাময়! আমার ব্যবহারে আমার সহিত বাক্যালাপ করে, এমন ব্যক্তি এতদিন আমি দেখিতে পাই নাই। আমার বিশ্বাস, আপনার ন্যায় অদোষদরশী প্রভু আমি আর পাইব না। যখন করুণা করিয়া পতিতের দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পতিতপাবন! তখন এবার পতিতের গতির উপায় না করিলে আর কোথায় দাঁড়াইব?" এই বলিয়া একেবারে অধৈর্য্যভাবে ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

কুসুম-সুকোমল করুণহৃদয় বাবাজী মহাশয় অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব-পরিব্যাপ্ত-কলেবরে দ্যুতিসিংহকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক উহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "বাবা! তোর জন্ম জন্মার্জ্জিত যত কিছু পাপ তাপ সমস্তই আমি গ্রহণ করিলাম। তোর আর চিন্তা নাই। পাপের ফলে তোর এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। নিতাইচাঁদের কৃপায় আর কিছুই হইবে না। আজ হইতে তুই নিষ্পাপ হইয়া নিতাইচাঁদের শ্রীচরণ চিন্তা কর্, অচিরাৎ তোর সদ্‌গতি লাভ হইবে।"

দ্যুতি। বাবা! আমার ত কোনও সাধন ভজন করিবার সাধ্য নাই। আমার কি গতি হইবে?

বাবাজী। তোর অন্য কোন সাধন ভজনের প্রয়োজন নাই। একমাত্র নাম কর্। নাম হইতেই সর্ব্বানর্থনাশ এবং সর্ব্বশুভোদয় হইবে।

দ্যুতি। প্রভু! আমি কি নাম করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না; অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, কোন্ নাম করা আমার কর্ত্তব্য।

বাবাজী। একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥
সেই কৃষ্ণ নাম জীব লয় বহুবার।
তথাপি না হয় প্রেমপুলকাশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
নিতাই গৌরাঙ্গে নাই সে সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার॥

বাবা! নিতাই গৌরাঙ্গের কৃপা ভিন্ন কলিজীবের অন্য গতি নাই। পরমদয়াল অবতার নিতাই গৌরাঙ্গ প্রভু যদি কৃপা করিয়া কলিজীবের ঘরে ঘরে নামপ্রেম বিতরণ না করিতেন, তবে আমাদের কি গতি হইত। রত্নাকর কত যুগ তপস্যা করিয়া তবে রামনাম উচ্চারণের শক্তি পাইয়াছিলেন; আর কলিহত পতিত জীব সাক্ষাতে মহাপাপ করিতেছে, আর হরে কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ উচ্চারণ করিতেছে—এ কাহার কৃপা? তাই বলি বাবা! ভজিতে পার আর নাই পার, দিনান্তে নিশান্তেও একবার সেই পরম করুণাময় নিতাই গৌরাঙ্গের উদ্দেশে মস্তক অবনত করিও। হেলায় শ্রদ্ধায়ও একবার 'হা নিতাই গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকিও, সর্ব্বার্থ সাধিত হইবে। দ্যুতিসিংহ যেন কি বলিতে চাহিয়া আবার ভয়ে সঙ্কুচিত হইল। অন্তর্য্যামী প্রভু উহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দ্যুতিসিংহ! চল্ তোর বাড়ী যাই।"

শুনিবামাত্র সে আত্মহারাভাবে নৃত্য করিতে করিতে বলিল, "হা অন্তর্যামী প্রভু! আমার হৃদয়ে বাসনার উদয় হইবামাত্র আপনি তাহা পূরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন! আমি নরাধম; আমার মনে এই বাসনার উদয় হইয়াছিল; কিন্তু বলিতে সাহস পাই নাই। প্রভু!

করুণা হয় ত এই রাস্তায় দাসের বাড়ী অগ্রসর হউন। তখন বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে দ্যুতিসিংহের বাড়ীতে গিয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক আবার নাম করিতে করিতে রাঘব মাহান্তির বাড়ী আগমন করিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে যাহার নাম করিলে সেদিন লোকের আহার হয় না এবং দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, আজ আপনি তাহার ঘরে মহাপ্রসাদ পাইলেন!" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শ্যামসুন্দর! ও লোকটা খুব ভাল। কেবল বাহিরের অবস্থা দেখিলে ত চলিবে না, উহার অন্তঃকরণ বড়ই নির্ম্মল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাইবে।" বাস্তবিক কথা। বাবাজী মহাশয় কেন্দ্রাপাড়া ছাড়িয়া যাইবার কিছুদিন পর হইতেই উক্ত দ্যুতিসিংহের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সর্ব্বদা ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ শ্রবণ সাধুসজ্জন-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে প্রীতিভক্তি উহার যেন স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়া পড়িল। তখন সকলে বুঝিল যে, বাবাজী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সুসত্য।

ক্রমে দামোদর মোক্তারের বাড়ী, সুদর্শন মোক্তারের বাড়ী ও অন্যান্য নানাস্থানে নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল এবং বহুলোক বাবাজী মহাশয়ের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। কেন্দ্রাপাড়া যেন আনন্দময় স্থান হইল। সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন এবং বৈষ্ণব ও দুঃখী কাঙ্গালীদিগের সেবা হইতে লাগিল।

একদিন একদল উড়িয়া যাত্রার দল আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল—"আজ্ঞে আমাদের বড়ই ইচ্ছা যে একবার আপনাকে আমাদের দেশী যাত্রা শুনাইব। অনুগ্রহপূর্ব্বক আদেশ দিলে আরম্ভ করা যাইতে পারে।" তখন বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ শ্যামসুন্দর! একবার উড়িয়া যাত্রা শুনিতে হইবে।" শ্যামসুন্দর বাবু

অতি হৃষ্টচিত্তে যে স্থানে অষ্টপ্রহর হইয়াছিল, সেই স্থানে যাত্রাগানের যোগাড় করিয়া দিলেন। ধ্রুবচরিত্র পালা-গান আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয় অনন্যচিত্তে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গায়কেরাও দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া গান করিতে লাগিল। যদিও তাহাদের গানের মধ্যে ভাব ও যুক্তিবিরুদ্ধ অনেক কথা বা গান এবং হাবভাব চালচলন রহিয়াছে, তথাপি বাবাজী মহাশয় তৎকালে কিছুই বলিলেন না; বরং প্রশংসাই করিতে লাগিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল, আজ্ঞে এইরূপ অযৌক্তিক ও ভাব বিরুদ্ধ গান শুনিয়া আপনি কিছুই বলিতেছেন না কেন? বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম" এই মহাবাক্যটি সর্ব্বদার তরে সকলের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যদ্যপি ইহাদের ভাবাদির বোধ কম, তথাপি উৎসাহ না পাইলে উদ্যম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অতএব শিক্ষার প্রয়োজন হইলে সময়ান্তরে শিক্ষা দিলেই ভাল হয়।" প্রাণিমাত্রের প্রাণে কোনরূপ উদ্বেগ দেওয়া বাবাজী মহাশয়ের চিরকাল স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সময়ান্তরে যাত্রার দলের অধ্যক্ষকে ডাকিয়া বিশুদ্ধ ভাবতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। সেও পরমানন্দিতচিত্তে ইঁহার বাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক নিজেকে ধন্য মনে করিল।

--*--

গোবিন্দদাদার বিদায়

একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় অতি গম্ভীরভাবে শ্যামসুন্দর বাবুদের কাছারীবাড়ীতে বসিয়া আছেন; কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা নাই। ইঁহার সঙ্গিগণ প্রায় অনেকেই শ্যামসুন্দর বাবুদের বসতবাটীর

উত্তর দিকের দোতলায় থাকেন। বেলা অনুমান সাতটার সময় বাবাজী মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়া গোবিন্দদাদার হস্তে দিবার জন্য একটি ছেলের হাতে পাঠাইয়া দিলেন এবং পত্র পাইয়া সে কি বলে, তাহা শুনিয়া আসিতে বলিলেন। ছেলেটি পত্র লইয়া গোবিন্দদাদাকে দিলে তিনি পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"ভাই গোবিন্দ! পত্র পাঠমাত্র বিনা ওজরে হাঁটাপথে শ্রীধাম বৃন্দাবন রওনা হইবে। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস, ঝাড়ুগিরি সেবা এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাপন করিবে। সম্প্রতি আর আমার সঙ্গে দেখা হইবে না। শ্রীনিতাইচাঁদের ইচ্ছায় সময়মত স্থানান্তরে দেখাশুনা হইবে।" ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীরাধারমণ চরণ দাস।

পত্রখানির মর্ম্ম শুনিবামাত্র যেন সকলের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সকলেই ব্যাকুলভাবে বলিতেছেন, "হায় কি হইল! কি কারণে বাবাজী মহাশয়ের কুসুম-সুকোমল রসময় হৃদয়খানি আজ বজ্র হইতেও কঠিন ভাব ধারণ করিল!

ক্ষণকাল পরে গোবিন্দদাদা ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আচ্ছা—তাহাই হইবে। তাঁহার চরণে আমার দণ্ডবৎ। তিনি সুখে থাকুন।" ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া এই তিনটি কথা বাবাজী মহাশয়কে বলিলে ইনি নীরবে কাছারীবাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে প্রাতঃকৃত্য করিবার জন্য গমন করিলেন। যাহারা সর্ব্বদা বাবাজী মহাশয়ের কাছে থাকিয়া সেবাকার্য্যাদি করে আজও তাহারাই আছে, কিন্তু কাহারই মুখে রা নাই, সকলেই বিমর্ষ। বাবাজী মহাশয় এরূপ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছেন যে, কা'র

সাধ্য—ইঁহার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে? হঠাৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হয় ত আমি গোবিন্দদাদার সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করি।"

বাবাজী। স্বচ্ছন্দে! আমার কোন আপত্তি নাই।

নিত্যস্বরূপ। আজ্ঞে গোবিন্দদাদা আসিয়া একবার দণ্ডবৎ করিয়া গেলে হয় না?

বাবাজী। না, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হও; পরের কথায় থাকা নিষ্প্রয়োজন।

নিত্যস্বরূপ আর কোন কথা বলিতে সাহস না পাইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দদাদার নিকট গমন করিলেন। রাত্র চারিটার সময় উঠিয়া শ্যামানন্দদাস এবং নিতাই দাস নাম করিতে করিতে পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন। উহারা বেলা আন্দাজ আটটার সময় বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "আজ্ঞে গোবিন্দদাদার সহিত শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আমাদের বড়ই অভিলাষ হইতেছে, কি আজ্ঞা হয়?"

বাবাজী। কোনই আপত্তি নাই, পরমানন্দে চলিয়া যাও এবং আর যদি কেহ যাইতে চায়, তাহাকেও লইয়া যাইতে পার।

শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি সকলে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছেন; কিন্তু কেহই কোন কথা বলিবার সাহস পাইতেছেন না। এদিকে গোবিন্দদাদা, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্যামানন্দদাস এবং নিতাই দাস এই চারিজনে সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন। যাঁহারা বাসায় রহিয়াছেন, তাঁহারাও কাঁদিতেছেন, যাঁহারা গমন করিতেছেন, তাঁহারাও কাঁদিতেছেন, আবার যাঁহারা ইঁহাদের অবস্থা

দেখিতেছেন, তাঁহারাও কাঁদিতেছেন। চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে। কিন্তু একমাত্র বাবাজী মহাশয় স্থির ধীর এবং গম্ভীর ভাবে মুখ ধুইতেছেন। এই সময় শ্যামসুন্দর বাবু অতি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে আমার একটি প্রার্থনা, আমি এই চারিজনের বৃন্দাবন যাইবার ভাড়া দিয়া দিতেছি; ইহাতে আপনি কোনও আপত্তি করিবেন না।"

বাবাজী। আমার আপত্তি কি? তাহারা যদি নিতে ইচ্ছা করে দিতে পার।

শ্যামসুন্দরবাবু গোবিন্দদাদার নিকট গিয়া বৃন্দাবন যাইবার পাথেয় লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলে গোবিন্দদাদা উদাস প্রাণে বলিলেন, "এখনও কি পরীক্ষা শেষ হয় নাই? বলিহারি দয়া!" এই বলিয়া অতি দ্রুতপদে গমন করিলেন। যদিও গোবিন্দদাদার কষ্টলাঘবের জন্য উঁহার সঙ্গিগণ পাথেয় লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু উঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে আর কেহই লইতে সাহস পাইলেন না। শ্যামসুন্দর বাবু বহু যত্নাগ্রহ করিয়াও বিফলমনোরথ হওয়ায় অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বাবাজী মহাশয়ের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, গোবিন্দ দাদা কিছুতেই পাথেয় লইতে সম্মত হইলেন না।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় অতিশয় সুখী হইলেন। এতক্ষণে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল—চোখে জল আসিল—গদগদকণ্ঠে শ্যামসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামসুন্দর। যথার্থই গোবিন্দ চলিয়া গেল?"

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে আপনিই ত পাঠাইয়া দিলেন। আদেশ হয় ত এখনও আমি লোক পাঠাইয়া উহাদিগকে ফিরাইতে চেষ্টা করি।

বাবাজী। না, না—এমন কাজ করিতে নাই; উহারা শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইতেছে। ইহাতে কি বাধা দিতে আছে!

সুযোগ পাইয়া ললিতাদাসী বলিলেন, "আপনার হৃদয় যে এত কঠোর, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। কি আশ্চর্য্য! যাইবার সময় লোকটাকে একবার দেখাও দিলেন না। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—যাহা শুনিয়াছিলাম আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। এখন আবার কপট কান্না কাঁদিবার প্রয়োজন কি?"

বাবাজী। তোমরা বোঝ না; গোবিন্দের একটি সুসময় আসিতেছে। নিতাইচাঁদের কৃপায় সে খুব উন্নতি লাভ করিবে। তিনি মঙ্গলময়; কাহাকেও দুঃখ দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নয়।

ললিতা। প্রথমে দুঃখ-সাগরে ডুবাইয়া শেষে সুখ দিবেন, এই আশায় থাকা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য।

বাবাজী। তাহা হইলে তোমাদের মতে তিনি অবিচারক বা নির্ব্বোধ! এইটিই জীবের ভ্রম; ইচ্ছাময় যাহার দ্বারা যে কার্য্য করাইবার ইচ্ছা করেন, কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয়ে সেইরূপ শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন। তিনি আমাদের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবান্ নহেন। তিনি অন্তর্য্যামী; সকলের অন্তরের ভাব বুঝিয়াই কার্য্য করিয়া থাকেন।

ললিতা। আচ্ছা, কি দোষে তাহাকে সঙ্গছাড়া করাইলেন?

বাবাজী। তুমি কি বৃন্দাবনে যাওয়াটা দোষের মধ্যে পরিগণিত করিতে চাও? বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস, ঝাড়ুসেবা, মাধুকরীগ্রাস—এইগুলিই ত মহাত্মাদের প্রধান প্রার্থনীয়।

ললিতা। তাহা হইলে আমাদের প্রাণে এত দুঃখ হইতেছে কেন?

বাবাজী। তোমরা স্বার্থপর মায়ার কীট। তোমরা মনে কর—

যেরূপেই হউক সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকিলেই ভাল। এটা তোমাদের ভুল ধারণা।

ললিতা। বেশ আপনারাই ত বলেন—"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গ ইত্যাদি।" আমি যদি নিজে ভাল হইতে পারি, তবে আর আমার সঙ্গের দরকার কি? আমি পাষণ্ড নাস্তিক অবিশ্বাসী প্রভৃতি যাহাই হই না কেন, সৎসঙ্গের প্রভাবে নিশ্চয়ই আমার মতিপরিবর্ত্তন হইবে ; কারণ বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না।

বাবাজী। তোমার কথাগুলি সবই সত্য ; কিন্তু 'সঙ্গ' শব্দে তোমরা যাহা বুঝিয়াছ সেইটিই ভুল। সঙ্গটি দৈহিক ক্রিয়া নহে, মানসিক। সঙ্গ অর্থে আসক্তি। এই অর্থেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গেস্তষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

যে বস্তুটি অনুক্ষণ মনে ভাবনা করা যায়, তাহাতেই আসক্তি জন্মে। সেই আসক্তি বশতঃই তত্তদ্বিষয়ে কাম (অভিলাষ) জন্মিয়া থাকে। ক্রমে অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে প্রাণবিনাশ হইতে পারে। এই সঙ্গের কথায় একটি গল্প মনে পড়িল—কোন গ্রামে দুইটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটির নাম দীননাথ, অপরটির নাম রঘুনাথ। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে এতই বন্ধুতা ছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে না দেখিলে অস্থির হইতেন। উভয়েই উভয়ের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত—উভয়েই উভয়কে সুখী করিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু দুইজনের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। দীননাথ

সাত্ত্বিক আচারসম্পন্ন পরম বৈষ্ণব ; সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরায়ণ নৈষ্ঠিক ভক্ত। রঘুনাথ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অতিশয় দুরাচার, অসচ্চরিত্র ও ঘোর পাষন্ড। একদিন দুই বন্ধু একসঙ্গে রাস্তায় গমন করিতেছেন ; কিছুদূর যাইতে যাইতে দীননাথ বলিলেন,—"চল ভাই! শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শুনিতে যাই। বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করা উচিত নহে। এত সাধের মনুষ্যজন্ম পাইয়া যদি ভগবানের উপাসনাই করা না হইল, তবে আর মানবজন্মের সার্থকতা কি? আহারবিহারাদি ত পশুদেহেও আছে। অতএব চল ভাই! শ্রীমদ্‌ভাগবতকথা শ্রবণে জীবন সফল করি।"

রঘুনাথ। দেখ ভাই! তোমার ঐ কথাতেই আমার রাগ হয়। এমন সুন্দর মনুষ্যদেহ পাইয়া কেবল বৃথা কতকগুলি অসভ্য লোকের সঙ্গদোষে—উপবাস কর, নিরামিষ খাও, গায়ে কতকগুলি মাটি মাখিয়া থাক, আর এখানে ভাগবতপাঠ, ওখানে চরিতামৃতপাঠ প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া দিন কাটাও। এ কি কুসংস্কার! ভগবান্ যদি কেবল এইরূপ কষ্টভোগ করিবার জন্যই মনুষ্যজন্ম দিতেন, তাহা হইলে বিলাসের প্রবৃত্তি বা শক্তি দিবেন কেন? আবার ভাবিয়া দেখ, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য (আতর, গোলাপজল, এসেন্স, পমেটম্, সাবান প্রভৃতি) সৃষ্টি করিবার কি দরকার ছিল? তাই বলি, মনুষ্যজীবন ভোগের জীবন ; কত লক্ষ লক্ষ জন্ম কষ্ট করিয়া তবে মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে! এ জন্মেও যদি ঐরূপ কষ্টভোগ করিতে হইল, তবে সুখ হইবে কবে? ভগবানের ত একটা বিচার করা উচিত। সামান্য কোন রাজসরকারে বহুদিন কার্য্য করিলে পেনসন্ হয় অর্থাৎ কোন কাজ না করিলেও ঘরে বসিয়া বেতন পাওয়া যায়, আর আমরা যে এত জন্ম কষ্ট ভোগ করিলাম, ইহাতে কি আর কার্য্যের অবসর হইতে পারে না? অতএব তোমার ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া চল আমরা সহরে যাই। অতি উপাদেয় কিছু মাদক দ্রব্য ব্যবহার

করিয়া পরম রূপসী কোন রমণীর আলয়ে গমনপূর্ব্বক গান বাদ্য প্রভৃতি নানারূপ আমোদ-প্রমোদে মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

এইরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরের মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া অপর বন্ধুকে নিজমতে আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া অগত্যা উভয়ে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। একজন শ্রীমদ্‌ভাগবতপাঠ শুনিতে বসিলেন। অপর জন বেশ্যালয়ে গিয়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন। এই সময় বৈকুণ্ঠধামে দেবর্ষি নারদ ভগবানের নিকট বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। হঠাৎ ভগবান্ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! অসময়ে হঠাৎ এরূপ হাস্যের কারণ কি?"

ভগবান্। নারদ! মর্ত্ত্যলোকে দুইটি ব্রাহ্মণের একটি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে এবং অপরটি বেশ্যালয়ে গমন করিয়াছে। উহারা পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধহেতু উভয়ের গতি-বৈপরীত্যের কথা ভাবিয়া আমার হাসি পাইল।

নারদ। আজ্ঞে গতি-বৈপরীত্য কি আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ভগবান্। নারদ! কালপূর্ণতাহেতু ঐ উভয় ব্রাহ্মণেরই এই সময় এককালীন মৃত্যু হইবে; কিন্তু যে বেশ্যালয়ে রহিয়াছে, তাহার বৈকুণ্ঠে আগমন হইবে এবং যে ভাগবতপাঠ শুনিতেছে, তাহার অধোগতি হইবে।

নারদ। প্রভু! তাহা হইলে শাস্ত্রও মিথ্যা, আপনার বাক্যও মিথ্যা; কারণ আপনি বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অন্যত্র—তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ। পুরাণপঠনং যত্র তত্র

সন্নিহিতো হরিঃ ॥ আপনি যে স্থানে উপস্থিত, সেই স্থানই তো বৈকুণ্ঠ। তাহাতে আবার সান্নিধ্যলাভ। ইহাতেও যদি জীবের অধোগতি হয়, তবে আর সদ্‌গতি পাইবে কোথায়? আমি তো আপনার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ভগবান্। নারদ! যে ব্যক্তি ভাগবত শুনিবে, সেই ত সদ্‌গতি লাভ করিবে! আর যে বেশ্যালয়ে গমনাদি অসৎ কার্য্য করে, তাহার অসদ্‌গতি হইলে ত দোষ হইবে না?

নারদ। সে ত শাস্ত্রবিধিই রহিয়াছে। যদি কেহ অসৎকার্য্য করে তাহার অধোগতি হইবে।

ভগবান্। তবে চল নারদ! একবার আমরা মর্ত্ত্যলোকে যাই।

এই বলিয়া ভগবান্ এবং নারদ উভয়ে সূক্ষ্ম দেহ ধারণপূর্ব্বক যে স্থানে ভাগবত পাঠ হইতেছিল, সেই স্থানে গিয়া দেখেন, ব্রাহ্মণ আত্মহারা হইয়া কেবল ভাবিতেছে "হায়! আমার বহুকালের বন্ধু রঘুনাথ না জানি এখন কিরূপ ভাবে আছে! হয় ত মদ্যপান করিয়া বিভোর অবস্থায় বারাঙ্গনাসহ নানারূপ ক্রীড়াকৌতুকে সময় অতিবাহিত করিতেছে। আর সেই বিলাসিনী রমণী হয় ত তাহার দ্বিতল গৃহ নানাবিধ সুগন্ধ-যুক্ত বিলাসিতার সামগ্রী দ্বারা কতই সুসজ্জিত করিয়াছে! আবার নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বিলাস-লালসাময়ী, নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা, পরমরূপবতী সেই বাররমণীসহ একাসনে উপবিষ্ট হইয়া না জানি রঘুনাথ কতরূপ হাস্য-পরিহাসে মত্ত হইয়াছে! তাহার চারিদিকে পরিচারিকাগণ নানারূপ সেবা-পরিচর্য্যা করিতেছে! ইত্যাদি ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কাল পূর্ণ হওয়ায় সেই সময় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল, কাজেই যমদূত আসিয়া উহাকে দুই হাতে বাঁধিল।

ভগবান্। কেমন নারদ! দেখিলে ত ভাগবতশ্রবণের ফল কিরূপ?

নারদ। প্রভো! এরূপ ভাগবত শ্রবণের ফল এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখন একবার বেশ্যালয়ের ব্রাহ্মণের অবস্থা জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানে চলুন।

তখন ভগবান্ সেইরূপ অবস্থাতেই নারদের সহিত বেশ্যালয়ে গমন করিয়া দেখেন যে, বেশ্যালয়স্থিত ব্রাহ্মণ নানারূপ আমোদ প্রমোদে মত্ত আছে সত্য; কিন্তু তাহার মন কিছুর মধ্যে নাই। সে কেবল চিন্তা করিতেছে—"হায়! আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু সেই দীননাথ না জানি কি অবস্থায় আছে! হয়ত ভাগবত-পাঠক উচ্চ আসনে বসিয়া পাঠ করিতেছেন, আর চারিদিকে সেই সব ছাপামুদ্রাধারী ভক্তগণ বসিয়া আছে। একটি তুলসীবৃক্ষও সম্মুখে রহিয়াছে। পাঠক এক একটি শ্লোক বলিতেছেন, আর সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে। এক একবার হয়ত পাঠকের এক একটি কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে হরি হরিবোল বলিয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ বা হরেকৃষ্ণ গোবিন্দ রাম নারায়ণ বলিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে।" এইরূপ বলিতে বলিতেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। এদিকে বিষ্ণুদূত আসিয়া নানারূপ স্তবস্তুতি করতঃ উক্ত ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

ভগবান্ বলিলেন "কেমন নারদ! রহস্য বুঝিতে পারিলে ত?"

নারদ। প্রভো! আপনার কৃপায় অনেকটা অনুভব হইয়াছে। তবে এখনও মনের সকল সন্দেহ মিটে নাই; কারণ এতকাল যে লোক ভক্তি যাজন করিল, শেষকালে সে এইরূপে অসদ্‌গতি প্রাপ্ত হইল, ইহার কারণ কি?

ভগবান্। কেন নারদ! আমি ত পুনঃপুনঃ বলিয়াছি—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তেকলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥"

সে যে এতকাল ভজন করিয়াছে এবং তাহার দরুণ যে সুকৃতি তাহা কখনই নষ্ট হইবে না ; কিন্তু মৃত্যুকালের ভাবটি প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ সেই সুকৃতির সুফল প্রাপ্তির কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে।

এইরূপ বলিতে বলিতে ভগবান্ এবং নারদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এখন বুঝিলে ত সঙ্গ কাহাকে বলা যায়? ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

জোষণাৎ সেবনাৎ অর্থাৎ রুচিপূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রবণ করিলে তবে ভক্তি জন্মিবে। এইরূপে নানা কথোপকথনে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে বাবাজী মহাশয় স্নান করিতে গমন করিলেন এবং অন্যান্য সকলে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃষ্ণানন্দ দাদার বিদায়

কেন্দ্রাপাড়া নিবাসী আপামর সাধারণ জনগণ সকলেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন। কখন কীর্ত্তনানন্দ, কখন ভগবত্তত্ত্ব-কথার আলোচনা, কখন বা ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ হইতেছে। সর্ব্দাই সকলে কেমন একটা নেশার ঘোরে মাতিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যহ রাত্রে ইঁহাদের নিমন্ত্রণ হইতেছে। ইঁহারা দিবসে গোবিন্দদেবের প্রসাদ পান। কোন কোন দিন বা বলদেবজীউর প্রসাদ আসিয়া থাকে। কেবল যে বাবাজী মহাশয়ের গণেরাই প্রসাদ পাইতেছেন, তাহা নহে ; অন্যান্য নানা ভাবের নানাজাতীয় লোকও আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইতেছে!

ঢেঁকানাল রাজধানী হইতে অনুমান সতের আঠার বৎসর বয়স্ক দুইটি ব্রাহ্মণবালক সংস্কৃত পড়িবার জন্য কেন্দ্রাপাড়ায় অসিয়াছে। একটির

নাম রত্নাকর মিশ্র, অপরটির নাম গতিকৃষ্ণ মিশ্র। উহারা উড়িষ্যাবাসী শাসনব্রাহ্মণ। উৎকলীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আহারাদির সম্বন্ধেও উহাদের কঠোর শাসন। উহারা প্রায়ই শাক্ত এবং শৈব। দুইটি বালকের মধ্যে রত্নাকর নামক বালকটি সর্ব্বদা বাবাজী মহাশয়গণের সঙ্গেই বেড়ায়। যেস্থানে নিমন্ত্রণাদি হয়, সেই স্থানেই প্রসাদ পায় এবং গলায় তিন কণ্ঠী তুলসীর মালাও ধারণ করিয়াছে; কিন্তু উহার সঙ্গী গতিকৃষ্ণ মিশ্র এই সব আচরণে উহার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট; এমন কি, অবসর পাইলেই উহার গলার মালা ছিঁড়িয়া দেয় এবং বৈষ্ণবের সঙ্গে আহারাদি করার জন্য বড়ই লাঞ্ছনা দিয়া থাকে। রত্নাকর মধ্যে মধ্যে এই সমস্ত কথা বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণকে জানায়। একদিন একজন বাবাজী মহাশয়ের নিকট এই ঘটনা বলায় ইনি বলিলেন, "দেখ, যে ব্যক্তি প্রথমে যে বিষয়ে বিদ্বেষী হয়, শেষে সে হয় ত সেই বিষয়েই অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। হয়ত এমন দিন আসিবে যে, যে গতিকৃষ্ণ রত্নাকরের প্রতি দ্বেষ করিতেছে, সে-ই পরম বৈষ্ণব হইবে এবং রত্নাকরের মতিপরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে।" সঙ্গিগণ সকলেই বলিলেন, "এ নিতান্ত অসম্ভব; অতবড় ঘোর পাষণ্ডের মতিপরিবর্ত্তন হওয়া কি সহজ?" তখন বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদ কি খেলা খেলান।"

এইরূপ ভাবে কয়েকদিন যায়—একদিন প্রভাতে কৃষ্ণানন্দদাদা আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেশ পর্য্যটন করিবার জন্য আমার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে; আপনার অনুমতি হয় ত একবার গমন করি।"

বাবাজী। তা বেশ! তোমার কোথায় যাইবার ইচ্ছা হইতেছে?

কৃষ্ণানন্দ। ইচ্ছা যে তত প্রবল হইয়াছে তাহা নহে। তবে একবার মনে হয়—প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের সঙ্গে আমেরিকা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করি।

বাবাজী। বেশ! পরম আনন্দের কথা। আজই অপরাহ্নে যাইবার ব্যবস্থা কর।

এই বলিয়া নিজে স্নান করিবার মানসে গোবরা নদীতে গমন করিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি সকলেই বলিতে লাগিলেন, আজ্ঞে এ নদীর জল ভাল নয় বলিয়া আমরা ইহাতে স্নানাদি করি না। আপনি এতদিন আসিয়াছেন; কিন্তু কৈ কোন দিন ত এ নদীতে স্নান করেন নাই! আজ কি হইল?"

বাবাজী। দেখ, স্রোতস্বিনী নদীর জল কখন মন্দ হইতে পারে কি? গতিশীল বস্তুই উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতে পারে। অনুরাগ গতিশীল এই অনুরাগ সতেই হউক আর অসতেই হউক, অনুরাগী ব্যক্তিকে ঊর্দ্ধ-গামী করিবেই করিবে। তাই বলি, সকলেরই গতিশীল হওয়া প্রয়োজন। গতি বন্ধ হইলেই উন্নতির আশা রহিত হইয়া থাকে। স্রোত না থাকিলে জলে পাঁক ও গন্ধ হয় এবং পোকা জন্মে।

কৃষ্ণানন্দ। আচ্ছা, এই গতি যদি অসৎপথে হয়?

বাবাজী। গতিশীল হইলেই তাহার পরিবর্ত্তন অতি সহজ। ঘোর পাষণ্ড, মদ্যপায়ী, মহাদস্যু অতি নিষ্ঠুর পরপীড়ক, পরধন-লোলুপ, দাম্ভিক বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিও যদি গতিশীল হয়, তবে অতি যৎসামান্য কারণেই সে যতটা নিম্নস্তরে ছিল, ঠিক ততটা উচ্চ সীমায় উত্থিত হইবে। বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস, রত্নাকর, অজামিল, জগাই-মাধাই প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে যে, গতিশীল বস্তু যে কোনও ভাবের উচ্চসীমা লাভ করুক না কেন, ভগবৎ-রাজ্যে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে অতীব সহজ।

এইরূপ ভাবে নানা কথাবার্ত্তায় পরমানন্দে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক বাসায় আসিয়া তিলক-আহ্নিকের পর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন

আজিকার কীর্ত্তন যেন এক নূতন রকমের। আজ প্রায় অধিক পরিমাণে ঐশ্বর্য্য ভাবের বিকাশ দেখা যাইতেছে। ক্রমে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া মহাপ্রসাদ পাইলেন। আজ আর বিশ্রাম নাই। কৃষ্ণানন্দকে লইয়া নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনায় বেলা প্রায় তিনটা বাজিল। তখন কৃষ্ণানন্দ সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞে আমাকে কি রকম ভাবে চলিতে হইবে, একবার উপদেশ দিলে ভাল হয়।"

বাবাজী। আমি আর কি বলিব ভাই? তবে সর্ব্বদা নিতাইচাঁদের উপর নির্ভর করিয়া চলিবে। কাহারও নিকট কোনরূপ অর্থাদি গ্রহণ করিবে না। প্রেমানন্দভারতী মহাশয়ের সহিত দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও কোনরূপ অষ্টপ্রহর সংকীর্ত্তন বা মহোৎসবাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। যেদিন যেস্থানে থাকিবে, নিজ উদরভরণোপযোগী ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু উপস্থিত হইলেও তাহা বর্জ্জন করিবে। প্রাপ্ত বস্তু হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক একনিষ্ঠ হইয়া চলিবে।

বলিতে বলিতে ইঁহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ এবং সজল হইল—সর্ব্বাঙ্গ পুলক ও কম্পে পরিব্যাপ্ত হইল। অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, ভাই! এস একবার প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি। মনের সাধ মিটিয়া যাক্! জানি না আবার কতদিনে প্রভু তোমাদের সহিত দেখা করাইবেন।" এইবার কৃষ্ণানন্দ অধীরভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আর্ত্তি, সেই কান্না এবং সেই প্রেমবিহ্বলভাব দেখিয়া শুনিয়া সকলেই অবাক! ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় কৃষ্ণানন্দকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনেই বিভোর! দুইজনেই কাঁদিয়া অস্থির। দুইজনের চোখের জলে দুইজন সিক্ত-কলেবর। অনুমান পনের বিশ মিনিট পরে বাবাজী মহাশয় কৃষ্ণানন্দকে বুক হইতে ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণানন্দ ভাবে বিভোর অবস্থায় মত্ত

মাতালের ন্যায় অর্দ্ধমুদ্রিত আরক্তনেত্রে টলিতে টলিতে চলিলেন ; এমন কি একজনকে অবলম্বন না করিয়া উপর হইতে নীচে নামিবার ক্ষমতা হইল না। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ প্রায় সকলেই কৃষ্ণানন্দের সঙ্গে সঙ্গে গোবরা নদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কেবলমাত্র খাঁকি আখড়ার মহান্ত বলদেবদাস, বলরামবাবু, জনৈক জটাধারী বাবাজী, গতিকৃষ্ণ মিশ্র নামক বালকটি এবং ললিতাদাসী এই কয়েকজন বাবাজী মহাশয়ের নিকটে রহিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "নিতাইচাঁদ কৃষ্ণানন্দকে অতিরিক্ত প্রেম-মদিরা পান করাইয়া দিয়াছেন ; সামলাইতে পারিলে হয়!" কৃষ্ণানন্দ নদী পার হইবার জন্য নৌকায় উঠিয়াছেন। অন্যান্য কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছে। যেমন নৌকাখানি অপর তীরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি কৃষ্ণানন্দ টলিয়া নদীর জলে পতিত হইলেন। তখন সকলে আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে ধরিয়া তীরে তুলিলে তাঁহার মত্ততা কমিয়া গেল—নেশার ঘোরও ভাঙ্গিয়া গেল। তীরে উঠিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" এই নাম করিতে করিতে গমন করিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় দোতলার উপর বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ মনে কি খেয়াল উঠিল—গতিকৃষ্ণ নামক সেই ব্রাহ্মণবালকটিকে কাছে বসাইয়া ললিতাদাসীকে বলিলেন, "শীঘ্র মালা লইয়া আইস।" ললিতাদাসী ঘরের মধ্য হইতে এক ছড়া মালা আনিয়া দিলে বাবাজী মহাশয় নিজহস্তে মালাগাছটি উক্ত বালকের গলায় পরাইয়া পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন, "প্রসাদী ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস আছে কি না দেখ ত?" ললিতাদাসী বহু অন্বেষণ করিবার পর দেখিতে পাইল, কালাকুঞ্জদাস বাবাজী স্নান করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার সেই ভিজা ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস রহিয়াছে। তখন ব্যস্তভাবে তাহাই লইয়া আসিবামাত্র বাবাজী মহাশয় সেই ডোর-

কৌপীন বহির্ব্বাস উক্ত বালককে পরাইয়া দিলেন এবং তাহার পরিধেয় অতি মলিন বস্ত্রখানি মস্তকে বাঁধিয়া একটি ঝোলা ও একটি ঘটী হাতে দিয়া কাণে মন্ত্রপ্রদানপূর্ব্বক ভিক্ষা করিবার আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে সঙ্গিগণ সকলে আসিয়া পেঁাছিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় সকলকেই ঐ বালকের সঙ্গে ভিক্ষায় যাইতে আদেশ করিলেন। বালকটি কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভীতভীতভাবে বাবাজী মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহাই করিতেছে। সকলে নাম করিতে করিতে নীচে যাইবে, এই সময় ললিতাদাসী বলিলেন,"আজ্ঞে ব্রাহ্মণবালক যদি এইরূপ ভিক্ষায় বাহির হয় তবে আর উহার ঘরে যাওয়া চলিবে না।" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিতাইচাঁদ উহার আর ঘরে যাইবার পথ রাখিয়াছেন কি? উহাকে বৈরাগী হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতে হইবে।"

ললিতা। আজ্ঞে তাহা হইলেও আপাতত সংসারে থাকিবে ত?

বাবাজী। আর না—এই হইতে উহাকে এই সঙ্গে থাকিতে হইবে।

ললিতা। তবে এক কাজ করা যাক্। এই বাসাতেই সাত জনে ভিক্ষা দেওয়া হউক। তাহা হইলেই সাত বাড়ী ভিক্ষার কার্য্য হইবে।

বলরাম বাবুও এই প্রার্থনা করিলে বাবাজী মহাশয় অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তখন বলরাম বাবু তাহাদের নিজ বাড়ী হইতে চাউল আনাইয়া বাসার মধ্যেই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ভিক্ষা করাইলেন। উক্ত বালকের নাম রাখিলেন—**গোবর্দ্ধন দাস**। বালক ঝোলাটি আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিলে ইনি বলিলেন, "বাবা! তোমার জন্মজন্মান্তরের যত পাপ তাপ আমি সমস্ত গ্রহণ করিলাম। তোমার কোনও ভয় নাই; নির্ম্মল হইয়া নিতাইচাঁদকে ডাক, অচিরাৎ তিনি কৃপা করিবেন।" এইবার কিন্তু বালকের মন কি রকম হইয়া গেল—সে ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন বলরাম বাবু বালকের হাত ধরিয়া

বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাইলেন। বাবাজী মহাশয়ও বালককে উঠাইয়া কোলে লইলেন। সকলে ব্রাহ্মণবালকের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় নিজ হস্তে বালকের ডোর-কৌপীন ছাড়াইয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তোমার এই ভেকই রহিল। সম্প্রতি ধুতি পর, সময়ে ব্যবস্থা করা যাইবে।" বালকের মনও কিরূপ হইয়া গেল; সে আর ইঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে পারিল না। পূর্ব্বোক্ত রত্নাকরের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সে গলার মালা ফেলিয়া দিল এবং গোবর্দ্ধনকে পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বালক অপূর্ব্ব শক্তিলাভ করিয়াছে; কার সাধ্য তাহাকে পরিবর্ত্তন করায়? গোবর্দ্ধনের প্রতি বাবাজী মহাশয়ের কৃপা দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

—*—

কুকুরের মতি পরিবর্ত্তন

আজ কয়েকদিন হইতে একটি খাঁকিসম্প্রদায়ী নেপালী সাধু কেন্দ্রা-পাড়ায় বাস করিতেছেন। সাধুটি অতি নিরীহ-প্রকৃতি। সর্ব্বদার তরে একটি ধুনি জ্বালাইয়া তাহার নিকটে বসিয়া থাকেন; সময়ে যখন প্রয়োজন বোধ করেন, ঐ ধুনির উপরেই যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়া আহার করেন। শ্যামসুন্দর বাবুদের কাছারী বাড়ীতে একটি গাছতলাই সাধুটির থাকিবার স্থান। উঁহার সঙ্গে অল্পবয়স্ক লাল রঙ্গের একটি মেয়ে-কুকুর আছে। কুকুরটি সম্পূর্ণরূপে সাধুর মুখাপেক্ষী; এমন কি, সাধুর সঙ্গ ছাড়িয়া অন্য কোথাও গমন করে না। উহার নাম সুখিয়া। সাধু যে দিন যাহা খাইবেন, সুখিয়াও তাহাই খাইবে। সুখিয়ার উপর সাধুর

বাৎসল্যস্নেহ। সাধু রাত্রে শয়ন করিলে কুকুরটি তাঁহার নিকটেই শুইয়া থাকে। একদিন প্রাতঃকালে জানি না কি কারণে সাধু সুখিয়াকে একটি চিম্‌টার আঘাত করিয়াছেন। শাসনের জন্য বাৎসল্যভাবে সাধু উহাকে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ মারিয়া থাকেন; কিন্তু আজকার আঘাতটা যেন সুখিয়ার হৃদয়ে বড়ই বাজিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে অনতিদূরে যে স্থানে বাবাজী মহাশয় বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন, ঐ স্থানে একেবারে ইঁহার চরণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষার জন্য উহাকে সাধুর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে লইবার মানসে অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আজ না জানি নিতাই চাঁদের কি খেলা খেলিবার ইচ্ছা হইয়াছে! সুখিয়া আপনা আপনিই গিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে শরণ গ্রহণ করিল। সঙ্গিগণ যতই উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই সে বাবাজী মহাশয়ের বসিবার জলচৌকির নীচে গমন করিতেছে। সাধু আসন হইতে "সুখিয়া সুখিয়া" বলিয়া ডাকিতেছেন; সুখিয়া কিন্তু নিকটে থাকিয়াও যেন দূরে; —শুনিয়াও যেন শুনিতেছে না। ক্রমে সাধু বাবাজী মহাশয়ের নিকটে আসিলে বাবাজী মহাশয় উঠিয়া সাধুকে নমস্কার করিলেন; সাধুও প্রতিনমস্কার করিয়া কুকুরটির আমূল বৃত্তান্ত বলিলেন। বাবাজী মহাশয় তখন কুকুরটির গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! কি করিবে তোমার গুরু এবং পিতৃস্থানীয় সাধু এতদিন তোমাকে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইয়াছেন। অতি সামান্য একটু শাসনে তোমার সেই সঙ্গ ছাড়া কোন মতেই উচিত নহে; অতএব সাধুর সহিত উহার আসনের নিকট গমন কর।" কার সাধ্য যে তাহাকে সেই চৌকির তলা হইতে বাহির করে? বেগতিক দেখিয়া বাবাজী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুখিয়া যেমন দেখিল যে বাবাজী মহাশয় দাঁড়াইয়াছেন, অমনি দ্রুতগতি আসিয়া

ইঁহার চরণের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় উহার গায়ে হাত বুলাইয়া পূর্ব্ববৎ সাধুর নিকট যাইবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। অবশেষে সাধুকে বলিলেন, "বাবা! আপনি উহাকে ধরিয়া লইয়া যান।" বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া সাধু যেমন কুকুরটিকে ধরিতে গিয়াছেন, অমনি সে অতি ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ কুকুরটির ভাবগতিক দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন! সাধু কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "রে সুখিয়া! হাম্ এৎনে রোজসে তোমকো পালন পোষণ কিয়া হ্যায়, আজ বিলকুল ভুলগয়া হ্যায়? হাম্ বুড়া সাধু হ্যায়, তেরি বাস্তে কেৎনা তক্‌লিপ কা কাম কিয়া থা। আচ্ছা কিয়ো; অব হামারী মমতা ভুলকে দোসরা সাধুনকে সঙ্গ লিয়া হ্যায়!" ইত্যাদি নানারূপ কথা বলিতেছেন, আর দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক সুখিয়াকে ধরিতে যাইতেছেন। সাধুর হাওয়া যে দিকে যাইতেছে, সুখিয়া সে দিকে পর্য্যন্ত যাইতেছে না! অনেক পীড়াপীড়ি করিবার পর সাধু নিরস্ত হইয়া নিজ আসনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় বাসায় চলিলেন, সুখিয়াও ইঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। এই হইতেই সুখিয়া আর ইঁহাদের সঙ্গ ছাড়িল না। এমন কি উহাকে না জানাইয়া কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে সে আপনা আপনিই সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইত।

কয়েকদিন যায়—একদিন সকালে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ স্নান করিতে গিয়াছেন, সুখিয়াও ইঁহার সঙ্গে গিয়াছে। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, আজ সুখিয়াকে স্নান করাইয়া দাও ত।" বলিয়া নিজে ডাকিলেন, "এ সুখিয়া! স্নান করবি আয়।" তখন আপন ইচ্ছায় সুখিয়া জলে নামিল এবং প্রাণ ভরিয়া স্নান করিতে লাগিল। দেখিয়া সকলে সমস্বরে হরিবোল বলিয়া উঠিলেন।

ক্রমে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক বাসায় আসিয়া তিলক আহ্নিক শেষ

করতঃ "জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরাঙ্গ" কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সুখিয়া আসিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত! তখন বাবাজী মহাশয় সুখিয়ার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলে সঙ্গিগণ প্রেমানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সুখিয়াও সেই সংকীর্ত্তনের মধ্যে বাবাজীদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্ত করতঃ সকলে গোবিন্দদেবের মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

—*—

বলদেবজীউর দর্শন

একদিন বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সঙ্গিগণসহ নাম করিতে করিতে বলদেব জীউর দর্শনে বাহির হইলেন। শ্যামসুন্দর বাবুদের বাড়ী হইতে বলদেব জীউর মন্দির প্রায় এক ক্রোশের অধিক হইবে। তবে যাতায়াতের জন্য বাঁধা রাস্তা রহিয়াছে। ক্রমে বহুলোক আসিয়া সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল। বলদেবজীউর বাল্যভোগ অন্তে কেবল দর্শন খোলা হইয়াছে, এই সময় গিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। মদঘূর্ণিত রক্তনেত্রে এবং নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান সেই সুবিশাল অপূর্ব্ব মধুর মূর্ত্তিখানি দর্শনমাত্র বাবাজী মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া এক একবার তাঁহার মুখপানে তাকাইতেছেন, আর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন। অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন ইঁহার দেহ অধিকার করিল। কত কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু কণ্ঠরোধ হওয়ায় কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ ভাব সম্বরণ করিয়া গদগদকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন :—

রজত গিরির, গরব গরাসি, ধবল বরণ খানি।
রাঙ্গা দুটী আঁখি, ঢুলু ঢুলু দেখি, অরুণ কমল জিনি॥
নীল পট্টধটি, কটিতটে আঁটি, কিঙ্কিণী তাহে বেড়া।
মদে মাতোয়াল, নাহিক সম্ভাল, গমন গজেন্দ্র পারা॥
বৈজয়ন্তী মালা, করিয়াছে আলা, বিশাল হিয়ার মাঝে।
চরণে নূপুর, মধুর মধুর, রুনুর ঝুনুর বাজে॥
শিঙ্গা বাম করে, কিবা শোভা করে, এক কুন্ডল কাণে।
হা-রে-রে-রে ভাঞা, কা-কা-কা কাহ্নাঞা, (বলি) ডাকে ঘনে-ঘনে॥
ধেনুক মারিয়া, তাল ফল দিয়া, তুষিলে সবার মন!
কাঁধেতে চড়িয়া, প্রলম্বে নাশিয়া, রাখিলে রাখালগণ॥
দেব হলধর, সর্ব্বগুণাকর রোহিণী-নন্দন রাম।
জীবের লাগিয়া, কলিতে আসিয়া, হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥
(তব) গুণের গরিমা, দিতে নারে সীমা, পঞ্চানন পঞ্চমুখে।
মুঞি ছার অতি, শিশু অলপমতি, কি কহব একমুখে॥
ওহে সঙ্কর্ষণ, করি নিবেদন, করুণা-বারিধি তুমি।
কর হে করুণা, না করিহ ঘৃণা, অধম পতিত আমি॥
ঘরে ঘরে গিয়া, যাচিয়া যাচিয়া, বিলাইলে প্রেমধন।
অভিমান বশে, বঞ্চিত এ দাসে, না পাইয়া এক কণ॥

এইভাবে বহুক্ষণ নানারূপ পদাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য। বাবাজী মহাশয়ের দেহে সমকালীন নানারূপ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ, অপূর্ব্ব নৃত্য এবং অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণীশক্তি দর্শনে আগন্তুক লোকসকল বিমুগ্ধ হইলেন। ক্রমে বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলে শ্যামসুন্দর বাবুদের চেষ্টায় এবং সেবক পান্ডাদিগের বিশেষ আগ্রহে

সকলে বলদেব জীউর মহাপ্রসাদ পাইলেন। শ্যামসুন্দর বাবুর ইচ্ছা যে রাত্রে বলদেব জীউর বিশেষরূপে ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া সেই স্থানেই ইঁহাদিগের প্রসাদ পাওয়া হয়। বাবাজী মহাশয়ের নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইলে ইনি বলিলেন, "আচ্ছা, বলাই দাদাকে বেশ মনের মতন করিয়া ভোগ লাগাও ত; তারপর আমাদের ভাগ্যে হয় আমরাও প্রসাদ পাইব, না হয় যাহার ভাগ্যে থাকে সেই পাইবে।" বাবাজী মহাশয়ের আশ্বাসবাক্য পাইয়া শ্যামসুন্দর বাবু ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। বলদেব জীউর অমৃতরসাবলী নামক একটি ভোগ হয়, সেইটি অতি উপাদেয় ভোগ। যদিও ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, ছানা, চিনি, কর্পূর, এলাইচ প্রভৃতি দ্বারা ভোগটি প্রস্তুত হয়, কিন্তু ওরূপ অপ্রাকৃত সুঘ্রাণ বা আস্বাদন আর কোথাও হয় না। এমন কি, বলদেব জীউর ঐ পান্ডাগণ অপর স্থানে যাইয়া ঐ ভোগ প্রস্তুত করিলে ওরূপ সুস্বাদু হইবে না। এই ভোগটি দাউজীর একটি কৃপাশক্তির চিহ্ন। শ্যামসুন্দরবাবু অন্যান্য ভোগ অপেক্ষা অমৃতরসাবলীই কিছু অধিক পরিমাণে ভোগ লাগাইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে আরতি হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে মদমত্ত বলাইচাঁদের ভুবনমোহন রূপখানি দেখিতেছেন, আর দুইটি চোখের জলে ইঁহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আরতি শেষ হইলে ভাবে বিভাবিত হইয়া গান ধরিলেন ঃ—

আরতি শ্রীবলবীর কি কিয়ে।
তনু মন প্রাণ নিছায়িরী দিয়ে ॥
পহিরণ নীল পট্টাম্বর শোহে।
মত্ত বলাইরূপে ত্রিভুবন মোহে ॥
রজত গিরির গুরু গৌরবহারী।
এক শ্রবণে এক কুণ্ডল ধারী ॥

কাদম্বরী মদ ঘূর্ণিত নেত্র।
শ্রীকরে শোভিত রঙ্গিম বেত্র॥
ঢল ঢল শ্রীমুখচন্দ্রকী শোভা।
ইন্দু-বিনিন্দিত মুনি-মনোলোভা॥
কৃষ্ণ-সেবামৃত সঙ্গত রঙ্গ।
দীনহীনে দেহি সোই প্রসঙ্গ॥

এইরূপে বহুক্ষণ সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। সেবকগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "আমরা অনেক কীর্ত্তন শুনিয়াছি; কিন্তু কখনও বলদেব জীউর এইরূপ তত্ত্বপূর্ণ কীর্ত্তন শুনি নাই। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য।" ইত্যাদি নানাবিধ সমালোচনা হইতে লাগিল। রাত্র আন্দাজ দশটার সময় সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে বলদেব জীউর মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। আনন্দময় বাবাজী মহাশয় যখন যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই কার্য্যই যেন এক নূতন ধরণের পরমানন্দজনক ব্যাপার। কেহ নিতাইর গুণ, কেহ বা গৌরগুণ-সম্বলিত নানারূপ পদ দোঁহাছন্দে ধ্বনি দিতে লাগিল। মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াই আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ পরমানন্দের সহিত মহাপ্রসাদ পাইয়া সকলে নাম করিতে করিতে বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

—o—

বারিমূল ও নিকরাই গমন

একদিন অপরাহ্ন সময় বাবাজী মহাশয় বহু ভক্তগণ সঙ্গে শ্যামসুন্দর বাবুদের দোতলার উপর বসিয়া আছেন, হঠাৎ শ্যামসুন্দরবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ শ্যামসুন্দর ! তোমাদের জমিদারীর মধ্যে নাকি কয়েকটি পাহাড় আছে।

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়ই সুন্দর দৃশ্য ; আর চলাফেরার বেশ রাস্তাও আছে।

বাবাজী। একবার সেই পাহাড় দেখিতে গেলে হয় না ?

শ্যামসুন্দর বাবু অতি হৃষ্টচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে তাহা হইলে জানিলাম যে এতদিনে উড়িষ্যার দুর্দ্দশা দূর হইয়া শুভদিন উপস্থিত হইল। যদি আদেশ করেন ত আমি অদ্যই সমস্ত ব্যবস্থা করি।"

বাবাজী। নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় তাহাই হইবে। আগামী কল্য প্রত্যূষেই এখান হইতে বাহির হওয়া যাক্। কেন্দ্রাপাড়ানিবাসী অনেকেরই আপত্তি হইতে লাগিল। তাঁহারা বলেন, "আরও কিছুদিন এখানে থাকিয়া পরে গেলেই ভাল হইবে।" বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া মিষ্টবাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করতঃ পরদিন প্রত্যূষে বাহির হওয়া স্থির করিলেন।

পথপ্রদর্শনের জন্য একজন লোক সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা হইল। ইত্যবসরে বারিমূলনিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে তাঁহাদের গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে নৌকা ঠিক করা হইয়াছে। একটানা নৌকায় গেলেই সুবিধা হইবে।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। কেন্দ্রাপাড়াবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনেই আজ নিরানন্দের ছায়া—সকলেরই মুখ ম্লান—চক্ষু ছলছল। এতদিন পর্য্যন্ত তাহারা যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন ছিল, আজ হঠাৎ সেই সাগর শুষ্ক হইয়া গেল। আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দের বাতাস বহিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক গোবিন্দদেবের অঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে বহুলোক একদৃষ্টে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া রহিয়াছে; সঙ্গিগণ খোলকরতাল লইয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম ধরিলেন। কিছুক্ষণ গোবিন্দদেবের সম্মুখে নাম করিয়া যেন তাঁহারই আদেশক্রমে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে গোবরা নদীতে আসিয়া নৌকায় উঠিলেন। মধ্যাহ্নকৃত্য বারিমূলেই হইবে স্থির হইল। শরৎবাবু ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। কেন্দ্রাপাড়া হইতে বারিমূল অনুমান তিন মাইল। নৌকাখানি খুব বড়; কাজেই একটু বিলম্ব হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় নৌকার মধ্যেই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে শরৎবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে বাবাজী মহাশয় একটু কীর্ত্তন করেন; কিন্তু সময় অতি সংক্ষেপ দেখিয়া বলিতে সাহস পাইতেছেন না। অন্তর্য্যামী বাবাজী মহাশয় উহার মনের ভাব বুঝিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

আনন্দের আর অবধি নাই। যে ব্যক্তি যে ভাব বা প্রশ্ন মনে করিয়া আসিতেছে, সংকীর্ত্তনমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনে ঠিক সেই সেই কথার বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন শুনিয়া বারিমূলনিবাসী ভক্তগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনোভাব গোপন করিতে না পারায় বলিয়া উঠিলেন, "আমি এত বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আজ

পর্য্যন্ত এরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন বৈষ্ণব আমার চোখে পতিত হয় নাই। আজ আমাদের বারিমূল গ্রাম ধন্য হইল।" কেহ বলিতেছেন, "ইনি সামান্য মানুষ নহেন ; কারণ আমি যে কথাটি জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য্য ! আসিয়া শুনি ঠিক সেই কথাটিই কীর্ত্তনে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন। আর বুঝাইবারই বা কি সুন্দর প্রণালী ! আমার বিশ্বাস—বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষ কেহই বুঝিতে বাকি নাই।" ইত্যাদি যাহার যেরূপ মনের ভাব, সে সেইরূপ বলিতেছে। এ দিকে বেলা অতিরিক্ত হওয়ার ফলে সকলের কষ্ট হইবে ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ইত্যবসরে কেন্দ্রাপাড়া হইতে বলদেব জীউর এবং গোবিন্দদেবের মিষ্ট মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় মহাপ্রসাদ দর্শন-মাত্রে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ধন্য করুণাময়ের করুণা ! আমরা ছাড়িলেও তিনি ছাড়িতে চাহেন না।" এইরূপে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে বসিয়া আছেন, এই সময় কেন্দ্রাপাড়া হইতে অন্যান্য লোকসকল আসিতে লাগিল। বলরাম বাবু, শ্যামসুন্দর বাবু, বৃন্দাবন বাবু, গোকুল বাবু, লক্ষ্মীনারায়ণ জগদেব প্রভৃতি সকলেই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে উড়িষ্যা দেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। দশখানা পাল্কী সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি সকলেই বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে উঠিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না ; কাজে কাজেই আর কাহারও পাল্কীতে উঠা হইল না। এক একখানা পাল্কীতে সতের জন করিয়া বেহারা। সকলেই খালি পাল্কী কাঁধে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। শরৎবাবু বারিমূলে একদিন থাকিবার

জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাবাজী মহাশয়ের মত হইল না; কাজেই বেলা আন্দাজ চারিটার সময় নাম করিতে করিতে বারিমূল হইতে রওনা হইলেন। পথপ্রদর্শকগণ সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে বটে, কিন্তু কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—বাবাজী মহাশয় নাম ধরিয়া চরণে চরণ রাখিয়া নাচিতে নাচিতে অতি সুপরিচিতের ন্যায় যাইতেছেন। এইরূপে রাত্র অনুমান আটটার সময় গিয়া নিক্‌রাই কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় হনুমান্ জীউর সেবা রহিয়াছে। মহাবীর জীউর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্যের পর কর-যোড়ে পদ ধরিলেন ঃ—

নমো নমো কপিরাজ ভক্তচূড়ামণি।
প্রভু লাগি সর্বত্যাগ হেন নাহি শুনি॥
তোমা হেন নিষ্ঠাবান্ আর কে বা আছে।
তাই নিষ্ঠাভক্তি মোরা যাচি তুয়া কাছে॥
মহাবীর-শিরোমণি তুমি ভক্তভূপ।
বক্ষ চিরি দেখাইলে সীতারামরূপ॥
নামের মহিমা তুমি দেখালে সবারে।
রাম বলে অবহেলে গেলা সিন্ধুপারে॥
প্রভু লাগি অসাধ্য সাধন বহু কৈলে।
তোমার স্মরণে জীবের নিষ্ঠা ভক্তি মিলে॥
তোমার করুণা হলে অধমেও পায়।
তাই কোটি পরণাম করি তুয়া পায়॥

ইত্যাদি নানারূপ পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গ হইয়া একেবারে ভূতলে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্ত

করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে ঠাকুরদের ভোগরাগের যোগাড় হইতে লাগিল। যথাসময়ে প্রসাদ পাইয়া সেই কাছারিতেই সকলে সে রাত্রি যাপন করিলেন।

—*—

নামসম্প্রদায় সংশোধন

পরদিবস প্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক শ্যাম-সুন্দর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামসুন্দর! এখান হইতে কোথায় যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছ? শ্যামসুন্দর বাবু বলিলেন, আজ্ঞে এখান হইতে পলেই কাছারি আট মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত কাছারির অতি সন্নিকটে ওলাসনি নামক একটি পাহাড় আছে। আজ ঐ কাছারিতে গেলে ভাল হয়।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম ধরিয়া রওনা হইলেন। বলরামবাবু প্রভৃতি বহুলোক বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে উঠিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইনি কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। সকলেই নগর পরিক্রমা করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যথাসময়ে গিয়া পলেই কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। কাছারির তহশীলদার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ পরমানন্দে ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে চারিজন পূজারী রহিয়াছে। ঠাকুরের ভোগ হইতে বেলা অবসান হইয়া গেল; কাজেই সে দিন আর কোথাও যাওয়া হইল না। সন্ধ্যার পর আরতিকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। স্থানীয় অনেক লোক আসিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারিতেছে না। কিঞ্চিৎকাল পরে অন্তর্য্যামী বাবাজী

মহাশয় যেন সকলের অন্তরের ভাব বুঝিয়াই নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তখন আবালবৃদ্ধ সকলেই নামকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। রাত্র প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন হইল। সকলেই পরমানন্দলাভ করিল। কীর্ত্তন সমাপ্তির পর সকলেই মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক শ্যামসুন্দর বাবুকে বলিলেন, "চল, একবার পাহাড় দেখিয়া আসি।" শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত চিত্তে ওলাসনি পাহাড় দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাবাজী মহাশয় সদলে নাম করিতে করিতে চলিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিবামাত্রই কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া বাহির হইলে বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক উহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ উহাদের গাদিঘরের সম্মুখে যাইয়া বসিলেন। উঁহাদের মধ্যে মধুসূদন দাস নামক একমূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন,—"নাম ভিন্ন কলি-জীবের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 'নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার। নাম বিনু কলিকালে গতি নাই আর॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। নাম নামী অভিন্ন। নামী হইতে নাম বড়। নাম বাঞ্ছাকল্পতরু। নামের নিকট যে যাহা চাহিবে, নাম তাহাই দিতে সমর্থ। কলিযুগে নামই সাধন, নামই ভজন, নামই কীর্ত্তন, নামই অবলম্বন।" বাবাজী মহাশয় এক একটি নামের ব্যাখ্যা শুনিতেছেন, আর ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক হইতেছে, ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখে জল ঝরিতেছে এবং গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন, "আজ আমি ধন্য হইলাম। বহুদিন যাবৎ এরূপ নামনিষ্ঠ সম্প্রদায়ী মহাত্মাদের সহিত দেখা বা সঙ্গলাভ আমার ভাগ্যে প্রভু মিলান নাই; আজ আমার পরম সৌভাগ্য এবং সুপ্রভাত।"

মধুসূদন। আচ্ছা! মহাপ্রভু যখন একমাত্র নামই কলিজীবের অবলম্বন এই বিধান করিয়াছেন, তখন সেই নাম পরিত্যাগ করিয়া জীব অন্যদিকে ধাবিত হয় কেন?

বাবাজী। জীব অন্য পথে চলে কেন? এ কথার উত্তর নাই। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ—

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! জীব কাহার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও বলপূর্ব্বক নিযুক্তের ন্যায় পাপ আচরণ করিয়া থাকে? কৃষ্ণ বলিলেন,—

কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

অর্থাৎ হে অর্জুন! এই কাম এবং ক্রোধ রজোগুণসমুদ্ভুত; জীবের সৎপথে চলিবার বিষয়ে ইহাদিগকেই পরম শত্রু বলিয়া জানিবে। ইহারা উভয়েই মহাশন (মহা পেটুক) অর্থাৎ ইহাদিগের ভোজ্য বিষয় যত প্রকার করিয়াই দেওয়া হউক না কেন, ইহাদিগের ক্ষুধার নিবৃত্তি বা শান্তি নাই। তাহাতে আবার মহাপাপ্মা অর্থাৎ ঘোর পাপী, দেশ কাল পাত্রাপাত্র বা সম্বন্ধাদির কোন বিচার নাই; ভোগ্যবস্তু পাইলেই হইল। তবেই ভাবিয়া দেখুন—মহাপ্রভু জীবের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার সুগম পন্থা সুস্পষ্টভাবে উপদেশ করিয়াছেন :—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

নামসংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদগম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলা অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

এত কৃপা সত্ত্বেও যখন আমাদের নামে অনুরাগ নাই, অতএব এ বিষয়ে আমাদের দুর্দ্দৈব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কি করুণা! পাছে আমাদের রুচি না হয় এই ভাবিয়া বহু বহু নামের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার যেটি ভাল লাগিবে, সে সেই নামটি বাছিয়া লইবে। যেন কেহ বঞ্চিত না হয়।

মধুসূদন। কেন? 'নাম' শব্দটি যে সম্প্রদায়ী লোকেই উচ্চারণ করুক না কেন, তাহার শব্দগত পার্থক্য হইবে কিরূপে?

বাবাজী। বাবা! নাম শব্দের ত কোনই কথা হয় নাই। নাম শব্দের সম্বন্ধী পদের কথা হইয়াছে। যেমন হরি, কৃষ্ণ, রাম, গোবিন্দ, গোপাল, নিতাই, গৌর প্রভৃতি একজনেরই শত সহস্র নাম রহিয়াছে। এই যে এক একটি নামগত শব্দ ইহার ত পার্থক্য অবশ্যই আছে। যেমন

আপনার নাম কৃষ্ণদাস, একজনের নাম হরিদাস, অপর একজনের নাম রামদাস ইত্যাদি। এই হরি-কৃষ্ণ-রাম-গত বা দাসত্বগত পার্থক্য না থাকিলেও ব্যক্তিগত পার্থক্য ত স্বীকার করিতেই হইবে? রামদাস বলিয়া ডাকিলে আপনি উত্তর দিবেন কি? অথবা কেবল দাস বলিয়া ডাকিলে কেহই সাড়া দিবেন কি?

মধুসূদন। আপনি যাহাই বলুন না কেন, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মত কেহ ছাড়িয়া দেয় কি?

বাবাজী। আমি কোনও সম্প্রদায়ের মত পরিত্যাগ করাইতে আসি নাই বাবা! আমি আপনাদের নিকট শিক্ষা লইতে আসিয়াছি। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যদি আপনাদের সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালীটি একবার বলেন, তবে আমি বড়ই সুখী হই। আর যদি কোন আপত্তি বা গুরু-পরম্পরায় কোনও নিষেধ থাকে, তাহা হইলে আমি অনুরোধ করি না।

মধুসূদন। না, আমাদের উপাসনা-প্রণালী কাহাকেও প্রকাশ করিতে গুরুদেব নিষেধ করেন নাই।

এই বলিয়া নিজের গলা থেকে একখানি পদক বাহির করিয়া বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিলেন। বাবাজী মহাশয় উহা হাতে করিয়া দেখেন—পদকের উপর 'নাম' এই দুইটি অক্ষর লেখা রহিয়াছে। তখন একটু বিস্মিতভাবে সেই মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটি দ্বারা আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমাকে একটু স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিন।"

মধুসূদন। আপনি ঐ পদকের উপর যাহা দেখিতেছেন, ঐটিই আমাদের উপাসনা—ঐটিই আমাদের পূজার বস্তু—ঐটিই আমাদের ধ্যেয়; ঐ মন্ত্রই আমরা মালায় জপ করি।

বাবাজী। আপনাদের গুরুদেবের কিরূপ আদেশ?

মধুসূদন। গুরুদেব বলিয়াছেন—"নাম ভিন্ন কলিকালে আর গতি

নাই। এই নামই একমাত্র সাধন—নামই জপ কর—নামই ধ্যান কর।

বাবাজী। তিনি কি 'নাম' এই দুইটি অক্ষর উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, না কোনও নির্দ্দিষ্ট নাম করিতে আদেশ করিয়াছেন ?

মধুসূদন। আমাদের পরম গুরুদেব পাহাড়ের উপর এই আশ্রমটি স্থাপন করিয়াছিলেন। পঞ্চান্ন বৎসর হইল এই আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার হাতের লেখা একখানি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের গুরুদেব আমাদিগকে উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

বাবাজী। আচ্ছা, আপনার পরম গুরুদেবের গ্রন্থখানি আমি কি একবার দেখিতে পারি ?

মধুসূদন। 'স্বচ্ছন্দে' বলিয়া গাদিঘর হইতে গ্রন্থখানি লইয়া আসিলেন এবং নিজেই তাহার আবরণ মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থখানি সংগ্রহগ্রন্থ—তালপাতার উপর হাতের লেখা। সংক্ষেপে মোটামুটি সংগ্রহ হইলেও গ্রন্থখানি নির্দ্দোষ—একমাত্র নামগত ; কাল প্রভাবে নামের বিশেষণ লোপ হইয়া একমাত্র বিশেষ্য পদে দাঁড়াইয়াছে।

বাবাজী। কই বাবা! আপনার গ্রন্থে ত 'নাম' এই দুইটি অক্ষর ভজিবার কথা কোথাও নাই। ইহার মধ্যে যাবতীয় কথা বা শ্লোক সমস্তই ভগবৎ-নামগত। তবে আপনারা এ সিদ্ধান্ত কোথায় পাইলেন ?

মধুসূদন। আমরা কখনও এই গ্রন্থ খুলিয়া দেখি নাই বা প্রয়োজন বোধ করি নাই কিংবা উপাসনা লইয়া কাহারও সহিত সমালোচনাও হয় নাই। আজ আপনার সহিত আলোচনায় যাহা বুঝিলাম, তাহাতে ত আমাদেরই বুঝিবার ভুল বলিয়া মনে হয়। তবে এখন কি করা যাইবে ?

বাবাজী। এসম্বন্ধে করিবার ত আর কিছুই নাই ; কারণ উপাসনা সম্বন্ধে জেদ করা বা সম্প্রদায়-অনুরোধে প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ করা

সম্পূর্ণ ভুল। আপনাদের উপাসনার ত আর কোনই অন্যথাচরণ হয় নাই ; কেবল 'নাম' এই দুইটি অক্ষর জপ না করিয়া আপন আপন রুচি-অনুসারে হরেকৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল, নিতাই, গৌর, রাম, নৃসিংহ, শিব-দুর্গা প্রভৃতি কোনও একটি নাম জপ কীর্ত্তন করিলেই হইবে।

শুনিয়া মধুসূদন দাস মহাশয় বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি আমার পরম উপকার সাধন করিলেন। আপনার কৃপায় আমি আজ প্রকৃত উপাসনার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইলাম। সম্প্রতি আপনার চরণে বিনীত প্রার্থনা যে আর যেন কোনরূপ প্রলোভনে পতিত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ না করি।" এইরূপভাবে নানাবিধ দীনতা-সূচক বাক্যে প্রাণের আবেগ জানাইতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে নাম-সম্প্রদায়ের অন্যান্য বৈষ্ণবসকল আসিয়া সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাহাড়ের উপর আজ যেন নামের সাগর উথলিয়া উঠিল। সকলেই আত্মহারাভাবে নাম করিতেছেন। নামের করুণায় এবং মহাপুরুষের সঙ্গপ্রভাবে সকলেরই চৈতন্য হইল—সকলেরই প্রাণে অনুতাপানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উঁহারা নাম করিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। কেহ কেহ অধীরভাবে সংকীর্ত্তনের মধ্যে গড়াগড়ি দিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের উদ্ধারের উপায় উপদেশ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এইরূপে বেলা অনুমান এগারটা পর্য্যন্ত পাহাড়ের উপর কীর্ত্তন করিয়া নাম করিতে করিতে নিকরাই কাছারিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমে স্নানাহ্নিকাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে কাছারির গোমস্তা বলিলেন, "আজ্ঞে এই অশিক্ষিত অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র গ্রামখানির মধ্যে একবার শ্রীচরণ অর্পণ করিলে ভাল

হয় না কি ? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গ্রামবাসী সকলেই আপনার দর্শনপ্রার্থী। একবার তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে।" বাবাজী মহাশয় গোমস্তার কথায় এবং গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের মানসিক আর্ত্তি শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া নাম করিতে করিতে বাহির হইলেন। পাড়া গাঁ—রাস্তা ঘাট তত পরিষ্কার না হইলেও গ্রামবাসী বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মন অতি নির্ম্মল। উহারা প্রাণের আবেগে স্ব স্ব গৃহকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সংকীর্ত্তনের আগুপাছু ছুটাছুটি করিয়া যাইতে লাগিল। উহাদের অপূর্ব্ব সরলতাপূর্ণ ভাব দর্শনে বাবাজী মহাশয় একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। গ্রামবাসীদিগের উৎকণ্ঠাহেতু সংকীর্ত্তনে এতই আনন্দ হইতে লাগিল যে, বাবাজী মহাশয় এবং ইঁহার সঙ্গিগণ সকলেই প্রেমোন্মত্ত—কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। এত বড় গ্রামখানির প্রত্যেক অলিগলি ভ্রমণ করিয়াও ক্লান্তিবোধ নাই। রাত্র হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু কাহারও সংজ্ঞা নাই। ক্রমেই দ্বিগুণতর আনন্দ হইতে লাগিল। কাহারই বাসায় ফিরিবার কথা মনে নাই দেখিয়া কৌশলী গোমস্তা গ্রামের মধ্যস্থ একটি সোজা রাস্তা দিয়া সংকীর্ত্তনের দলসহ কাছারিবাড়ীতে আসিয়া পেঁৗছিলেন। বাবাজী মহাশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গিগণ ভাবে বিভোর। কাছারিবাড়ীতে তিলার্দ্ধ স্থান নাই—লোকে লোকারণ্য। সকলেই আত্মহারাভাবে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া আছে। রাত্র অনুমান এগারটার সময় বাবাজী মহাশয় যে ঘরে ইঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, টলিতে টলিতে সেই ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। তখন সুচতুর নবদ্বীপদাস ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় ঠিক বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "আমি খাব।" তখন নবদ্বীপদাদার আদেশে ললিতাদাসী ফলের ঝুড়ি হইতে কমলালেবু ছাড়াইয়া বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিতে লাগিলেন,

ইনিও বালকের ন্যায় খাইতে খাইতে নানারূপ আবদার করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব ভাবাবেশ! অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর! বাহির হইতে যাহারা শুনিতেছে, তাহারা মনে করিতেছে যেন কোন বালক নিজ আত্মীয় স্বজনদের নিকট আবদার করিতেছে! এক এক বার এক এক জনের কোলের উপর বসিয়া পড়িতেছেন। সেও মন্ত্রমুগ্ধবৎ ইঁহাকে কোলে লইয়া বালকের ন্যায় ইঁহার মুখে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া দিতেছে, আর আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে। এইরূপে প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল বালক আবেশে উপস্থিত লোক সকলকে বাৎসল্য-রসে ডুবাইয়া রাখিলেন। হঠাৎ একটি লোক আসিয়া যেমন ইঁহার চরণে-হাত দিল, অমনি ভাবান্তর হইল। তখন "নিতাই নিতাই" বলিয়া চারিদিকে এরূপভাবে তাকাইতে লাগিলেন যেন কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নবদ্বীপ দাদাকে আদেশ করিলে তিনি গিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। তখন গ্রামবাসী সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। ইঁহারাও যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

পয়গম্বর পাহাড় দর্শন

পরদিন প্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া শ্যামসুন্দর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামসুন্দর! এখান হইতে কোথায় যাইতে হইবে?"

শ্যামসুন্দর বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে এস্থান হইতে চারিনঙ্গল কাছারি যাইবার মনস্থ করিয়াছি। ঐ কাছারির নিকটে একটি পাহাড় আছে। উহার নাম পয়গম্বর পাহাড়। ঐ স্থানটি লইয়া বহুদিন হইতে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুরা বলেন, "বলদেব জীউ

পশ্চিমাভিমুখ হইয়া কেন্দ্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।" মুসলমানেরা বলেন —"তাঁহাদের পয়গম্মর সাহেব সেখানে নামাজ করিয়াছিলেন। মুসলমান-পক্ষই প্রবল। তাই সে স্থানে মুসলমানদিগেরই সেবা বর্ত্তমান আছে। তবে সময় সময় হিন্দুরা দর্শন করিতে যান এবং উঁহার ভোগ দিয়া সেই প্রসাদও গ্রহণ করেন।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় অতি হৃষ্টচিত্তে নাম করিতে করিতে চারিনঙ্গল যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে বলিলেন, "শ্যামসুন্দর! চল, এই অবস্থাতেই পয়গম্বর সাহেবকে দর্শন করিয়া আসা যাউক।" শুনিয়া সকলেই পরমানন্দে নাম করিতে করিতে পাহাড়ের উপর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় মন্দিরের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। দেখিয়া সকলে অবাক্! মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন এইরূপ সাধু ত আমরা দেখি নাই।" কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় একটি সেবাইত মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! এ কার সেবা?"

সেবাইত। আজ্ঞে এই সেবা সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সহিত বহুদিন হইতে আমাদের বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুরা বলেন, কেন্দ্রাসুরকে বধ করিবার সময় বলদেবজীউ এইরূপভাবে হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা বলি, "আমাদের পয়গম্বর সাহেব নামাজ পড়িতে-ছেন। তাঁহারই নামে পাহাড়ের নাম "পয়গম্বর পাহাড়" হইয়াছে; কাজেই আমরা সেবা করি। তবে মাঝে মাঝে হিন্দুরা দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন।

বাবাজী মহাশয় সেবাইতের কথা শুনিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টি আনাইয়া উহাকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন। সঙ্গিগণও সকলেই অধরামৃত পাইলেন। তখন জগদীশবাবু বাবাজী মহাশয়কে

বলিতে লাগিলেন, "আপনার এই কার্য্যটি আমি বিশেষ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না ; কারণ আপনি যেরূপ আচরণ করিবেন, অপর লোক ত অবিচারে সেইরূপ আচরণ করিবে ! গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদ্ যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

বাবাজী। কেন, আপনাদের মতে যখন ইঁনি বলদেব, তখন ইঁহার প্রসাদ পাইতে দোষ কি ?

জগদীশ। আমাদের মতে যদিও ইনি বলদেব ; যবনস্পর্শ হইয়াছে ত ! অস্পৃশ্যস্পর্শে ঠাকুরের অভিষেক না হইলে শুদ্ধ হন না বা তাঁহার পূজাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

বাবাজী। তাহা হইলে বুঝা গেল—ভগবানকে যদি কোন বিজাতীয় লোক স্পর্শ করে, তবে তিনি অপবিত্র হন। বেশ কথা ! একটি ভিন্ন জাতীয় লোকের স্পর্শেই যিনি অপবিত্র হইয়া গেলেন, তিনিযে ঘোর পাপী পতিত পাষণ্ডকে উদ্ধার করিতে পারিবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ? স্বয়মসিদ্ধঃ কথমপরান্ সাধয়তি ? তাহা হইলে আপনাদের মতে যবনের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং হিন্দুর সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথক্ ; কারণ যিনি যবন সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি আবার ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিবেন কিরূপে ?

জগদীশ। তবে কি আপনি জাতিভেদটা কুসংস্কার বলিতে চান ?

বাবাজী। ইহার মধ্যে ত জাতিভেদের কোন কথাই হয় নাই। আমাদের কি ভুল ধারণা ! আমরা আমাদের জাতিকুলগত দলাদলিটা ভগবানে পর্য্যন্ত পেঁছাইয়াছি ! ভক্তিমার্গের কথা ত দূরে—স্বাভাবিক রাজ্যের কথাই ভাবিয়া দেখুন, ভগবানেই যদি স্পর্শদোষ বা জাতিগত বিচার রহিল, তবে তাহার ভগবত্তা কোথায় থাকে ? আপনাদের মতে ভগবানের কাহাকেও কৃপা করিতে হইলে একজন পরিচিত লোক সঙ্গে

রাখা উচিত ; কারণ ভুলক্রমে যদি তিনি কোনও যবনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন, তবে ত আর হিন্দুর বাড়ী যাইতে পারিবেন না ! আমরা মুখে পাঠ করিয়া থাকি—"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা । যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ।।" একবার যাঁহার নাম স্মরণ করিলে বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হইয়া যায়, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তিনি অপবিত্র হইবেন ?

জগদীশ। তাঁহার নাম করিলে ত শুচি হইবে ? যবনে ত আর ভগবানের নাম করে না !

বাবাজী। ভগবানের নাম আপনি কোন্‌টাকে বলিতে চান ? কেবল কি রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব, ব্রহ্মা বলিলেই ভগবানের নাম হইবে ? আর আল্লা, খোদা, পীর, পয়গম্বর, যিশু মহম্মদ বলিলে হইবে না ? প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শব্দই ব্রহ্ম ; জগতে যাবতীয় শব্দ আছে, সমস্তই ভগবৎ-প্রতিপাদ্য কেবল ভাষা মাত্রেরই পার্থক্য। তাই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যবনসভায় হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—

"নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ।।
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয় ॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম করে সকল ভুবন ।।
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে ।।
যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভার লয়।
হিংসা করিলেও সে তাঁহার হিংসা হয় ।।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লইয়া গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥
হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা দুরাচার ॥
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়া দুঃখ অপার ॥
হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম তারা কহে নামাভাসে ॥

এস্থানে ত তাহাও নহে; কারণ ইঁহারা আপনাদেরই ঠাকুরকে ভজিতেছেন। ইঁহাদিগকে বরং আপনাদের আরও উৎসাহ দেওয়া উচিত। ভগবানের অধরামৃত যখন স্পর্শদোষে নষ্ট হয় না, তখন স্বয়ং ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যবনস্পর্শে অপবিত্র হইবেন কেন? ভেদটা প্রবৃত্তির ব্যবহার লইয়া। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটি বর্ণ আছে এবং গুণের ক্রিয়া অনুসারে জাতির নির্ণয় হইয়াছে। তাই ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্ববর্ণেঽপি তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।"

অন্যত্র :—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥"

ভগবান্ কাহারই বাঁধা নহেন; তিনি ভাবগ্রাহী। বিশুদ্ধ ভাব হইলেই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেখুন, ইঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে নিজ

নিজ ভোগ-বিলাস সুখৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক এই পার্ব্বত্য ভূমিতে বাস করিয়া ত্রিসন্ধ্যা তাঁহারই উপাসনা করিতেছেন—তাঁহারই সেবা-পরিচর্য্যাদি করিয়া বিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। ইঁহাদিগকে সাধু বলিব না! আর আমরা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছের ন্যায় আচার-ব্যবহার করিতেছি; ঠাকুরকে সম্মুখে রাখিয়া নানারূপ অত্যাচার, অনাচার, জীবহিংসা, প্রবঞ্চকতা, ব্যবসা প্রভৃতি করিলেও আমরা সাধু; যেহেতু আমরা হিন্দু, আমাদের সব ক্ষমতা আছে! ইহাকে সংকীর্ণতা না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? এই ভাবের ভেদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি তুচ্ছ মনে করিয়াছেন। তিনি গুণের পক্ষপাতী। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

জগদীশ। তাহা হইলে অভিষেকের ব্যবস্থা যাহা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহাকে কি আপনি ভুল বলিতে চান?

বাবাজী। শাস্ত্রের যত কিছু বিধি-নিষেধ বা শাসন সমস্তই আত্ম-শোধনের জন্য। আমাদের চিত্তের পবিত্রতা সাধন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের এই শাসনই যদি না থাকিত, তবে এতদিন স্বেচ্ছাচার-দোষে আমাদের ধর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া যাইত। দোষ-গুণের বিচার করা আমাদের ন্যায় কলির জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই এই সমস্ত সমাজ-শাসন, শাস্ত্র-শাসন, জাতিভেদ, ক্রিয়াভেদ প্রভৃতির বিধান রহিয়াছে। তবে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইলে শাস্ত্রবিধির সকল আদেশ পালন করা চলে না।

বাবাজী মহাশয়ের মুখে শাস্ত্র এবং যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বকথা শ্রবণে জগদীশ বাবু পরম প্রীতিলাভ করিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ তত্ত্ব আলোচনার

পর বাবাজী মহাশয় নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মুসলমান কয়েকটি বড়ই শান্ত; এতক্ষণ তাঁহারা স্থিরভাবে বসিয়া বাবাজী মহাশয়ের মুখে তত্ত্বকথা শুনিতেছিলেন, আবার যখন নাম আরম্ভ হইল তখনও নিশ্চলভাবে একাগ্রচিত্তে নাম শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে মন্দির পরিক্রমা করিয়া নাম করিতে করিতে পাহাড়ের চারিদিক্ দর্শন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ভ্রমণান্তে সে স্থানের সেবক মুসলমানদিগের সহিত নানারূপ শিষ্ট ব্যবহার করিয়া নীচে নামিলেন। চারিনঙ্গল কাছারিতে বিশেষ-ভাবে ভোগরাগের যোগাড় হইয়াছিল। বাবাজী মহাশয় সগণে তথায় উপস্থিত হইলে ঠাকুরের ভোগ লাগিল। ইঁহারাও কিছুক্ষণ পরে স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

এইরূপে সে দিন কাটিয়া গেল। পরদিবস প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক শ্যামসুন্দর বাবুকে কোন্ দিকে যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে এখান হইতে লক্ষ্মী নারায়ণ দাদার এলাকা গোপালপুর ছয় মাইল হইবে। এ বেলা সেই কাছারিবাড়ী গেলেই ভাল হয়। সেস্থান হইতে কাল খণ্ডগিরি, বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং অন্যান্য দেবদেবীগণকে দর্শন করিতে যাওয়া হইবে। গোপালপুর হইতে খণ্ডগিরি মাত্র দুই মাইল রাস্তা।" তাহাই হইল। বাবাজী মহাশয় নাম ধরিয়া নাচিতে নাচিতে শ্যামসুন্দর বাবুর প্রদর্শিত পথে গোপালপুর রওনা হইলেন। ইঁহাদের সঙ্গেই বহুলোক; তারপর আবার যখন যে গ্রামে যাইতেছেন, সেই গ্রাম হইতে দুই চারিজন করিয়া সঙ্গে চলিতেছে; সকলেই পরমানন্দিত—সকলেই নৃত্যপরায়ণ—সকলেই উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতেছেন, আর প্রাণ খুলিয়া বাবাজী মহাশয়ের জয় দিতেছেন।

ক্রমে বেলা অনুমান নয়টার সময় গিয়া গোপালপুর কাছারিতে পেঁাছিলেন। পূর্ব্ব হইতে কাছারিতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; কাজেই

বাবাজী মহাশয়ের বা ইঁহার সঙ্গিগণের যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই প্রস্তুত। কাছারিতে উপস্থিত হইয়া প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে লোকারণ্য! গ্রামবাসী ইতর-ভদ্র, হিন্দু-যবন সকলেই সমবেত হইয়াছে। অপূর্ব্ব আকর্ষণ! কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, চাষী লাঙ্গল ছাড়িয়া, বালক খেলা ফেলিয়া, গৃহস্থ বাজারে যাইতে যাইতেই একেবারে কাছারিবাড়ীতে উপস্থিত। সকলেই হাতে তালি দিয়া সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর সকলে কিঞ্চিৎ বিশ্রামপূর্ব্বক স্নান করিতে চলিলেন। এদিকে ঠাকুরের ভোগরাগ শেষ হইলে বাবাজী মহাশয় তিলক-আহ্নিকাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

গোপালপুর গ্রামখানি বেশ সমৃদ্ধ এবং বহুজনপূর্ণ। বাবাজী মহাশয় অপরাহ্নে বসিয়া আছেন, এই সময় কয়েকজন গ্রামবাসী লোক আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমাদের বড়ই বাসনা যে, গ্রামের মধ্যে একবার শ্রীচরণ অর্পণ করা হয়।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "সে ত আমার ভাগ্যের কথা ভাই! তবে চল, সংকীর্ত্তন লইয়াই যাওয়া যাক্।" তখন লক্ষ্মীনারায়ণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে কীর্ত্তন লইয়া গেলে গ্রামের শোভাও দেখা হয় না, গ্রামবাসী লোকও প্রাণ ভরিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারে না। অতএব শুধু বেড়াইতে গেলে ভাল হয় না?" বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ভক্তের ইচ্ছাতেই সম্মত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। এক এক বাড়ী বা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গলি দিয়া যাইবার সময় সেই পাড়ার লোকদিগের আর্ত্তিপূর্ণ সরল ব্যবহার দর্শনে ইনি বিমুগ্ধ হইয়া যাই-তেছেন। এইরূপ বহুক্ষণ ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় কাছারিবাড়ীতে আসিয়া আরতি-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাত্র প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত নামকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয়বার খণ্ডগিরিতে মহোৎসব

পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় খণ্ডগিরি দর্শনে যাইবার প্রস্তাব করায় লক্ষ্মীনারায়ণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে আমার ইচ্ছা যে, মধ্যাহ্নে এই স্থানেই ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক পাহাড়ে উঠিলে ভাল হয়। কারণ সেখানে এক রাত্রি না থাকিলে সুবিধা হইবে না। বিশেষতঃ এই পাহাড়ে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে।" বাবাজী মহাশয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্নান-আহ্নিকাদি করিতে লাগিলেন। বেলা একটার সময় সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া নাম করিতে করিতে খণ্ডগিরি রওনা হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্মীনারায়ণবাবু সকলের রাত্রিবাসের জন্য একটি খুব বড় তাঁবু খাটাইয়া তাহার এক পার্শ্বে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিলোকদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করত অপর পার্শ্বে শ্যামসুন্দরবাবু প্রভৃতির থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পাহাড়ের উপর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পার্শ্বস্থ পল্লীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণদিগের মনের ধারণা যে, বাবাজী মহাশয় জাতিভেদ একেবারে মানেন না এবং এই জাতিভেদ প্রথা দূর করিবার জন্যই দেশে দেশে ভ্রমণপূর্ব্বক মহোৎসবাদিতে আচণ্ডালকে একসঙ্গে আহার করান হয়। তাই আজ কয়েকজন মিলিয়া প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য পাহাড়ের উপর বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় দূর হইতে উঁহাদিগকে দেখিবামাত্রই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি মহাপুরুষ; আমরা বেদাদি অধ্যয়ন বা আচারাদিশূন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। আমাদিগকে আপনার ঐরূপ সম্মান দেখান যুক্তিযুক্ত নহে।"

বাবাজী মহাশয় করজোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ। আবার ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন—'অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ'। আপনাদের ব্যবহার দেখায় অপরের অধিকার নাই, আপনারা যাহাই কেন হউন না, আমাদের গুরুস্থানীয়।" ব্রাহ্মণগণ আর কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া উপবেশন করিলেন। উঁহাদের মধ্যে স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী একটি প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা জাতিভেদটি সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি না জীব-কল্পিত?"

বাবাজী। ভগবান্ বলিয়াছেন :—"চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" আবার অন্যত্র—"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ॥ চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥" অন্যত্র—"অন্ত্যজানসৃজৎ ব্রহ্মা তামসান্ শ্রমজীবিনঃ।" যখন ভগবান্ গুণকর্ম্মাদিভেদে পৃথক্ পৃথকভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের আশ্রমাদিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন জাতিভেদটি আধুনিক বলিলে চলিবে কেন?

স্মৃতিরত্ন। আজকাল শিক্ষিত সমাজে—এমন কি, অনেক সাধক-গণের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাঁহারা এই জাতিভেদপ্রথাটি উচ্ছেদ করিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইতেছেন।

বাবাজী। অনাসিদ্ধ বস্তুকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টাকে উচ্ছৃঙ্খলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

স্মৃতিরত্ন। শুনিয়াছি, চৈতন্যদেব নাকি জাতিভেদ মানিতেন না। তাই তাঁহার গণেরাও মানেন না?

বাবাজী। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মর্য্যাদাপুরুষোত্তম। জগতে এরূপ কোন পদার্থই নাই যাহা তিনি না মানেন। তবে তিনি সারগ্রাহী, শাস্ত্রের যাহা সার মর্ম্ম সেইটি তিনি নিরপেক্ষভাবে পালন করিয়াছেন।

তবে ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

তথা ভাগবতে—"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচো বরিষ্ঠঃ। মন্যে তদর্পিতমনো বচনে হিতার্থঃ প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন ; তাই লোকে বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করে তিনি জাতিভেদ মানেন না।

স্মৃতিরত্ন। আপনাদের মধ্যে যেরূপ আহারাদির ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহাতে যে জাতি বলিয়া কথাটা জগতে আছে, আমাদের ত সেরূপ বোধ হয় না। মানুষ ত দূরের কথা—কুকুরের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি গ্রহণ করিতেছেন। এ কি একাকার কাণ্ড!

বাবাজী। বাবা! আপনারা কখনও কি শ্রীক্ষেত্র-ধামের ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই? না দেখিলেও আপনারা সুপণ্ডিত। শাস্ত্রাদি ত কাহারও অবিদিত নাই। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন :—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥"

অন্যত্র—কুক্কুরাণাং মুখাদ্ ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ।

* * *

"কৃষ্ণে নিবেদিত বস্তুর প্রসাদ আখ্যান।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম ॥
স্পর্শদোষে কৃষ্ণপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়।
নষ্টদোষ ঘটাইলে নরক নিশ্চয় ॥

এইরূপে বাবাজী মহাশয় নানাপ্রকার প্রমাণাদির দ্বারা মহাপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। পাহাড়ের নিকট একখানি গ্রামে একটি রামাইত বৈষ্ণবের মঠ আছে। ঐ মঠে রামসীতার সেবা রহিয়াছে। মঠের মহান্ত বাবাজী কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মহাসমারোহের সহিত তাঁহাদের ইষ্টদেবতা রামসীতার মূর্ত্তি লইয়া এই খণ্ডগিরিতে আগমনপূর্ব্বক রাসলীলা করিয়া থাকেন। তিনি যেমন শুনিলেন যে বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তনের দল সহ বহুলোক সমভিব্যাহারে খণ্ডগিরি আগমনপূর্ব্বক এক রাত্রি সেই স্থানে বাস করিবেন, অমনি গ্রাম্যলোকদিগকে খবর দিলেন যে আজই আমার ঠাকুর খণ্ডগিরি যাইবেন। অনেক লোক আসিতে লাগিল। একজন ভদ্রলোক আসিয়া মহান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহান্ত মহারাজ! আপনার রথযাত্রা কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন হইত না?"

মহান্ত। বাবা! যখন মহাত্মা বৈষ্ণব আগমন করিবেন তখন আজই আমার সেই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

তখন আর কেহ কিছু না বলিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত ঠাকুরকে লইয়া চলিলেন। অপূর্ব্ব আকর্ষণ! চারিদিক হইতে নানাভাবের গানের দল আসিতে লাগিল। মহা হুলস্থূল ব্যাপার! কোথাও মৃদঙ্গ, কোথাও মাদল, কোথাও পাখোয়াজ, কোথাও ঢোলক, কোথাও খমক, কোথাও খঞ্জনি প্রভৃতি বাজাইয়া কীর্ত্তন হইতেছে। চারিদিকে নানারূপ দোকান-পসার বসিয়াছে। অনেক রকম খেলা ও তামাসাও আসিয়াছে। অতিবিস্তৃত

স্থান ; লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু অনুমান চারি পাঁচ শত লোকের পরিমাণ রান্নার যোগাড় করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের ধারণা ছিল যে, একে পাহাড়ের উপর, তাহাতে রাত্রিকাল, বোধ হয় বেশী লোক হইবে না ; কিন্তু অতিরিক্ত লোকসংখ্যা হওয়ায় লজ্জিতভাবে একখানা পাল্‌কির মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল। চারিদিকে মশাল জ্বলিতেছে। নানাপ্রকার গানবাদ্য এবং লোকের গোলমালে দশদিক্‌ মুখরিত। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা! কে কাহাকে লক্ষ্য করে? তাঁবুর মধ্যে বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে লোকারণ্য ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাহারও মুখে কথা নাই—সকলেই নীরবে সংকীর্ত্তন শুনিতেছে।

রাত্র অনুমান এগারটার সময় কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্যামসুন্দর বাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে লক্ষ্মীনারায়ণ দাদা চারি পাঁচশত লোকের পরিমাণ রান্না করাইয়াছেন। উপস্থিত লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইবে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি ত পলাইয়া আছেন। এ-দিকে ঠাকুরের ভোগও হইয়া গিয়াছে। কিরূপ করা যাইবে? বাবাজী মহা-শয় বলরাম ভ্রমরবরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বলরাম! যে স্থানে রান্না হইতেছে, তাহার নিকট গিয়া করযোড়ে মা অন্নপূর্ণাকে বল,"মাগো করুণা ময়ি! ক্ষুধার্ত্ত অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে। একে রাত্র তাহাতে পার্ব্বত্য ভূমি ; অন্য কোনওরূপ যোগাড় করার সাধ্য নাই, অতএব এই বস্তুর দ্বারা যাহাতে সকলের সংকুলান হয় তাহাই কর।" এদিকে সকলকে এক সঙ্গে বসাইয়া দাও এবং পূজারীদিগকে বল যেন ডাল-তরকারী অন্ন প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষের এক পাশ হইতে পরিবেষণ করে। আমিও যাই-তেছি।" বলরাম বাবু বিনা বিচারে বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় যেস্থানে ভোগ

হইয়াছে, সেখানে গিয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে "জয় নিতাই" বলিয়া হুঙ্কার করতঃ পূজারীদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন, "বাবা! নিতাইচাঁদের কৃপায় কোনই অভাব হইবে না; মা জাহ্নবীকে স্মরণপূর্ব্বক একপাশ হইতে পরিবেষণ কর।" এই বলিয়া পঙ্গতের মধ্যে গমন করিলেন। সকলকে পাতা দেওয়ার সময় দেখেন যে, পাতা কম আছে। তখন উপস্থিত দোকানীদের দোকানে যাহা ছিল আনাইলেন। বাকি কেহ কেহ মাটির পাত্রে কেহ বা কাপড় পাতিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণকে বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে আপনাদের ত এত রাত্রে বাড়ী যাওয়া কঠিন; তবে কিছু জলখাবার আনাইয়া দেওয়া যাক্।" ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি এইমাত্র মহাপ্রসাদের এত মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিলেন, আবার আমাদিগকে জলখাবার দিবেন কেন?"

বাবাজী। দেখুন, সেটি আপনাদের রুচি; কারণ বিশ্বাস ত আর অপরের কথামত চলে না! অনুগ্রহ করিয়া যদি আদেশ করেন, তবে সেইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রসাদ পাইতে স্বীকৃত হইলে বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইঁহাদিগকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পৃথক স্থানে বসাইয়া মহাপ্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" শ্যামসুন্দর বাবু সেইরূপ ব্যবস্থাই করিলেন বটে; কিন্তু একে লোকের সংখ্যা অধিক, তাহাতে রাত্রিকাল; যতই পৃথক করিয়া বসান হউক না কেন, নানাজাতীয় লোক গিয়া উঁহাদের নিকট বসিতে লাগিল। শ্যামসুন্দরবাবু তাহাদিগকে উঠাইতে গেলে ব্রাহ্মণগণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "বাবু! এ মহাপ্রসাদ, ইহাতে আবার জাতিবিচার কি? ইহাতে স্পর্শদোষ হইতে পারে না।" শুনিয়া সকলেই বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়ের শক্তির জয় দিতে লাগিলেন।

ক্রমে পরিবেশন আরম্ভ হইল। পূজারীগণ বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত একপাশ হইতে দিতে লাগিলেন। নিতাইচাঁদের অপরূপ খেলা! অলক্ষিতভাবে উপস্থিত সর্ব্বসাধারণ লোকের পরিপূর্ণভাবে মহাপ্রসাদ পাওয়া হইল। তখন লক্ষ্মীনারায়ণবাবু, বলরামবাবু, শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি পরমানন্দে বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "আজ্ঞে, এত লোকের পরিপূর্ণভাবে প্রসাদ পাওয়ার পরেও এখন প্রায় পঁচিশ জনের প্রসাদ অবশিষ্ট আছে। কি আশ্চর্য্য! এ কিরূপে হইল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

বাবাজী। ভগবৎশক্তির খেলা কাহারও বোধগম্য হইতে পারে কি? দ্রৌপদীর এক কণা শাকে দশ হাজার ঋষির যিনি উদর পূরণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট পাঁচশত লোকের অন্নে পাঁচ হাজার লোক খাওয়ান, এ ত অতি যৎসামান্য কথা। জগতে এমন কোনও অসম্ভব কার্য্য নাই, যাহা তাঁহার কৃপাকটাক্ষে সম্ভব হইতে না পারে। কেবল আমাদের নিজ নিজ বিশ্বাসের অভাবেই আমরা অভাব বোধ করিয়া থাকি।

এইরূপ নানাবিধ উপদেশ-বাক্য দ্বারা সকলের মনে প্রবোধ দিয়া বা নিজ প্রতিষ্ঠার ভয়ে ঐশ্বর্য্যভাব গোপন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাদ পাইবার আদেশ করতঃ নিজে মহাপ্রসাদ পাইলেন। সকলেই বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত লইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। আগন্তুক লোক সকল আর কেহ সে রাত্রে কোথাও না গিয়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদে রাত্রিযাপন করিতে লাগিল।

—০—

বাঁকশাই গমন

পরদিন প্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সগণে নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন। যে গ্রামে সংকীর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে, সেই গ্রামবাসী বালকবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলেই উধাও হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কি আশ্চর্য্য! যুবতী কুলবধূ এরূপ অবস্থায় আসিয়া সংকীর্ত্তনের নিকট উপস্থিত হইতেছে যে কুলমর্য্যাদা বা গুরুজনভীতি অথবা নিজ সঙ্কোচাদির কথা যেন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। এক গ্রামের সীমা পর্য্যন্ত না পেঁছাইতেই অপর গ্রামের লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। এইরূপে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে বেলা অনুমান দশটার সময় বাঁকশাই কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটি শ্যামসুন্দর বাবুদের এলাকায়। পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুরের ভোগ রান্নার যোগাড় করা হইয়াছিল। বাবাজী মহাশয় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামসুন্দর! এস্থানে কোন প্রসিদ্ধ ঠাকুরসেবা আছে কি?"

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে, এই গ্রামে গোপাল জীউ আছেন। অপূর্ব্ব বিগ্রহ এবং বহুদিনের প্রাচীন সেবা।

বাবাজী। এই সময় একবার দর্শন করিতে গেলে হয় না?

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। গোপালজীউর ভোগের সময় প্রায় উপস্থিত। অতএব বিকাল বেলা গেলে বড়ই আনন্দ হইবে।

বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দরবাবুর কথায় সম্মত হইয়া স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে রান্না শেষ হইলে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল। ইঁহারাও সংকীর্ত্তন সমাপনান্তে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় সকলে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গোপাল-জীউর দর্শনে চলিলেন। নিজের সঙ্গেই অনেক লোক, তারপর আবার গ্রাম বাসী বহুলোক ইঁহাদের অভিনব অপ্রাকৃত আনন্দময় সঙ্গ পাইয়া স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। গোপালজীউর সেবা এই কথা শুনিয়া প্রথমে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, হয় ত বালগোপাল মূর্ত্তি; কিন্তু উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, রাধামদনগোপালজীউ। অপূর্ব্ব দর্শন! রাধা-মদনগোপাল উভয়েরই যেন নতুন রকমের ভাব, নতুন রকমের ভঙ্গি। দর্শনমাত্রই বাবাজী মহাশয় প্রেমে বিভোর হইয়া নানারূপ পদ-পদাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যদিও উপস্থিত লোকসকল প্রায়ই পল্লীগ্রামবাসী—বাঙ্গালা ভাষা কখনও তাহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি বাবাজী মহাশয়ের মুখে সরল ভাষায় মধুময় পদাবলী শ্রবণে আবালবৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিমুগ্ধ। সকলেই যেন আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এক একবার মনে হইতেছে, মদনগোপালজীউ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তনানন্দে সকলকে আনন্দিত করিয়া নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ণে খানু মিঞা নামক একটি মুসলমান গায়ক বাবাজী মহাশয়কে গান শুনাইতে আসিলেন। বাঁকশাই কাছারি-বাড়ীর একপ্রান্তে বাগিচার মধ্যে অপূর্ব্ব একটি বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষটি স্বভাবতই এমনভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, দেখিলে ঠিক্ একটি নিকুঞ্জ বলিয়া বোধ হয়। উচ্চপ্রদেশ হইতে বৃক্ষের শাখাগুলি এরূপভাবে ভূমিতল স্পর্শ করিয়াছে যে, একটু কষ্ট করিয়া কেহ বৃক্ষের মূলপ্রদেশে প্রবেশ করিলে বাহির হইতে আর তাহাকে দেখা যায় না। খানু মিঞা এবং শ্যামসুন্দর

বাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয় সেই বৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিলেন। খানু মিঞা নিজ রচিত পদে অতি মধুর ভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সুললিত পদাবলী, তেমনই উঁহার মধুময় কণ্ঠস্বর। তিনি এক একটি গান করিতেছেন, আর বাবাজী মহাশয় ও অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন।

এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন হইতেছে, হঠাৎ বাবাজী মহাশয় আনন্দবিহ্বলভাবে খানু মিঞাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উঁহার কর্ণে হরিনাম মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন খানু মিঞা আনন্দে বিভোর হইয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আজ আমার জীবন ধন্য হইল। এতদিন যে আমি কৃষ্ণলীলাগুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছি, আজ তাহা সার্থক হইল। আজ আমি জানিলাম যে, প্রভু আমাকে অঙ্গীকার করিলেন।" শ্যামসুন্দরবাবু প্রভৃতি সকলেই খানু মিঞার প্রতি বাবাজী মহাশয়ের অযাচিত কৃপাদর্শনে সমস্বরে উঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। খানু মিঞা বিনীত বাক্যে সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ইঁহার আদেশে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুকে বলিলেন, "দেখ শ্যামসুন্দর! এই স্থানটি এমন মনোরম যে, এস্থান ছাড়িয়া আমার স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা হইতেছে না।" এইরূপ কথোপকথনে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে কাছারিবাড়ীতে আসিয়া সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলন কীর্ত্তনান্তে যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক কাছারিবাড়ীর অঙ্গনে নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে চারিদিক হইতে বহুলোক আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। বেলা অনুমান সাড়ে

আটটার সময় অঙ্গনে রৌদ্র পতিত হওয়ায় বাবাজী মহাশয়ের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া শ্যামসুন্দরবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে ঘরে গিয়া কীর্ত্তন করিলে ভাল হয় না ?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "না, আজ এই অঙ্গনেই উদয়াস্ত নামকীর্ত্তন হইবে।" শুনিয়া শ্যামসুন্দরবাবু অতি হৃষ্টচিত্তে উপরে আচ্ছাদন করিয়া দিলেন।

অপূর্ব্ব আকর্ষণ ! বেলার সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাড়ীতে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। প্রায় ছয় সাতশত লোক উপস্থিত হইয়াছে। কাছারিবাড়ীর একপ্রান্তে একখানি ঘরে একটা বড় সম্বর* বাঁধা ছিল। বেলা অনুমান বারটার সময় সে ছটফট করিতে লাগিল। কিছুতেই ঘরে থাকিতেছে না দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "উহাকে ছাড়িয়া দাও।" তখন একজন উহাকে ছাড়িয়া দিবামাত্র সে অতি দ্রুতবেগে বাবাজী মহাশয়ের কাছে আসিয়া ইঁহার গা চাটিতে লাগিল। তখন বাবাজী মহাশয় উহার কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিয়া কহিলেন, "যাও বাবা ! সুস্থ হইয়া ঘরে থাক এবং মনে মনে নাম কর ; প্রভু অচিরাৎ তোমাকে কৃপা করিবেন।" বলিয়া যেমন বাম হস্তে সম্বরটির পিঠের উপর একটি চাপড় মারিলেন, অমনি সে ধীরে ধীরে নিজগৃহে চলিয়া গেল। সকলে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "আমরা কখনও এরূপ মহাপুরুষ দেখি নাই— দেখিব বলিয়া আশাও ছিল না।" ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় নামের সহিত আরতি-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাত্র অনুমান দশটার সময় মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

—*—

* হরিণজাতীয় জন্তুবিশেষ।

মহাপ্রসাদের মিলন

একদিন সকালবেলা সকলে বসিয়া আছেন, হঠাৎ বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ শ্যামসুন্দর! আজ বড়ই শুভদিন। এমন দিন প্রায়ই ঘটে না।"

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে এমন কি আশ্চর্য্য ঘটনা হইল যে আপনি দিনটার এত প্রশংসা করিতেছেন?

বাবাজী। আজ একটি অপূর্ব্ব সম্মিলন হইবে।

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে আমরা দেখিতে পাইব ত?

বাবাজী। পাইবে বই কি! সকলের সমক্ষেই হইবে।

এই কথা শুনিয়া সকলেই অতি উৎকণ্ঠিতভাবে সেই সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কীর্ত্তন করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণানন্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় একজন লোক ভার কাঁধে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার বাঁকে কি আছে?"

ভারী। শ্রীজগন্নাথঙ্কর মহাপ্রসাদ আউ কেন্দ্রাপাড়া বলদেব জীউ গোবিন্দ জীউ ও গোপীনাথ জীউঙ্কর মহাপ্রসাদ বিজয় করি অচ্ছন্তি।

শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত এবং নয়ন দুইটি সজল ও আরক্তিম হইল। আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া মহাপ্রসাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ভিতর আঙ্গিনায় লইয়া গিয়া নিজহস্তে পুঁটলি খুলিতেছেন, এই সময় একজন পূজারী আসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে গোপালজীউর কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ আনিয়াছি।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয়

শশব্যস্তে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ প্রণাম বন্দনা করতঃ নিজহস্তে উহা একপার্শ্বে রাখিলেন। ইত্যবসরে এক সঙ্গে দুইজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল, "আজ্ঞে চারিনঙ্গলের মোহান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর প্রসাদ পাঠাইয়াছেন।" অপর ব্যক্তি বলিল, "আজ্ঞে কয়েরপুরের শ্যামবাবু তাঁহাদের বিনোদবিহারী জীউর, কুয়াপালের গোপীনাথ জীউর এবং মাহাঙ্গার গোবিন্দজীউর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন।" এবার বাবাজী মহাশয়ের ধৈর্য্য রহিল না! আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া মহাপ্রসাদের আবরণ মোচনপূর্ব্বক একটি পাত্রে সমস্ত মহাপ্রসাদ একত্রিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ললিতাদাসী সকল প্রসাদ হইতে পৃথক পৃথক ভাবে কিছু কিছু লইয়া একখানি থালায় একটি পারশ করিলেন। বাবাজী মহাশয় সকলকে একত্রে বসিবার আদেশ করিয়া নিজহস্তে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলে ললিতাদাসী বলিলেন, "আজ্ঞে আপনি এই মধ্যস্থানে বসুন, আমি সকলকে পরিবেশন করিয়া দিই।" তাহাই হইল। বাবাজী মহাশয় মধ্যস্থলে বসিলেন। ললিতাদাসী সেই পারশের থালাখানি ইঁহার সম্মুখে দিয়া অপরাপর সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্ত-মণ্ডলী লীলাময়ের এই বিচিত্র লীলাদর্শনে একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দর বাবুকে বলিলেন, "শ্যামসুন্দর! জগন্নাথের ভারীকে জিজ্ঞাসা কর ত তাহাকে কে এখানে পাঠাইল?" শ্যামসুন্দর বাবু ভারীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আজ্ঞে পনর দিন বড় সিঙ্গার ভোগ হ্যালা উত্তারু জনে কালিয়া ব্রাহ্মণ বড় দেউলরু ভারিয়া বলি ডাকিলে মু পঁহুছি-বারু মোহর হাতরে দেড়টি টঙ্কা দেই কহিলে তু এহি মহাপ্রসাদ নেই নেয়ালী বাটে ঝঙকর দেই কেন্দ্রাপাড়া পঁহুছি সেঠু শ্যামসুন্দর বাবুঙ্ক

ইলাকারে অলাতিঠারে বাঁকশাই চরণদাস বড় বাবাজী অছি তাকু দেবু। এহি দেড় টঙ্কা বাটরে খর্চ্চ করিবু ; তোহর মজুরি সেঠি মাগিলে সে দেই দেবে।' ইহা বলি সে চালি গলা, মু বি ভার নেই রহনা হইলি, যেমতি কেন্দ্রাপাড়া আপনা ওয়াসকু পঁহুছিলু ঠিক সেহি সময়রে বলদেবঙ্কর মহাপ্রসাদ আসি বিজয় কলে। মোহর এহি কথা শুনি সমস্তে আনন্দ হোই সেই বলদেবঙ্কর প্রসাদ আউ গোবিন্দদেবঙ্কর প্রসাদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ জগদেবঙ্কর গোপীনাথ জীউঙ্কর প্রসাদ মোহর হাতরে দেই গোটিয়ে লোক সঙ্গে এঠি পাঠাই দেবা হেলে! মু আউ কোন কহিবি জগন্নাথঙ্কর অনুগ্রহরে মুযে এত্তে বাট চালি আসিলি মোহর টিকিয়ে কষ্ট বা পরিশ্রম বোধ হোই নাহি।" ভারীর কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় জগন্নাথদেবের কৃপা ও ভালবাসার কথা মনে করিয়া অঝোরনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হা প্রভূ! নরাধম যদিও তোমাকে ছাড়িয়া দূরদেশে আসিয়াছে, তথাপি তোমার কি এতই কৃপা! ধন্য ধন্য করুণাময়!" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী আনন্দ-বিহ্বলভাবে 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া কেহ বা নৃত্য কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সেই স্থানে গড়াগড়ি দিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এইরূপ মহাপ্রসাদ-মিলনানন্দে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। শ্যামসুন্দরবাবু জগন্নাথের ভারীকে কিছু দিয়া বিদায় করিলেন। সন্ধ্যার সময় বাবাজী মহাশয় আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলন কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

—*—

কুয়াপাল, মাহাঙ্গা ও কয়েরপুর গমন

একদিন কুয়াপাল নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে বাবাজী মহাশয়কে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলে ইনি সদলে নাম করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলোক বাবুর ঠাকুরবাড়ীতে প্রায় তিনঘণ্টাকাল মাতামাতি উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হইল এবং অনেক লোক বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিল।

সেস্থানে একদিন থাকিয়া তথা হইতে মাহাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দ-চন্দ্র ব্রহ্মের বাড়ীতে গমন করিলেন। আনন্দবাবু বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত সকলের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা যে সগণে বাবাজী মহাশয়কে অন্ততঃ কিছুদিন ওখানে রাখেন ; কিন্তু তাঁহার সে বাসনা ফলবতী হইল না ; কারণ বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছা যে একবার উড়িষ্যা প্রদেশ ভ্রমণ করেন। সুতরাং একস্থানে বহুদিন থাকা হইতেছে না। দুইদিন মাহাঙ্গায় থাকিয়া শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ সেন মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে কয়েরপুর তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীতে গমন করিলেন। ঠাকুরের নাম বিনোদবিহারী। ঠাকুরের বামে শ্রীমতী এবং দক্ষিণে ললিতাজীউ রহিয়াছেন। অপূর্ব্ব দর্শন এবং বড়ই প্রীতির সেবা। শ্যামচরণ বাবুরা জাতিতে বৈদ্য। উঁহাদের বংশাবলীর মধ্যে সকলেই বিনোদ-গতপ্রাণ। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার ফুলের সাজ প্রস্তুত করিয়া বিনোদবিহারী জীউকে সাজাইয়া থাকেন। ইঁহাদের বাটীস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যে আর একটি মধুর জিনিষ বর্ত্তমান ; সেটি হিংসা বা ঈর্ষা, অর্থাৎ কেহ যদি বিনোদকে ফুলের চুড়া প্রস্তুত করিয়া দিলেন, অপর একজন দেখিবামাত্র তিনি ফুলের আঁচলা, কাণবালা

ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া পরাইলেন। অপর একজন আবার তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফুলের গহনা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কেবল যে সাজাইবার বিষয়েই এইরূপ, তাহা নহে; ভোগের সম্বন্ধেও এইরূপ। পরস্পর পরস্পরকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা। মোট কথা—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিনোদবিহারীজীউকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বিনোদবিহারীকে লইয়া। আজ বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত; কোনও নৈমিত্তিক লীলার অনুরোধেই হউক অথবা বাবাজী মহাশয়ের দর্শনার্থেই হউক বিনোদবিহারী, শ্রীমতী এবং ললিতা দেবীকে বাহিরে বিজয় করা হইয়াছে। বিনোদবিহারীর সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত এবং নানারূপ ফুলসাজে সজ্জিত। উঁহার চারিদিকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছসকল বিরাজিত। অপূর্ব্ব শোভা! বাবাজী মহাশয় বিনোদবিহারীজীউকে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এক একবার ললিতাদেবী ও শ্রীমতীর অপূর্ব্ব ভাব ও সৌন্দর্য্য দর্শনে অঝোর নয়নে ঝরিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! বিনোদবিহারীজীউ আজ বাহিরে কেন?" বালক বলিল, "আজ কেবল আপনাকে দর্শন দিবার জন্যই ঠাকুর বাহিরে বিজয় করিয়াছেন।" শুনিবামাত্র প্রেমপুলকিতভাবে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভু! ধন্য তোমার করুণা! আমি তোমাকে না চাহিলেও তুমি আমার জন্য এত ব্যস্ত! আমাকে দর্শন দিবার জন্য তুমি কিনা নিজ সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া বসিয়াছ! কি আর বলিব? বলিবার ভাষা নাই!" ইত্যাদি নানারূপ দীনতাপূর্ণ বাক্য বলিয়াও প্রাণের আবেগ মিটাইতে না পারায় কীর্ত্তন ধরিলেন :—

(হের দেখ) বিনোদ নাগর, বিনোদ নাগরী, বিনোদ মোহন রূপ।
বিনোদ হেলন, বিনোদ দোলন, বিনোদ রসের কূপ॥

বিনোদ বচন, বিনোদ রচন, বিনোদ মুখের হাসি।
বিনোদ নয়নে, বিনোদ চাহনি, মরমে রহল পশি ॥
দক্ষিণে ললিতা, বামে ভানুসুতা, মাঝে শোহে নটরাজ।
(কিবা) নব জলধরে, যনু সৌদামিনী, মদনমোহন সাজ ॥
(দোঁহার) নাসায় মুকুতা, কাটিতে কিঙ্কিণী, চরণে নূপুর বাজে।
আধ নীল সাড়ী, আধ পীতবাস, জিনি মনমথ রাজে ॥
আধ শিরে শোহে, ময়ূর মুকুট ঈষৎ বামেতে হেলা।
আধ শিরে বেণী, যনু ভুজঙ্গিনী, ময়ূর সহিতে মেলা ॥
আধ গলে শোহে, গজমতি হার, আধগলে বনমালা।
আধ বরণ, কষিল কাঞ্চন, আধ চিকন কালা ॥
রাইএর কপালে, সিন্দুর তিলক, শ্যামের চন্দনবিন্দু।
সোনার কমলে, ভানুর উদয়, নব জলধরে ইন্দু ॥
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী, ছটায় ভুবন ভোলে।
কনক লতিকা, যনু জড়াওল, নবীন তমাল কোলে ॥

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ নানাবিধ সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তনে জনসাধারণকে আনন্দ সাগরে ভাসাইয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ শ্যামবাবু এবং অন্যান্য ভক্তগণের বিশেষ যত্নাগ্রহে সকলে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

চক্রবর্ত্তীর সন্দেহভঞ্জন

পরদিবস প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক ঠাকুরবাড়ীতে বসিয়া আছেন, এই সময় রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ইনি বিশেষ সম্মানের

সহিত তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। তখন তিনি ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, ভগবানে বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে কি না?"

বাবাজী। বাবা! ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতহিতে রত, সমদর্শী। তাঁহার শত্রু বা মিত্র কেহই নাই। তিনি গীতায় নিজমুখে বলিয়াছেন:—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ॥"

চক্রবর্ত্তী। কিন্তু ঐ গীতায়ই আবার ভগবান বলিয়াছেন:—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

আবার পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত, দন্তবক্র, শিশুপাল, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতিকে নিহত করিলেন। রামাবতারে রাবণকে মারিয়া বিভীষণকে রাজ্যপ্রদান, বালিকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজা করা ইত্যাদি কার্য্য যাহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, ইহাতে ত সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

বাবাজী। এই অসুর-বিনাশাদি কার্য্যে আপনি অনুগ্রহ নিগ্রহের পরিচয় কি পাইলেন?

চক্রবর্ত্তী। কেন, কাহাকেও সবংশে ধ্বংস করিলেন, আবার অতি নিষ্ঠুরভাবে কাহারও জীবন বিনাশ করিলেন। আর যে তাঁহার ভক্ত অর্থাৎ তোষামদকারী, তাহাকে রাজত্ব প্রদান করিলেন। ইহাতে তাঁহাকে কি বলা যাইতে পারে? ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদানের জন্য বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছলনা দ্বারা অত বড় দাতাশিরোমণি বলিরাজের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলেন। এমন কি, অবশেষে তাঁহাকে বন্ধন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাতালে প্রেরণ করিলেন, ইহাতেও কি ভগবান্‌কে সমদর্শী বা দয়ালু বলিতে হইবে?

বাবাজী। আমাকে যদি ইহার উত্তর দিতে বলেন, তবে আমি বলিব, যদি দয়াল বলিতে হয় তবে এক ভগবান্ ভিন্ন জগতে আর কাহাকেও বলা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহার দয়ার কালাকাল, পাত্রাপাত্র, পাপ বা অপরাধের বিচার নাই। আপনি এক একটি করিয়া ভাবিয়া দেখুন। পুতনা বালঘাতিনী রাক্ষসী—হিংসাপরায়ণা ক্রূরা ; সে নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া কৃষ্ণের প্রাণবিনাশের জন্য গমন করিয়াছিল। পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ তাহার অশেষ জন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মহা মহা পাপরাশির সহিত সেই ক্রূরবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাকে নিজ বাৎসল্যময়ী ধাত্রীদিগের যোগ্য স্থান প্রদান করিলেন। দন্তবক্র, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি অসুরগণ গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং বৈষ্ণবদিগের দ্রোহাচরণ করিয়া এতই মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছিল যে, অনন্ত জীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত ; পরম দয়াল ভগবান্ নিজহস্তে তাহাদিগকে নিহত করিয়া সালোক্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন। ভাবিয়া দেখুন, বহুকাল তপস্যা করিয়া যে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া কঠিন, আজ কি না অসুরগণ ভগবানের সহিত দ্রোহাচরণ করিয়া অনায়াসে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত হইল। ভাবিয়া দেখিলে ভগবান্ বরং পাপী ও পতিত-দিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহই করিয়া থাকেন। রাবণ কুম্ভকর্ণ ভগবানের সহিত তিন জন্ম শত্রুতা আচরণ করিয়া ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তির প্রার্থনা করায় ভগবান্ তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন। বলিরাজ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভগবানের পাদপদ্ম ভুলিয়া গিয়াছিল। কৃপাময় ভগবান্ তাহার যাবতীয় বন্ধন মোচন করিয়া পাতালে স্থান দিলেন। দেখুন, বলির প্রতি এতদূর অনুগ্রহ যে নিজে তাহার দ্বারে দ্বারী হইয়া চিরকালের জন্য তাহার প্রেমে আবদ্ধ রহিলেন।

চক্রবর্ত্তী। তাহা হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে ভক্তবৎসল বলেন কেন?

বাবাজী। এইটিই ত ভগবানের ভগবত্তা। অনুগ্রহ পতিত পাষণ্ডের প্রতি; কিন্তু ভক্তগণ মনে করেন—ভগবান্ আমাদিগকেই কৃপা করিলেন।

চক্রবর্ত্তী। এইটি না হয় আপনি অসুর প্রভৃতির উপর দেখাইলেন; কিন্তু সাধারণ জীবের প্রতি তাঁহার বৈষম্য নাই কি?

বাবাজী। কিরূপ বৈষম্য আপনি অনুভব করিলেন প্রকাশ করিয়া বলুন।

চক্রবর্ত্তী। জীবে এবং ঈশ্বরে সম্বন্ধ কি?

বাবাজী। জীব অংশ তিনি পূর্ণ। জীব দাস তিনি প্রভু। জীব অণু, তিনি মহান্। শাস্ত্রে বলিয়াছেন:—"কেশাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীব ইতি খ্যাতঃ স চানন্তায় কল্পতে।" জীবের কোনই স্বতন্ত্র ক্ষমতা নাই। তিনি যাহা করাইবেন, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক জীব তাহাই করিতেছে।

চক্রবর্ত্তী। বেশ কথা! তাহা হইলে একজনকে দিয়াই বা কেন তিনি নানারূপ অসৎ কার্য্য করাইয়া অশেষ যন্ত্রণাদায়ক নরক ভোগ করান, আর একজন দ্বারা কেন অতি সুখময় বৈকুণ্ঠাদি নিজলোক-প্রাপক কার্য্য করাইয়া তাঁহার নিকট আবদ্ধ হন? একজন হয় ত দয়া, ক্ষমা ও শান্তি-পরিপূর্ণহৃদয়, আর একজন হয় ত ঘোর অত্যাচারী, পরপীড়ক পাষণ্ড। একজন হয় ত পরদুঃখে দুঃখী, দাতার শিরোমণি-অপর একজন হয় ত পরশ্রীকাতর, পরবিত্তাপহারক। যদি তিনিই জীবের চালক হন, তবে এইরূপ বৈষম্যদোষ ঘটে কেন?

বাবাজী। জীব প্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া যখন অসৎপথে অগ্রসর হইতে চায়, ভগবান্ তখন নানারূপ বাধাবিঘ্ন দ্বারা সেই অসৎপথ হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তথাপি জীব যখন চৈতন্য লাভ না করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি

জীবের ক্ষমতা বুঝাইবার জন্য একটু শিথিলভাবে আড়ালে থাকেন, তাই জীব নানরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

চক্রবর্ত্তী। জীবের এইরূপ প্রবৃত্তি জন্মে কেন?

বাবাজী। ইহার মূল কারণ অহংকার। প্রকৃতিই যাবতীয় কার্য্য করেন; কিন্তু জীব মিথ্যা অহংকার করিয়া কষ্ট পায়। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

এই অহংকারের বলেই জীব যত অনর্থ ঘটায়। মনে করুন, কোনও এক রাজা একটি কর্ম্মচারীকে শাস্তিবিধানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন! কিন্তু সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই নিজেকে কর্ত্তা মনে করতঃ যাহা ইচ্ছা করিতেছে। তখন তাহার উপরে যে কেহ আছে, এই কথাই তাহার মনে নাই। রাজা যখন কর্ম্মচারীর এইরূপ ব্যবহার অবগত হইবেন, তখন তাহাকে গুরুতর শাস্তিভোগ করিতে হইবে না কি?

চক্রবর্ত্তী। জীবের এই যে কর্ত্তৃত্ব ইহা ত ভগবদ্দত্ত, তবে জীবের দোষ কি? তিনি যদি জীবকে এরূপ ক্ষমতা না দিতেন, তবে ত জীব আর এইরূপ অহংকার করিত না।

বাবাজী। না, এই কর্ত্তৃত্ব ভগবদ্দত্ত নহে। গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

চক্রবর্ত্তী। বেশ কথা! এই যে স্বভাব, ইহাও ত জীবের নিজকৃত নহে; কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির বা দুষ্কৃতির ফলেই ত ভগবান্ আমাদিগের এইরূপ প্রবৃত্তি বা স্বভাব প্রদান করিয়াছেন।

বাবাজী। এইটিও ত ভগবদ্দত্ত হইতে পারে না—এটি অজ্ঞানকৃত। গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতিং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"

চক্রবর্ত্তী। জীবের এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কেনই বা জীব এইরূপ ভগবদ্-বহির্ম্মুখ হইয়া থাকে?

বাবাজী। ভগবদ্-বিস্মৃতিই এই বহির্ম্মুখতার কারণ। শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

এই বহির্ম্মুখতা যে কতদিন হইয়াছে, তাহা কেহই নির্দ্দিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। তাই বলিলেন, অনাদি কাল হইতেই জীব এইরূপ ভোগ করিয়া আসিতেছে। জ্ঞান-অজ্ঞান, সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, সকলই প্রভুনির্ম্মিত; তবে অজ্ঞান সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য জীবকে মোহিত করিয়া কষ্ট দেওয়া নহে; কেবল জ্ঞানের সুখময়ত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় ভগবান্ অজ্ঞানের সৃজন করিয়াছেন। ভাল-মন্দ যাবতীয় বস্তু জগতে বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেকের জন্য নহে; সকল বস্তুরই অধিকারি-ভেদ রহিয়াছে। ইহাতে ভগবানের উপর দোষারোপ করা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। এ বিষয়ে একটি গল্প মনে পড়িল—একদিন একটি ভদ্রলোক কোন ডাক্তারখানায় গিয়া দেখিলেন যে, ডাক্তার বাবুর ঔষধের আলমারীর মধ্যে একটি

শিশির উপর 'বিষ' লেখা রহিয়াছে। তিনি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শিশিতে কি আছে?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "উহাতে ভয়ানক উগ্রতেজ বিষ রহিয়াছে। আপনি উহাতে হাত দিবেন না; কারণ চোখে বা কোনও স্থানে উহা লাগিলে বড়ই অনিষ্ট হইবে!" তিনি ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনারা চিকিৎসক; পরের উপকার করিবেন, তবে অনিষ্টকারী বস্তু কাছে রাখিবার প্রয়োজন কি?" ডাক্তার বাবু বলিলেন, "বাবা! সময়ে ঐ বিষই অমৃতে পরিণত হয়।" ভদ্রলোকটি ডাক্তার বাবুর কথায় অবিশ্বাস করতঃ 'ডাক্তার পরপীড়ক মূর্খ" মনে করিয়া বাড়ী আসিলেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস আবার তিনি ডাক্তারখানায় গিয়াছেন, এই সময় কোনও রোগীর বাড়ী হইতে ডাক্তারবাবুর ডাক আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি ঐ বিষের শিশিটি সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং ঐ ভদ্রলোকটিকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকেই বলিলেন, "দেখুন মহাশয়! আপনি এই শিশিটি হইতে তিন ফোঁটা ঔষধ কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিন।" ভদ্রলোকটি তখন মনে মনে ভাবিতেছেন, "কি আশ্চর্য্য! রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য ডাক্তার আনা হইল; কিন্তু এ ডাক্তার রোগীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছে! আমি কেন পাপের ভাগী হইতে যাইব? যাহা হউক একবার রোগীর অবস্থাটা দেখা যাক্।" ভাবিয়া রোগীর নিকট গিয়া দেখেন যে রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত—কথা বলিবার সাধ্য নাই, হাতের নাড়ীও বসিয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু তাঁহাকে পুনঃপুনঃ সেই বিষ দিবার জন্য অনুরোধ করিলে অগত্যা ডাক্তার বাবুর অনুরোধে তিনি সেই বিষের শিশি হইতে তিন ফোঁটা একটু জলের সহিত রোগীটিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তিন চারি

মিনিটের মধ্যেই রোগীটি বেশ কথা কহিতে লাগিল ; নাড়ীর অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইল। মোট কথা—রোগীর ভাবগতিক দেখিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল যে আর প্রাণের ভয় নাই। ডাক্তার বাবু ঐ বিষের শিশি হইতেই আরও দুই দাগ ঔষধ দিয়া আসিলেন। ভদ্রলোকটি দেখিয়া অবাক্! তখন ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কেমন মহাশয়, বিষ যে অবস্থানুসারে অমৃত হয়, এখন বুঝিলেন ?" ভদ্রলোকটি বলিল, "বুঝিলাম কেন, প্রত্যক্ষ অনুভবই করিলাম !" তবেই ভাবিয়া দেখুন, মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমস্তই মঙ্গল-প্রদ ; কিন্তু অধিকার-ভেদে বা অবস্থা-অনুসারে যেটুকু বৈপরীত্য দেখা যায়, সেইটি কেবল ব্যবস্থার দোষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চক্রবর্ত্তী। এই ব্যবস্থাপক কে ?

বাবাজী। শ্রীগুরুদেব।

চক্রবর্ত্তী। আবার সন্দেহ জন্মিল। আচ্ছা গুরু যদি মূর্খ বা অনুপযুক্ত হন, তবে শিষ্যের উপায় কি ?

বাবাজী। গুরু মূর্খ বা অনুপযুক্ত এই কথাটাই অসঙ্গত ; কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
নমর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

তবেই দেখুন, গুরুকে মূর্খ বলাও যা, ভগবান্‌কে মূর্খ বলাও তাই।

চক্রবর্ত্তী। আমি ব্যবহারগত যাহা সাক্ষাৎ দেখিতেছি তাহা বলিতে দোষ কি ? গুরু আসিয়াই বার্ষিক লইয়া ব্যস্ত। শিষ্যের ধর্ম্ম বা পরমার্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য নাই এবং লক্ষ্য রাখিবার বা করিবার ক্ষমতাও নাই ; এস্থানে কি বলা যাইবে ?

বাবাজী। গুরু বস্তুটি শব্দগত নহে—বিশ্বাসগত। শিষ্য যদি

গুরুতে ভগবদ্‌বুদ্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গুরু হইতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। একলব্য বিশ্বাসের বলে মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রোণ হইতে যাবতীয় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। বলুন দেখি! সেই মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রোণের মূর্ত্তিতে কোনও শক্তি ছিল কি? সেইরূপ গুরুদেহে যদি কোনও গুণ নাও থাকে; কিন্তু যদি আমার সেই গুরুতে ভগবদবুদ্ধি থাকে তবে নিশ্চয়ই আমি অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিব। এ বিষয়ে একটি গল্প মনে পড়িল—কাশীধামে দশাশ্বমেধঘাটে একটি ব্রাহ্মণ নিত্য প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া থাকেন। একটি বেশ্যাও গঙ্গার অপর পার হইতে পার হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঐ ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে আসে। ব্রাহ্মণটি বড়ই শান্তপ্রকৃতি। বেশ্যাটি রোজই স্নান করিয়া উঠিবার সময় বলে, "ঠাকুর! আমাকে একটা মন্ত্র দিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ কোনই কথা বলেন না; কিন্তু মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপে প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল; বেশ্যাটির কিন্তু ঐ এক বুলি। একদিন ব্রাহ্মণ ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুই কি বলছিস্?"

বেশ্যা। ঠাকুর! আমাকে একটা মন্ত্র দাও না!

ব্রাহ্মণ। তুই ত মহা পাপীয়সী, তুই মন্ত্র নিয়ে কি করবি?

বেশ্যা। ঠাকুর! মন্ত্র না নিলে নাকি ভবপারে যেতে পারা যায় না। তাই বলি ঠাকুর! আমায় একটা মন্ত্র দাও।

ব্রাহ্মণ চুপি চুপি বলিলেন, "তুই যদি ভবপারে যাবি তবে নরক ভোগ করবে কে?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কি আর মন্ত্র দেব! যা, তুই ঢেঁকি ভজবি।"

শুনিবামাত্র বেশ্যা আনন্দে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে প্রণাম বন্দনা করিয়া গৃহে গমন করিল। সেইদিন হইতে ব্রাহ্মণ সেই ঘাট পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর ঘাটে স্নান করিতে লাগিলেন। বেশ্যা কিন্তু একাগ্রমনে সর্ব্বদার

তরে 'ঢেঁকি ঢেঁকি' এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। একদিন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "গুরু কর্ণধার হইয়া ভবসাগর পার করিবেন। তবে আমি সামান্য গঙ্গা পার হইতে নৌকা অবলম্বন করি কেন?" ভাবিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণ চিন্তা করতঃ 'ঢেঁকি ঢেঁকি' জপ করিতে করিতে অনায়াসে হাঁটিয়া অপর পারে গেল। এইরূপ প্রত্যহই গমনাগমন করিতে লাগিলে ক্রমে ক্রমে লোকের দৃষ্টি পড়ায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "একটি বেশ্যা পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইয়া থাকে।" শুনিয়া ব্রাহ্মণটি মনে মনে ভাবিলেন, 'আমার নিকটে যে একটা বেশ্যা মন্ত্র চাহিতেছিল, সে কি রকম আছে একবার খোঁজ করিয়া দেখি না কেন!' এই ভাবিয়া পরদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিতে গেলেন। ক্ষণকাল পরে দেখেন, সেই বেশ্যাটি কর জপ করিতে করিতে গঙ্গাপার হইয়া আসিতেছেন। ঘাটে আসিয়া ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র গলায় কাপড় দিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গঙ্গাপার হইলে কিরূপে?"

বেশ্যা বলিল, "কেন প্রভু! আপনি কর্ণধার হইয়া ভবসমুদ্র পার করিবেন, আর এ ত একটা নদী মাত্র! আপনার এতই দয়া যে, আপনার দেওয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে আমি অনায়াসে চলিয়া আসি। আপনি যে কেমন করিয়া পারে আনেন তাহা আপনিই জানেন।"

ব্রাহ্মণ একটু বিস্মিতভাবে মনে করিলেন যে, হয় ত ঐ ঢেঁকি শব্দটার কোনও গুণ থাকিবে, আচ্ছা একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাক্। তখন প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া পারে যাও আমাকে একবার দেখাও ত!"

বেশ্যা বলিল, "প্রভু! আপনিই ত আমাকে পার করিয়া দেন। আজ চলুন, একবার দাসীর বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন।" বলিয়া বেশ্যা

ঢেঁকি মন্ত্র জপ করিতে করিতে নির্ভয়ে জলের উপর হাঁটিয়া পার হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কিন্তু 'ঢেঁকি ঢেঁকি' জপ করিতে করিতে ভয়ে ভয়ে এক এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই ব্রাহ্মণ অগাধ জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। তাই বলি, গুরুর যোগ্যাযোগ্যতা বা মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধতার বিচার করিলে কোনই লাভ নাই। একমাত্র শিষ্যের বিশ্বাসের গুণে ফলাফল হইয়া থাকে।

এতক্ষণে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চোখে জল আসিল—উঠিয়া বাবাজী মহাশয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও বেলা অতিরিক্ত হওয়ায় স্নানাদি সমাপন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

—*—

সিঙ্গাপুর যাত্রা

বাঁকসাহি কাছারিতে পরমানন্দে দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। মধুপুর রাজার ম্যানেজার বাবু গোপীমোহন রায় মহাশয় তাঁহাদের সিঙ্গাপুর কাছারিতে বাবাজী মহাশয়কে লইয়া যাইবার জন্য প্রায়ই লোক পাঠাইয়া থাকেন। একদিন নিজে আসিয়া বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন, এই সময় বাঁকসাহি হইতে অনুমান দুই মাইল দূরবর্ত্তী বন্ধডিহি গ্রামনিবাসী মোক্তার বাবু রঘুনাথ মহান্তিও সগণে বাবাজী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। বাবাজী মহাশয় রঘুনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুনাথ! তোমাদের গ্রাম কি সিঙ্গাপুর যাইবার রাস্তায়?"

রঘুনাথ বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তখন ইনি বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী কল্য রাত্রে তোমার বাড়ী থাকিয়া পরদিন প্রাতে সিঙ্গাপুর

যাওয়া যাইবে।" রঘুনাথ বাবু তাহাতেই সম্মত হইলেন। গোপীবাবুও পরমানন্দিতচিত্তে বাবাজী মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করিলেন।

রাত্র প্রভাত হইলে বাবাজী মহাশয় বাঁকসাহিনিবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই একবাক্যে বলিতেছে, "মহাপ্রভু! আউ কিচ্ছি দিন এঠি রহি করি আম্ভ মানঙ্কর হৃদয় শুদ্ধ করি তেবে জীবা হেবে।" বাবাজী মহাশয় সকলকে মধুর বাক্যে প্রবোধ দিয়া অপরাহ্ন পাঁচটার সময় বন্ধডিহি রওনা হইলেন। এদিকে বাঁকসাহি কাছারির ছামুকরণ (তহশীলদার বিশেষ) ক্ষেত্রবাসী মহান্তি মনে মনে সংকল্প করিয়াছেন যে, "বাবাজী মহাশয় আমাকে নিজে ডাকিয়া যেদিন অধরামৃত দিবেন বা শ্রীচরণ সেবা করিতে বলিবেন, সেইদিন জানিব যে আমার প্রতি কৃপা হইল; তাহার পূর্ব্বে আমি কখনও যাচিয়া অধরামৃত পাইব না বা চরণ সেবা করিব না।" একথা আর কাহাকেও না বলিয়া মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। বন্ধডিহি যাইবার সময় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ক্ষেত্রবাসী! আমাদের সঙ্গে চল।" ক্ষেত্রবাসী "যে আজ্ঞা" বলিয়া সঙ্গে চলিল। বন্ধডিহি রঘুনাথ মোক্তারের বাড়ীতে গিয়া রাত্রে খুব সংকীর্ত্তন হইল। তাঁহার বাড়ীর সকলে এবং গ্রামবাসী অনেক স্ত্রীপুরুষ সেদিন বাবাজী মহাশয়ের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিল। রাত্র অনুমান এগারটার সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া মহাপ্রসাদ পাইবার পর বাবাজী মহাশয় শ্যামসুন্দরবাবুকে বলিলেন, "দেখ শ্যামসুন্দর! তোমরা কেহই এ পাতায় না বসিয়া ক্ষেত্রবাসীকে ডাকিয়া দাও, সে বসুক।" বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রবাসী হৃষ্টচিত্তে সেই পাতায় বসিয়া অধরামৃত পাইল। ক্ষণকাল পরে বাবাজী

মহাশয় উহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ক্ষেত্রবাসী! তুমি নাকি বেশ পা টিপিতে পার, এস ত!" ক্ষেত্রবাসীর একদিনেই দুই বাসনা পূর্ণ হওয়ায় সে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল।

পরদিবস প্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সগণে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিলেন। বন্ধডিহি হইতে অনুমান এক মাইল ব্যবধান চাঁদপুর গ্রামে পঁহুছিয়া দেখেন যে, পথিমধ্যে একটি খোলা জায়গায় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা বহুসংখ্যক লোক ইঁহাকে দর্শন করিবার মানসে একত্র সমবেত হইয়াছে। সকলেরই দর্শনোৎকণ্ঠা প্রবল বুঝিতে পারিয়া এমন এক ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ করিলেন যে, একসময়ে বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই সমভাবে দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইল। গ্রামবাসী লোকের বিশেষ আগ্রহে সে বেলা সেইস্থানে অবস্থান করিলেন।

এদিকে মধুপুর রাজার ম্যানেজার বাবু গোপীমোহন রায় তাঁহার কাছারিবাড়ী হইতে অনুমান একক্রোশ পথ অপূর্ব্বভাবে সুসজ্জিত করিয়াছেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি সারি কদলীবৃক্ষ ও নানা বর্ণের পতাকা এবং মালাকারে গ্রথিত আম্রপত্র ও পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। ম্যানেজারবাবু অতি উৎসাহভরে রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানারূপ আলোর বন্দোবস্ত করিতেছেন, আর মনে চিন্তা করিতেছেন যে, বাবাজী মহাশয় যদি রাত্রে শুভাগমন করেন, তবে বড়ই আনন্দ হয়। ইত্যাদি নানারূপ কল্পনা করিতে করিতে বাবাজী মহাশয়কে আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। চাঁদপুর যাওয়ামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন "গোপী! তুমি যাহা মনে ভাবিয়াছ, তাহাই হইবে। আমি সন্ধ্যার পরেই কাছারিবাড়ী পেঁাছিব।" শুনিয়া গোপী বাবু অতিশয় বিস্মিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় যথাসময়ে স্নানাদি করিয়া

সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চারিদিক লোকে লোকারণ্য! সংকীর্ত্তনের রোলে দশদিক মুখরিত। বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছে। এইরূপ পরমানন্দময় সঙ্গ ছাড়িয়া কিরূপে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এই ভাবিয়া শ্যামসুন্দর বাবু হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সেই আর্ত্তি—সেই কান্না শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়। শ্যামসুন্দর ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়া গড়াগড়ি দিতেছে দেখিয়া বাবাজী মহাশয় হঠাৎ তাহার পিঠের উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছেন, এই সময় বহুলোক মন্ত্র গ্রহণের জন্য অতিশয় ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করায় ইনি ভাগ্যবান্ শ্যামসুন্দর বাবুর পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়াই বহুলোককে মন্ত্র প্রদান করিলেন। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য নানারূপ অনুরোধ করায় সংকীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন।

বেলা অনুমান চারিটার সময় চাঁদপুর হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে সিঙ্গাপুর কাছারি অভিমুখে রওনা হইলেন। শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি কয়েকজন বাবাজী মহাশয়ের অপ্রাকৃত আনন্দময় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও বাবাজী মহাশয় নানারূপ মিষ্ট বাক্যে উঁহাদিগকে সান্ত্বনা করতঃ সেই স্থান হইতেই গৃহে পাঠাইয়া সন্ধ্যার পর সিঙ্গাপুর কাছারিতে গিয়া পঁহুছিলেন। পরম অনুরাগী গোপীবাবুর আদর অভ্যর্থনায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করিতে করিতে কাছারি-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল তথায় উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন হইল। গোপীবাবুর যত্ন-আগ্রহে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক পণ্ডিতমণ্ডলী ও বাবুভায়াগণ সংকীর্ত্তন শুনিবার

জন্য আসিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে ও কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপনান্তে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন! গ্রামখানির দৃশ্য অতি মনোরম। পরমানন্দে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়া বেলা অনুমান এগারটার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় গোপী বাবু অনেকগুলি সুমিষ্ট ডাব ঠাকুরের ভোগ দিয়া বাবাজী মহাশয় এবং ইঁহার সঙ্গিগণকে দিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় একটি ডাবের জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ "শ্যামসুন্দর খাও" বলিয়া মাটিতে ঢালিয়া দিলেন। তখন ললিতাদাসী বলিলেন, "আজ্ঞে শ্যামসুন্দর ত এখানে নাই!" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ছেলেটা বড়ই ভাল, এই সঙ্গ ছাড়া হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। এখন পর্য্যন্ত শুইয়া আছে। প্রভুর অধরামৃত ডাবের জল খাইয়া একটু সুস্থ হইবে।" এদিকে শ্যাম-সুন্দর বাবু পূর্ব্বে হইতেই বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত লইবার মানসে একজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি উপস্থিত ঘটনা সকল স্বচক্ষে দেখিয়া অবাক্! ক্রমে বাবাজী মহাশয় মহাপ্রসাদাদি সেবা করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

শ্যামসুন্দর বাবুর প্রেরিত লোকটি বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত ও চর্ব্বিত তাম্বুল প্রভৃতি লইয়া যথাসময়ে বাঁকসাহি কাছারিতে শ্যামসুন্দর বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। এদিকেশ্যামসুন্দরবাবু গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া ছিলেন. হঠাৎ তাঁহার মুখ অতি সুমিষ্ট ডাবের জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি সেই জল গলাধঃকরণ করিয়া ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি ঘরের মধ্যে শুইয়া আছি। আমার মুখে এরূপ ডাবের

জল কোথা হইতে আসিল? তবে কি এইটি স্বপ্ন? তাহাই বা কিরূপে বলি? কারণ আমি ত নিদ্রিত ছিলাম না। তবে কি এইটি শ্রীগুরুদেবের কৃপা? মনে মনে এইরূপ নানা কথা আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় প্রেরিত লোকটি আসিয়া যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। শ্যামসুন্দর বাবু শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপার কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় গোপী বাবুর বিশেষ আগ্রহে সিঙ্গাপুর কাছারিতে কীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিন অতিবাহিত করিলেন।

ধনেশ্বর গমন

একদিন বাবাজী মহাশয় সিঙ্গাপুর কাছারিতে বসিয়া গোপী বাবুকে বলিলেন, "দেখ গোপী! এখান হইতে ধনেশ্বর কতদূর?"

গোপী। আজ্ঞে অনুমান দশ মাইল হইবে।

বাবাজী। একবার ধনেশ্বর যাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।

গোপী। আজ্ঞে আর কয়েকদিন এখানে থাকা হউক। আমি লোক পাঠাইয়া ধনেশ্বরবাসীদিগকে সংবাদ দিই। তাহারা আসিয়া লইয়া যাইবে।

বাবাজী। সংবাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। নিতাইএর ইচ্ছায় আজই বিকাল বেলা সেখানে যাওয়া যাউক।

গোপী বাবু অন্ততঃ আর দুই চারিদিন সেখানে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবাজী মহাশয় মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া অপরাহ্ন বেলা তিনটার সময় নাম করিতে করিতে ধনেশ্বর রওনা হইলেন। এই গ্রামে করণ কায়স্থের বাসই অধিক। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একটি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করতঃ তাঁহার সেবার জন্য জমা-জমির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভুর সেবাইত শ্রীগোবিন্দ

বল্লভ দাস অধিকারী মহাশয় মহাপ্রভুর বাড়ীতেই সগণে বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোকের মধ্যে চতুর্ভুজ দাস প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বড়লোক বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে পুরী ঝাঁজপীটা মঠস্থ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেবের কিঞ্চিৎ জমি ইঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। ঝাঁজপীটা মঠের অধিকারী কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের অমনোযোগ বা অনবধানতা বশতঃ বহুদিন হইতে উক্ত জমির খাজনা আদি আদায় হয় না। বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইবামাত্র সমস্ত প্রজাগণ আপনা আপনি খাজনা দিতে লাগিল। এমন কি চতুর্ভুজ বাবুর চেষ্টায় প্রজাগণ নিজ নিজ দেয় খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধাংশ খাজনা এবং অর্দ্ধাংশ ধান্য দিতে স্বীকৃত হইল। একদিন গোবিন্দবল্লভ অধিকারী, বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন "আজ্ঞে ঝাঁজপীটা মঠের অধিকারী কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় এই স্থানেই দেহ রাখিয়াছেন।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তিনি এইস্থানেই দেহ রাখিয়াছেন? তাঁহার কোন সৎকারাদি করা হইয়াছে কি? যে স্থানে তিনি দেহ রাখিয়াছেন, সেই স্থানটি আমাকে দেখাইতে পার কি?"

গোবিন্দবল্লভ অধিকারী মহাশয় 'আজ্ঞে চলুন' বলিয়া ইঁহাকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অধিকারী মহাশয়ের অস্থি লইয়া মহাপ্রভুর বাটীস্থ পুষ্করিণীর ঈশান কোণে একটি স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক সমাধি দিলেন এবং সঙ্গিগণের মধ্যে একজনকে বলিলেন, "যতদিন তোমরা এইস্থানে থাকিবে, ততদিন রীতিমত ভাবে এই সমাধির সেবা ও মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ সমর্পণ করিবে।" তিনিও সেইদিন হইতে বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

একদিন মধুপুর রাজার ম্যানেজার গোপী বাবু এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক মহাপ্রভুর বাড়ীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ মাঠে বসিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট নানারূপ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয়ও হাসিমুখে অতি জটিল জটিল প্রশ্নের উত্তর সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছিলেন। একজন ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "আজ্ঞে নিত্য শব্দের অর্থ কি?"

বাবাজী। 'ত্রিকালসত্যত্বং নিত্যত্বম্' অর্থাৎ যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে, তাহাকেই নিত্য বলা যায়।

ভক্ত। তবে ব্রজলীলা বা নবদ্বীপলীলা কিরূপে নিত্য হয়? কারণ দ্বাপরযুগে ব্রজলীলা যেরূপ সর্ব্বনয়নগোচর হইয়াছিল, এখন ত সেরূপ দেখা যায় না! আবার কলিযুগে এই চারিশত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সপরিকরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে লীলা করিয়াছেন, আজ ত সেই লীলা সর্ব্ব-নয়নগোচর হইতেছে না। তবে লীলা যে নিত্য এ কথা কিরূপে বলি?

বাবাজী। এই নিত্যত্ব সম্বন্ধে আচার্য্যগণ বহুপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন ঃ—

"প্রকট অপ্রকট লীলার দুই ত বিধান।
প্রকট লীলায় করেন প্রভু নিজে নৃত্যগান॥
অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্।
কীর্ত্তনবিহারী রূপে সদা বর্ত্তমান॥"

অন্যত্র—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না বলিয়াই যে সে বস্তু নাই, এ কথা হইতে পারে না! মনে কর, দিবসে আমরা তারা দেখিতে পাই না; তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে আকাশে তারা নাই?

ভক্ত। প্রত্যক্ষ না হইলে আছে বলিয়াই বা বিশ্বাস করি কিরূপে ?

বাবাজী। জগতের যাবতীয় বস্তুই যে প্রত্যক্ষগম্য তাহা নহে। কতকগুলি প্রত্যক্ষগম্য এবং কতকগুলি অনুমেয়। এই অনুমান আবার অনেক প্রকারে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি হয় লক্ষণাদ্বারা, কতকগুলি বা আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস দ্বারা। পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ সময় যখন আকাশে তারকামণ্ডলী দৃষ্ট হয়, তখন নিশ্চয়ই অনুমান করিতে হইবে যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ নিত্য বিরাজমান। এইরূপ ভাবে প্রেমের বিকাশ বা জীব-উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য দেখিলেই মনে করিতে হইবে যে সেইস্থানে নিতাই-গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। যখন সর্ব্বনয়নগোচর হইতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হইয়া থাকেন। আবার যখন লুক্কায়িত হইতে চান, তখন কে তাহার প্রতিরোধ করিবে ? মোট কথা—ভগবৎলীলা কূর্ম্মাঙ্গবৎ অর্থাৎ কূর্ম্মের অঙ্গসকল বাহিরে প্রকাশিত হইলে সর্ব্বনয়নগোচর হইয়া থাকে, আবার যখন ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্দৃষ্টির গোচর থাকে না, ভগবৎ-স্বরূপ ঠিক সেইরূপ। ইচ্ছাময় ইচ্ছা করিয়া প্রকট হইলে সর্ব্বনয়নগোচর হইয়া থাকেন ; আবার যখন অপ্রকট হন তখন কেবলানুভব স্বরূপ।

ভক্ত। আচ্ছা! এ কথা না হয় স্বীকার করিলাম ; কিন্তু গোস্বামিগণ বলিলেন, শ্রীরাধাগোবিন্দ উভয়ে মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনের সখীমঞ্জরীগণই নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-পরিকরগণ রূপ ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃন্দাবনে এবং নবদ্বীপে অভিন্ন রূপ। তাহাই যদি হইল, তবে বৃন্দাবনের নিত্যত্ব কোথায় রহিল ? অর্থাৎ দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হইলে দুগ্ধ বলিয়া আর একটা পৃথক্ বস্তু থাকে না, সেইরূপ বৃন্দাবনলীলাই যখন নবদ্বীপলীলা রূপে পরিণত হইল, তখন বৃন্দাবনলীলা বলিয়া পৃথক্ বস্তু ত আর থাকিতে পারে না!

মোট কথা—যখন বৃন্দাবনলীলার সদ্‌ভাব, তখন নবদ্বীপলীলার অভাব ; আবার যখন নবদ্বীপলীলার সদ্‌ভাব, তখন বৃন্দাবনলীলার অভাব ঘটিয়া থাকে। তবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা শিক্ষা দিলেন কিরূপে ?

বাবাজী। বাবা ! তুমি যে কথা বলিলে, প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে। ভগবৎলীলা সম্বন্ধীয় কথা অন্যরূপ। ভগবদিচ্ছায় গোলোক, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা এবং নবদ্বীপলীলা সমকালীন সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। যদি বল কিরূপে ? এ কথার একমাত্র উত্তর—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ; তাই গোস্বামিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গোলোকলীলাও নিত্য, বৃন্দাবনলীলাও নিত্য এবং দ্বারকা, মথুরা ও নবদ্বীপলীলাও নিত্য। ইহার একমাত্র সমাধান—ভগবানের ইচ্ছা বা যোগমায়ার প্রভাব।

বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয়ের চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিবনেত্র ও হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ। দেখিয়া সঙ্গিগণ বিস্মিত ! দেহখানি এরূপ দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছে যে, বোধ হইতেছে যেন একটি লৌহদণ্ড পড়িয়া আছে। এমন কি একখানি চরণ ধরিয়া তুলিলে সর্ব্বশরীর উঠিয়া আসে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে শ্বাস বহিতেছে বলিয়া বুঝা যায়। সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥' নাম করিতে লাগিলেন। আগন্তুক ভক্তগণ বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে পরমানন্দিত ও বিস্মিত হইলেন।

এইরূপে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সঙ্গিগণের বিশেষ চেষ্টা ও বহু সন্তর্পণে বাবাজী মহাশয় সুস্থতালাভ করিলেন। এইরূপ নামানন্দে ধনেশ্বর গ্রামে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। ক্রমে একদিন কোড়াই,

তুলসী দলা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিবার জন্য বাবাজী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। যেদিন যে গ্রামে গমন করিতেছেন, সেই গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া যাইতেছে।

একদিন অপরাহ্নে বাবাজী মহাশয় চতুর্ভুজ বাবুর বাড়ী বসিয়া নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনা করিতেছেন; উপস্থিত লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন—সকলেই ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিয়াছে, ইনিও হাসিমুখে—কলিযুগে একমাত্র নামসংকীর্ত্তন হইতেই যে সর্ব্বানর্থনাশ, সর্ব্বশুভোদয় এবং ভগবৎপ্রেম পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া থাকে এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন। জনৈক ভক্ত বলিলেন, "আজ্ঞে সংকীর্ত্তন ত অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু প্রেম কাহাকে বলে তাহা ত আজ পর্য্যন্ত জানিলাম না। এমন কি, শোক তাপ ব্যতিরেকে একদিন চোখে এক ফোঁটা জলও আসিল না।"

বাবাজী। বাবা! নামে প্রেম ত নিহিতই রহিয়াছে; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ না থাকার দরুণ প্রকাশমান বস্তুরও অনুভব হয় না। যেমন নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেও ক্ষুধা না থাকার দরুণ সে সমস্ত বস্তুতে আগ্রহ হয় না বরং উপেক্ষাই হইয়া থাকে, এও ঠিক সেইরূপ। প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জন্মাও, প্রেম বস্তুই যে আমাদের প্রয়োজনীয়, প্রেম না থাকিলে যে আমরা এক মুহূর্ত্তও এ সংসারে থাকিতে পারি না, প্রেমই যে আমাদের ইহ এবং পর জগতের একমাত্র অবলম্বন, এই কথা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিয়া আগ্রহ কর, অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে।

ভক্ত। আজ্ঞে হরে কৃষ্ণ নামে কি প্রেমের উদয় হয় না?

বাবাজী। কেন বাবা! মহাপ্রভু ত এমন কোনও কথা বলেন নাই যে অমুক নামে প্রেম হইবে, অমুক নামে হইবে না। তিনি

বলিয়াছেন—“খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।” এ ত প্রত্যক্ষ ফল। বেশ ত! তোমরা এস্থানে যাহারা উপস্থিত আছ, সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥’ এই নাম কীর্ত্তন কর। এখনই বুঝিতে পারিবে।

বলিবামাত্রই সকলে সমস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং ইনি সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন। আহা মরি কি অপার করুণা! অপরূপ দৃশ্য! অনুমান পাঁচ সাত মিনিট যাইতে না যাইতেই সকলের চোখে জল আসিল—সকলেরই কণ্ঠ গদ্‌গদ; এক একবার প্রেমে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। ক্রমে কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারগণ এককালে সকলের দেহ অধিকার করিল। আবালবৃদ্ধযুবা সকলেই প্রেমে বিভোর—সকলেরই চোখে জল, মুখে নাম, প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা-মিশ্রিত হা হুতাশ। প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। কাহারই খেয়াল নাই। পূর্ব্বোক্ত ভক্তটি প্রেমে অধীর হইয়া একেবারে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানে সুস্থ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত হইলে নাম করিতে করিতে মহাপ্রভুর বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যা-আরতিকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আরতিকীর্ত্তন ত রোজই হইয়া থাকে; কিন্তু আজকার ভাব যেন অন্যরূপ। আজ যেন সকলের হৃদয় হইতেই আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে। রাত্র প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করিয়া যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে বিশ্রাম করিলেন।

—০—

সংকীর্ত্তন মহারাস

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে রামানন্দ দাস নামক একমূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া ধনেশ্বরে বাস করিতেছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বাবাজীটি একটু অপ্রকৃতিস্থ। কখন হাসি, কখন কান্না, কখন নৃত্য, আবার কখনও বা একেবারে নীরবভাবে অবস্থান করিতেন। একদিন অপরাহ্নে একজন ভক্ত বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে এই রামানন্দ বাবাজী ভিক্ষা করিয়া আমাদের গোচর মাঠে অশ্বত্থ গাছতলায় মহোৎসব করিয়াছিলেন। সেদিন খুব আনন্দ হইয়াছিল।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "চল যাই সকলে সেই স্থানটি দেখিয়া আসি!" বলিয়া নাম করিতে করিতে সকলের সঙ্গে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটি অতি মনোরম, শ্মশানঘাটের নিকটবর্ত্তী। চারিদিক খোলা, একটি মাত্র প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ রহিয়াছে। অশ্বত্থতলায় যাইয়াই বাবাজী মহাশয় সকলকে বলিলেন, "দেখ, সকলেই মণ্ডলীবন্ধনে হাত ধরাধরি করিয়া নাম করিতে করিতে নৃত্য কর। এই স্থানটি বড়ই সুন্দর; দেখিবামাত্রই রাসস্থলীয় উদ্দীপনা হয়। অতএব আজ সংকীর্ত্তন মহারাস করা যাক্। বলিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন ঃ—

নাচত গোরা নটরায়।

পারিষদগণ যত, গোপিকা-মণ্ডলী তত,
চৌদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়॥

ভকত মণ্ডলী মাঝে নাচে গোরা নটরাজে,
ভাবে বিবশ ভেল অঙ্গ।

হরি হরি হরি বলি ঘন দেই করতালি
বাঢ়ল প্রেম তরঙ্গ ॥
অরুণ কমল আঁখি, ভাবে ঢুলু ঢুলু দেখি,
মুখ জিনি শশী ষোলকলা।
চৌদিকে ভকতগণ, নাচতহি অগণন,
যনু শোহে চাঁদিক মালা ॥
(দাঁড়ায়) চরণে চরণ থুঞা, ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া,
যেন ব্রজ নব যুবরাজ!
বরজ রমণীগণ, যৈছন নিমগন,
তৈছন ভকত সমাজ ॥
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ পরম আনন্দ-কন্দ
বামে গদাধর রাধারূপ।
অগ্রে দেব দেবাদ্বৈত, দক্ষিণেতে ছত্রহস্ত,
শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্তভূপ ॥
নরহরি রামানন্দ, মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ,
বাসুদেব ঘোষ বক্রেশ্বর।
হরিদাস শিবানন্দ, নাচে রায় ভবানন্দ,
গাওত স্বরূপ দামোদর ॥
শ্রীশচী নন্দন, ভুবন আনন্দন,
করু কত সুখন বিলাস।
কীর্ত্তন রাসকেলি, কলারসে নিমগন,
বদন-কমলে মৃদু হাস ॥

ভাবাবেশে এইরূপ কত যে পদাবলী গান করিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সঙ্গিগণ সকলেই প্রেমে বিভোর! বাবাজী

মহাশয় মধ্যস্থলে থাকিয়া নানারূপ পদকীর্ত্তন করিতেছেন, আর মধুর মধুর নৃত্য করিতেছেন। খোলা মাঠে আজ যেন আনন্দের বাজার বসিয়াছে! কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই—সকলেই যেন মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতেছেন। মধ্যস্থলে বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে ভাবাবেশে এরূপভাবে নৃত্য করিতেছেন যে, দেখিবামাত্রই বোধ হইতেছে যেন ইঁহার আগে আগে কে নাচিয়া যাইতেছেন; ইনিও আবেশে প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতেছেন। কে বলিবে নামরূপে প্রভু সাক্ষাৎ বর্ত্তমান নহেন? 'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়' এ কথাটি যেন আজ সকলের অনুভবগোচর হইল। নিজ নিজ ভাবানুসারে কেহ ব্রজলীলার রাসমণ্ডলী দেখিতেছেন, কেহ বা সপরিকরে শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-মহারাস দর্শন করিতেছেন। এইরূপে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, এই স্থানটি নবদ্বীপ এবং এই রজ সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণরজ। ইহার প্রতি রেণুতে প্রেম নিহিত রহিয়াছে।" এই বলিয়া একমুষ্টি রজ সকলের উপর ছড়াইয়া দিবামাত্র ভক্তগণ প্রেমাবেশে কেহ বা রজে গড়াগড়ি কেহ বা অপর কাহারও গায়ে রজ মাখাইয়া দিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহাশয় যতদিন ধনেশ্বরে ছিলেন, প্রায়ই অবকাশ পাইলে এই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় আসিয়া বসিতেন! এইরূপে ধনেশ্বরে বাইশ দিন অবস্থানপূর্ব্বক নানারূপ লীলাখেলা আচরণ করতঃ গ্রামবাসিগণকে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্থানান্তরে যাইবার মন করিলেন।

পুরুষোত্তমপুর গমন

বাবাজী মহাশয় অনেকদিন হইতেই গোপীবাবু ও গোপাল বাবুর নিকট তাঁহাদের বাসস্থান পুরুষোত্তমপুরে যাইবার জন্য প্রতিশ্রুত আছেন। আজ আবার গোপীবাবু আসিয়া বিশেষ অনুরোধ করায় যাই-বার মন করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "ধনেশ্বরবাসীদিগের বড়ই অকপট ভালবাসা; অতএব নাম করিতে করিতে গ্রামের মধ্য দিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যাইতে হইবে।" তাহাই হইল। নাম করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রত্যেক ঘরের দরজায় বালকবৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ যাহাকে দেখিতেছেন, তাহারই নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। তাহারাও প্রাণের আবেগে উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে আসিয়া ইঁহার চরণে পড়িতেছে। কান্নার রোল উঠিল। আর যেন কাহারও ঘরে থাকিতে মন হইতেছে না। এতদিন উহারা যত আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, আজ যেন তাহার শত গুণ অধিক দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল। কি দারুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য! সকলেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল দেখিয়া ইনি সকলকে সুমধুর বাক্যে আশ্বস্ত করতঃ একটু দ্রুতগতি গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত গ্রামবাসী লোক-সকল ইঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; অদৃশ্য হইলে সকলে শূন্যদেহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কেহ কেহ বা বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তমপুর গমন করিল। গোপীবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনবাবু এবং লালবিহারী রায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষ যত্নসহকারে সদলে বাবাজী মহাশয়কে তাঁহাদের গ্রামে লইয়া গিয়া সংকীর্ত্তনানন্দ ও মহোৎসব করিতে

লাগিলেন। যে দিন যে গ্রামে গমন করিতেছেন, সে দিন সে গ্রামের আপামরসাধারণ সকলেই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা। অতি বড় পাষণ্ড হইলেও যে একবার ইঁহার সংকীর্ত্তনবা শ্রীমুখের উপদেশাবলী শুনিতেছে, সেই বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। গোপালবাবুর বাড়ী এই পুরুষোত্তম-পুরে। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের গ্রামে গিয়াছেন শুনিয়া তিনি পুরী হইতে ছুটি লইয়া যেদিন বাড়ী আসিলেন, তার পরদিনই সদলে বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেদিনকার আনন্দের কথা লিখিবার বা বলিবার ভাষা নাই। পুরুষোত্তমপুরবাসী লোকসকল বলিতে লাগিল, "এই কয়দিন বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন করিতেছেন; কিন্তু যেদিনই শুনিতেছি, সেইদিনই নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে এবং উত্তরোত্তর আনন্দের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে।"

—o—

জাজপুর গমন ও ঠাকুরের অন্নভোগ

বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ পরমানন্দে কিছুদিন পুরুষোত্তমপুরে অতিবাহিত করিয়া লালুবাবুর বিশেষ অনুরোধে জাজপুরে গমন করি-লেন। জাজপুরের অন্তর্গত গোপালপুরে লালুবাবুর শ্বশুরালয়। লালু বাবুর শ্বশুর বর্ত্তমান নাই। বৃদ্ধা শাশুড়ী এবং তাঁহার ঠাকুরসেবা তত্ত্বা-বধানের জন্য তিনি সপরিবারে শ্বশুরবাড়ীতেই বাস করিয়া থাকেন। লালুবাবুর বৃদ্ধা শাশুড়ী সদলে বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলেই বৃদ্ধাকে মাতৃসম্বোধন করিয়াথাকেন। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ বৃদ্ধাকে 'মা মা' বলিয়া তাঁহার

নিকট নানারূপ আব্দার করিতেছেন—বৃদ্ধাও সানন্দে ছেলেদিগকে লইয়া বাৎসল্যরস আস্বাদন করিতেছেন। বৃদ্ধার বাড়ীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেবা রহিয়াছে এবং উক্ত সেবার জন্য একজন ব্রাহ্মণও নিযুক্ত আছেন। উঁহারা জাতিতে কায়স্থ। দেশপ্রথা অনুসারে কায়স্থের বাড়ীতে ঠাকুরের অন্নভোগ হয় না; সুতরাং আতপ চাউল, কলা প্রভৃতি ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। একদিন বাবাজী মহাশয় কয়েকটি সঙ্গী এবং লালুবাবুর বৃদ্ধা শাশুড়ীর সহিত ঠাকুরদর্শনে গিয়াছেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় ঠিক সেই সময় ভোগ লাগিয়াছে। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "মা! এত সকালে ঠাকুরের ভোগ লাগান হইল। রান্না হয় কোথায়?"

বৃদ্ধা। বাবা! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে আমাদের ঠাকুর অন্নভোগ গ্রহণ করিবেন! আমরা কায়স্থ জাতি; আমাদের ঠাকুর চিরদিন আতপ চাউল কলা ভোগ গ্রহণ করেন।

বাবাজী। হ্যাঁ মা! সে চাউল কলা কি হয়?

বৃদ্ধা। আমার দাদাশ্বশুর একটি ব্রাহ্মণকে পূজারী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণ ঐ চাউল কলা নিয়ে ঘরে রান্না করিয়া খান।

বাবাজী। কেন মা! তোমাদের কি ঠাকুরের প্রসাদ পাইতে নাই?

বৃদ্ধা। কি করিব বাবা! আমরা ত আর ঐ চাউল খাইয়া থাকিতে পারি না!

বাবাজী। আচ্ছা মা! তুমি যে বস্তু খাইতে পার না, সেই বস্তু ঠাকুরকে কিরূপে দাও?

বৃদ্ধা। কি করিব বাবা! বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে; কাজেই আমরাও সেইরূপ করি।

বাবাজী। ইহাতে তোমাদের প্রাণে কি আঘাত লাগে না? যে মুখে

মা যশোমতী নবনী দিতেও ভয় করিতেন, সেই মুখে আতপ চাউল কলা দিয়া তোমরা ঘরে নানাবিধ বস্তু রাঁধিয়া খাইতেছ ! বল দেখি, এইরূপ সেবা করিবার প্রয়োজন কি ?

বৃদ্ধা। বাবা ! পূর্ব্বপুরুষদের মুখে শুনিয়াছি যে, যদি গুরু বা পুরোহিতের নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবেই অন্নাদি ভোগ লাগিতে পারে। তাহা না হইলে শূদ্রাদির বাড়ীতে ঠাকুরের অন্ন ভোগ হইতে পারে না ; যদিও এক এক সময় প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে, কিন্তু কি করিব ! কোন উপায়ান্তর নাই ; কাজেই বাধ্য হইয়া চাউলকলা ভোগ দিতে হয়।

বাবাজী। আচ্ছা, অন্ন ভোগ দিতে কি তোমাদেরই আপত্তি, না অন্য কাহারও আপত্তি আছে ?

বৃদ্ধা। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেরাই ভোগ দিতে আপত্তি করেন। কাজেই আমরাও কোনরূপ প্রতিবাদ করি না।

শুনিয়া ললিতাদাসী বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা যতদিন এস্থানে থাকিব ততদিন রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিব। শেষে তোমাদের যেমন ইচ্ছা তেমন করিও।"

বাবাজী মহাশয়ও সানন্দচিত্তে এই কথায় সায় দিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু কিছুই বলিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই ললিতাদাসী বৃদ্ধাকে বলিলেন, "মা ! আমি রান্না করিব, আমায় সব যোগাড় করিয়া দাও।"

বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মা ! সকলই তোমাদের। ঠাকুরও তোমাদের, আমিও তোমাদের ; এ ঘরে যাহা কিছু আছে সেও তোমাদের। তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর।" তখন ললিতাদাসী মনের আনন্দে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করতঃ বেলা নয়টার সময় ঠাকুর-মন্দিরে ভোগ লাগাইয়া বাবাজী মহাশয়কে ডাকিলে বাবাজী মহাশয়

ঠাকুরের কাছে বসিয়া উঁহাকে বলিলেন, "দেখ, ঠাকুরকে বেশ প্রাণের সহিত ভোগ লাগাইবে। যেন আবার আতপ চাউল না খান।" ঠাকুরের চাউলকলা খাওয়া সকলের প্রাণে বাজিয়াছে, তাই সকলেই যাহাতে চাউল-ভোগ উঠিয়া যায় সেই জন্য চেষ্টিত। ক্রমে ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইলেন। তারপর ললিতাদাসী বিশেষ আগ্রহের সহিত লালুবাবুর বৃদ্ধা শাশুড়ীকে প্রসাদ পাওয়াইয়া বলিলেন, "মা! তোমার জীবনে কোনও দিন তোমাদের ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়াছ কি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "না মা! সেটি কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ আমার জীবন ধন্য হইল! জীবনে অনেক প্রসাদ পাইয়াছি; কিন্তু আজিকার এই প্রসাদের মত এমন সুস্বাদু প্রসাদ আর কখনও খাই নাই। তাই বলি মা! তোমরা যতদিন এখানে থাকিবে, রোজ এইরূপ ভোগ লাগাইবে।" ললিতাদাসী বলিলেন, "মা! আমরা না হয় লাগাই-লাম, কিন্তু চিরদিন যাহাতে লাগিতে পারে, তোমার সেই চেষ্টা করা উচিত!" বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুর কি আমার এমন শুভদিন দিবেন যে এই বাড়ীতে তাঁহার অন্নভোগ লাগিবে!"

এইরূপে ক্রমে তিন চারি দিন যায়, একদিন শেষ রাত্রে বৃদ্ধা শয়ন করিয়া আছেন, এই সময়ে স্বপ্ন দেখেন যে, পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরের অন্ন-ভোগ লাগাইয়াছেন এবং তিনি নিজে ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া আছেন। এই সময় ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "মা! আমি এই কয়েক দিন বড়ই সুখে আছি, দেখ যেন আর আমাকে এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না। তোমার যাহা দিয়া ইচ্ছা এবং যেরূপ ভাবেই হউক, আমাকে দুটি অন্ন খাইতে দিতেই হইবে।" বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আমার আত্মীয়স্বজনগণ যে আমাকে নিন্দা করিবে! তাহার আমি কি উপায় করিব? ঠাকুর বলিলেন, "মা! তোমার মায়া-

রাজ্যের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বড়, না আমি বড় ? তাহাদের কথায় তোমার কি হইবে ? মা ! জগতের লোকের কথায় লক্ষ্য করিতে গেলে পরমার্থ নষ্ট হইয়া যায় ; অতএব কাহারও কথা না শুনিয়া এই পুজারী ব্রাহ্মণ দ্বারা আমাকে প্রত্যহ অন্নভোগ দিবে, এই প্রতিজ্ঞা কর।" বৃদ্ধা আর কিছু বলিতে না পারিয়া বলিলেন, "বাবা ! তোমার যাহা ইচ্ছা কর আমি বৃদ্ধ হইয়াছি।" বলিতে বলিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া বৃদ্ধা বাবাজী মহাশয়ের নিকট কাতরভাবে আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে ইনি অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা তুমি পরম ভাগ্যবতী, তাহা না হইলে ঠাকুর এইরূপভাবে কাহারও নিকট খাইতে চাহেন কি ? তাই বলি, সামান্য সমাজভয়ে বা দুই চারি জন লোকের কথায় এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইও না।" বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা ! আপনি একবার পুজারী ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি যদি কোনও আপত্তি না করেন, তবে আর আমার কোনও ভয় নাই।" বাবাজী মহাশয় লালুবাবুকে বলিয়া পুজারীকে ডাকাইলেন। পুজারীটি ছেলেমানুষ। বাবাজী মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা ! তুমিই কি ঠাকুরের সেবা কর ?"

পুজারী। আজ্ঞে হ্যাঁ ! আমার পিতামহকে ইঁহারা এই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই হইতেই আমাদের হাতে এই সেবা চলিতেছে।

বাবাজী। আচ্ছা বাবা ! ঠাকুরকে চাউল কলা ভোগ দিবার সময় তোমার মনে কোনওরূপ কষ্ট হয় না কি ?

পুজারী। বাবা ! কষ্ট সুখ বিশেষ কিছু অনুভব করি না। চিরদিন যেমন নিয়মে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, আমি সেইরূপ করিতেছি। তবে এক এক দিন মনে হয়, চাউল নিয়া আমরা রান্না করিয়া খাই ; কিন্তু ঠাকুরটি যদি আমাদের নিজেদের হইত, তবে চাউল ভোগ না

দিয়া সেই চাউলের অন্ন ভোগই দিতে পারিতাম। আবার মনে বিচার করি, যাহাদের ঠাকুর, তাহাদের যেরূপ ইচ্ছা তাই করা হইতেছে, আমার উহা ভাবিবার দরকার কি?

বাবাজী। আচ্ছা, যদি ইহারা ঠাকুরের অন্নভোগ দিতে ইচ্ছা করে, তবে তোমার কিছু আপত্তি আছে কি?

পূজারী। আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিব না; কারণ আমার মা আছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যাহা বলেন, তাহা আপনাকে বলিব।

এই বলিয়া পূজারী তাহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট গমনপূর্ব্বক আমূল বৃত্তান্ত বলিলে তাঁহার মা বলিলেন, "বাবা! তোমার পিতা পিতামহ কেহই এরূপ করেন নাই, তুমি কিরূপে করিবে? অন্যান্য ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বা কিরূপভাবে চলাচল করিবে? আবার বাবাজী মহাশয় অত বড় মহাত্মা; তাঁহার কথাই বা কিরূপে লঙ্ঘন করিবে? আমি ত বাবা উভয় সংকটের মধ্যে পড়িলাম! যাহা হউক, তুমি এক কাজ কর বাবা! তুমি তোমার ভালমন্দের ভার বাবাজী মহাশয়ের উপর দাও। তিনি যাহা বলেন, তুমি তাহাই করিবে।" পূজারী ব্রাহ্মণটি মায়ের কথায় বড়ই আনন্দ পাইয়া পুনরায় বাবাজী মহাশয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক মাতা ঠাকুরাণীর সমস্ত কথা ইঁহাকে বলিলেন। ইনিও লালুবাবুকে এবং তাঁহার শাশুড়ীকে ডাকিয়া যাহাতে পূজারীর কোনওরূপ অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে বলিলেন। ইত্যবসরে কয়েকজন গ্রামবাসী লোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের এই প্রস্তাবে কেহ বা সম্মত কেহ বা অসম্মত, কেহ বা সন্তুষ্ট কেহ বা অসন্তুষ্ট হইয়া নানারূপ বাদানুবাদ করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া সকলের কথার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে এ কার্য্যটি

অতি উত্তম, তবে আমাদের দেশে চল নাই, তাই আমাদের মনে কিরূপ লাগে। তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! ব্যবহারিক জগতে ভালমন্দ যে কোনও কার্য্য করিতে গেলে প্রথমতঃ আমাদের একটু কেমন কেমন লাগেই। তারপর আবার সেই কার্য্যটি যখন সুচাররূপে চলিতে থাকে, তখন আর কোনও অসুবিধা হয় না। আপনাদের সকলের নিকট আমার এই নিবেদন, যে কোন কার্য্যই হউক একবার ভালমন্দ সৎ-অসৎ বিচার করিয়া তবে ব্যবহারিক জগতের সহিত তুলনা করিবেন। দেখিবেন দিন দিন পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন।"

এই হইতে লালবিহারী বাবুর শ্বশুরালয়ে ঠাকুরের অন্ন ভোগ হইতে লাগিল। ক্রমে যেন সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিল—ঠাকুর বলিয়া বা ঠাকুরের প্রসাদ বলিয়া যেন সকলেরই ভক্তি-বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। ইঁহারাও পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

—*—

উকীল মোহিনীবাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন

একদিন অপরাহ্নে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিলেন। বাবুটি পরম ভক্ত এবং বৈষ্ণব-সেবী। জাজপুরে কোনও বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে মোহিনীবাবুর বাড়ীতে অতিথি হইয়া থাকেন।

মোহিনীবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে আগামী কল্য অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে মোহিনীবাবুর কথায় স্বীকৃত হইলেন। কিছুক্ষণ নানাবিধ ভগবৎ-চর্চ্চার পর মোহিনীবাবু স্বগৃহে গমন করিলেন। পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া

সকলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক বেলা অনুমান নয়টার সময় সদলে নাম করিতে করিতে মোহিনীবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তন করিয়া সকলে বৈঠকখানা ঘরে উপবেশন করিলেন।

মোহিনীবাবু বহুলোক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রায় সকলেই উকীল ও মোক্তার। বাবুরা সকলেই বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াছেন। সকলের ইচ্ছা যে বাবাজী মহাশয়ের মুখে তত্ত্ব-মীমাংসা শ্রবণ করেন। একজন বলিলেন, "আজ্ঞে আমরা কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনি অনুমতি দান করেন ত বলি।"

বাবাজী। বাবা! আমার কোনই আপত্তি নাই। প্রভুদত্তা বাক্-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে তাঁহার লীলাগুণ-চরিত না বলে, তাহার মূক হওয়াই উচিত ছিল।

বাবু। আচ্ছা, ভগবান্ যখন সুখদুঃখের দাতা, তখন তিনি কাহাকেও সুখ, কাহাকেও বা দুঃখ দেন কেন? তিনি ঈশ্বর, তাঁহার নিকট সমস্ত জীবই ত সমান!

বাবজী। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।' জীব স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। ভগবান্ বিচারক। তিনি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যে যেরূপ শাস্তি বা পুরস্কার পাইতে পারে, তাহার প্রতি সেইরূপ বিধান করিয়া থাকেন। আপনারা উকীল—সহজেই বুঝিতে পারেন যে, বিচারক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কোর্টে বসিয়া থাকেন। সাক্ষীপ্রমাণাদি দ্বারা যে কার্য্যটি ন্যায্য বোধ করেন, সেই কার্য্যটি আবার আইনের সঙ্গে মিল করিয়া তবে বাদী প্রতিবাদীকে শাস্তি বা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বলুন, ইহাতে বিচারকের উপর কোনওরূপ পক্ষপাতিত্বদোষ বর্ত্তিতে পারে কি?

বাবু। এই প্রাকৃত রাজ্যের বিচারক পরাধীন অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারী।

রাজা যেরূপ আইন বিধান করিয়াছেন, কর্ম্মচারীকে সেই আইনানুসারে চলিতেই হইবে ; কিন্তু ভগবান্ ত আর কাহারও অধীন নহেন। তিনি ত নিজের ইচ্ছানুসারে ভালমন্দ সবই করিতে পারেন। তবে তাঁহার দোষ হইবে না কেন ?

বাবাজী। আচ্ছা, আপনি কি বলিতে চান যে রাজা আইনের বাধ্য নহেন ? বে-আইনী কার্য্য করিলে রাজার কিছু দোষ হইবে না ? এ কখনই হইতে পারে না ; কারণ ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন ঃ—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

তবেই দেখুন, ভগবান্ স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র। ভগবান্ নিজকৃত আইনের এতই বাধ্য যে, জীব বরং তাঁহার আইন না মানিয়া চলিতে পারে, কিন্তু তিনি কখনও বে-আইনী কার্য্য করিতে পারেন না। কাজেই জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, ভগবান্ও তদনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন।

বাবু। জীব এমন কি বে-আইনী কার্য্য করে যে, পরমদয়াল ভগবানও তাহাদের প্রতি কঠোর শাস্তি দান করিতে কুণ্ঠিত বা দুঃখিত হন না ?

বাবাজী। জীব যে কি বে-আইনী কার্য্য করে, তাহার আর আমি কত সংখ্যা করিব ? তবে মোটামুটি কয়েকটির কথা বলিতেছি। জীব যখন মাতৃগর্ভে থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণের আবেগে ভগবান্কে ডাকে, ভগবান্ তখন জীবের কাতর ক্রন্দনে করুণাপরবশ হইয়া নিজ সুখময় স্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের শত জন্মার্জ্জিত যাবতীয় পাপপুণ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। জীব তখন ভীত হইয়া ভগবানের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে, "প্রভো ! এবার ভূমিষ্ঠ হইয়া আর কখনও তোমার অভয় চরণ বিস্মৃত হইব না।" কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই মহামায়ার

সুখময় ক্রোড় স্পর্শে সকল কথা ভুলিয়া যায়। এমন কি, কালে কালে একেবারেভগদৎসত্তা পর্য্যন্ত লোপ করিয়া নিজ নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে থাকে। ভগবান এতই দয়াল যে তবুও জীবকে চেতন করিবার জন্য এক একবার নানারূপ বাধাবিঘ্ন, রোগশোকাদি প্রদান করিয়া থাকেন। কি দুর্দৈব! সমস্ত বাধাবিঘ্নের কারণ যে একমাত্র ভগবদ্-বিস্মৃতি, জীব ক্ষণকালের জন্যও তাহা মনে করে না; কাজেই দুঃখ পায়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদিবহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

বাবু। জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া যায় কেন?

বাবাজী। জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে তদনুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হইয়া আবার এরূপ কর্ম্ম করিতে থাকে যে, ক্রমে মহামায়ার মোহজালে পতিত হইয়া অনন্তকাল নানারূপ জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারে যাতায়াতরূপ দুঃখ ভোগ করে।

বাবু। আচ্ছা, জীবের এই অসৎপথে চলিবার বুদ্ধিদাতা বা অসৎ বস্তুর স্রষ্টাও ত ভগবান্; সুতরাং তিনি যদি জীবকে অসৎ পথে চলিবার বুদ্ধি প্রদান বা অসদ্‌বস্তুর সৃষ্টি না করিতেন, তবে ত আর জীব এত দুঃখ পাইত না। অতএব ভগবানই এই সুখদুঃখের দাতা নন কি?

বাবাজী। জীবের এই সমস্ত সুখদুঃখ প্রাপ্তির মূল কারণ মন। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

সংকল্পবিকল্পাত্মিকা বৃত্তিকে মন বলে। মনই জগতের যাবতীয়

কৰ্ম্মের কর্ত্তা এবং ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর। ইন্দ্রিয়গণ আবার দুইভাগে বিভক্ত,—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয়। মন ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখ দুঃখের হেতু যে কৰ্ম্ম তাহা আচরণ করিয়া থাকে। কাজেই ভগবান্ সুখদুঃখের দাতা হইতে পারেন না।

বাবু। মন ত জড় পদার্থ, মনের চালক একজন চৈতন্যময় পুরুষ না থাকিলে মন কখনও কার্য্য করিতে পারে কি?

বাবাজী। না, তা পারে না। যিনি বুদ্ধি-উপহিত চৈতন্য তিনিই মনের চালক, তিনিই প্রকৃত সদসৎ কার্য্য করাইবার কর্ত্তা এবং তিনিই সুখদুঃখের ভোক্তা।

বাবু। তবেই ত ভগবান্ সুখদুঃখের দাতা হইলেন। কারণ এই বুদ্ধি-উপহিত যে অণু-চৈতন্য তিনিও সেই অখণ্ড চৈতন্যের অংশ ভিন্ন আর কিছুই নন।

বাবাজী। বুদ্ধি-উপহিত চৈতন্য যে পূর্ণ চৈতন্যের অংশ এ কথা সত্য; কিন্তু বিকারী, সুতরাং অবিশুদ্ধ অতএব নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধ চৈতন্য হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। ইহাকেই বলা যায় জীব। জীব সুখ দুঃখের ভোক্তা, পরমাত্মা দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ। এই জীব যখন ভগবদ্‌বিমুখ হয়, তখনই দুঃখ ভোগ করে; আবার যখন ভগবানে উন্মুখ হয়, তখনই অনন্ত সুখ-সাগরে সন্তরণ করিয়া থাকে।

বাবু। আচ্ছা, কতদিন হইতে জীব এইরূপ ভগবদ্-বিমুখ হইয়াছে?

বাবাজী। কতদিন হইতে হইয়াছে ইহার সংখ্যা কেহই করিতে পারেন না। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—অনাদি বহির্ম্মুখ অর্থাৎ যাহার আদি নির্দ্দেশ করা যায় না।

বাবু। এই অনাদি বহির্ম্মুখ জীব ভগবদ্-উন্মুখ হইবে কিরূপে? কারণ ইহাদের ত আত্মচৈতন্য নাই যে নিজেদের মোহপাশ ছেদন করিবে!

বাবাজী। একমাত্র ভগবৎকৃপা ভিন্ন জীবের এই মোহপাশ ছেদন হইবার আর উপায় নাই। এই ভগবৎ-কৃপার মূল একমাত্র সাধুকৃপা। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন ঃ—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার।
এক নিত্য-মুক্ত একের নিত্য সংসার ॥
নিত্য-মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ। *
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পাঞা তবে কৃষ্ণনিকট যায় ॥

বাবু। আপনার এই পয়ারে আবার আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। আপনি বলিলেন, জীব দুই প্রকার—এক নিত্যবদ্ধ, এক নিত্য-মুক্ত। নিত্যবদ্ধের নিত্য সংসার। বন্ধনটি যদি নিত্যই হইল, তবে আর সেই বন্ধন মোচন হয় কিরূপে? কারণ 'ত্রিকালসত্যত্বং নিত্যত্বম্'। নিত্যবস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ অসম্ভব।

বাবাজী। বাবা! বড়ই সুন্দর প্রশ্ন হইয়াছে। ঐ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুখ ॥"

অপর স্থানে বলিলেন ঃ—নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্মুখ। নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।" এক মুখের দুইটি বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবব্যঞ্জক হইলে দোষ ঘটে। অতএব এই নিত্য শব্দে অনাদি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার আদি নির্দ্দেশ করা জীবের সাধ্যাতীত; কিন্তু আদি আছে এটি নিশ্চয়। অল্পায়ু, মায়ামুগ্ধ, দুর্ব্বল, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বিহীন কলিহত জীবগণ নানাপ্রকার ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়া সুদুর্লভ মানব-জীবন বৃথা অতিবাহিত করিতেছে দেখিয়া প্রেমদাতা পরমদয়াল নিতাই-চাঁদ দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে জনে জনে সাধিয়া যাচিয়া প্রেমধন বিতরণ করিয়াছেন। হায়! আমরা এমনই বহির্মুখ জীব যে তবুও এমন দয়াল প্রভুর অভয় পাদপদ্ম ভুলিয়া অনিত্য সংসারসুখে মত্ত হইয়া আছি!

বলিতে বলিতে ইঁহার চক্ষু দুইটি আরক্তিম এবং অশ্রুপূর্ণ হইল—অমনি "বোল শ্রীনিত্যানন্দ" বলিয়া একলম্ফে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে স্থানে বসিয়া ছিলেন, তাহার অনুমান পাঁচ ছয় হাত উপরে একখানি টানা পাখার তক্তা ঝুলান ছিল। যেমন ইনি উঠিয়াছেন, অমনি ঐ তক্তাখানি ইঁহার মাথায় বাজিয়া প্রায় তিন চারিহাত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। ঐ তক্তার নিম্নভাগে যে হুক ছিল, উহার একটি মাথায় লাগিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দরদরিতধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। ইঁহার কিন্তু খেয়াল নাই—সমান ভাবেই নৃত্য করিতেছেন। অন্যান্য সকলেও নৃত্য করিতেছে। খোল-করতাল বাজিতে লাগিল; কিন্তু নবদ্বীপদাদা ঐ রক্ত দেখিবামাত্র গোঁ গোঁ শব্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহাকে স্থির করে? মোহিনী বাবু এবং অন্যান্য বাবুগণ বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ তন্ময়তা দর্শনে একেবারে মোহিত হইলেন। সঙ্গিগণ ঐ রক্ত বন্ধ করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বাবাজী মহাশয় এতই উদ্দণ্ড নৃত্য-পরায়ণ যে কার সাধ্য ইঁহার মস্তক

স্পর্শ করে? সঙ্গিগণ নবদ্বীপদাদার ঐরূপ ব্যাকুলতা এবং বাবাজী মহাশয়ের অবস্থা দর্শনে অধীরভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "যদি কোনও উপায়ে রক্তটা বন্ধ করা যাইত, তবে আর ভাবনা ছিল না।" কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্যের পর বাবাজী মহাশয় স্থির হইলে সকলেই নিকটে গিয়া দেখেন যে, আপনা আপনিই রক্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে! তখন ললিতাদাসী পূর্ব্বপতিত গণ্ডস্থলের সেই রক্তধারা নিজ অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া দিলে বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" ললিতাদাসী মস্তিষ্কের ক্ষতস্থান দেখাইবার জন্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখেন, কোথাও কিছু চিহ্ন নাই। সকলে অবাক্! বাবুভায়াগণ ইঁহার মস্তকে পাখার আঘাত লাগা এবং দুইটি গণ্ডদেশ বহিয়া রক্তধারা পতন স্বচক্ষে দেখিয়াও ক্ষত স্থানের সন্ধান না পাওয়ায় বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে আপনার কি কিছুমাত্রও কষ্ট হয় নাই?"

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! আমি ত জানি না যে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে! যদি তোমরা দেখিয়া থাক এবং যথার্থও হয়, তবে প্রভুর কৃপায় কি মুহূর্ত্তমধ্যে ভাল হইয়া যাইতে পারে না? যে প্রভু আমাদিগকে সর্ব্বদার তরে কোলে করিয়া রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে এ অতি যৎসামান্য কার্য্য।" শুনিয়া সকলে বাবাজী মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন। ক্ষণকাল পরে সকলে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

—০—

বর্ণ বিচার

একদিন লালুবাবুর শ্বশুরবাড়ীর সন্নিকটস্থ একটি বাড়ীতে বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন এবং কয়েকটি ভদ্রলোক নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইনিও হাসিমুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। এই সময় হঠাৎ একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণটি জাজপুর অঞ্চলের মধ্যে বড় পণ্ডিত এবং খুব সম্ভ্রান্ত। আসিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। ব্রাহ্মণটিও বাবাজী মহাশয়কে আগ্রহ সহকারে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ব্রাহ্মণের আসিবার উদ্দেশ্য—বাবাজী মহাশয়ের সহিত উপাসনা লইয়া কিছু বিচার করা; কিন্তু মনে যে ভাব লইয়া আসিয়াছিলেন, ইঁহার দর্শন এবং ব্যবহারে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা! আপনারা যে কৃষ্ণের উপাসনা করেন, ঐ কৃষ্ণ কে?"

বাবাজী। আজ্ঞে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতারী পূর্ণ পূর্ণতম।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

> ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন :—

> "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
> ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

ইঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মা রজোগুণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন করিতেছেন এবং শিব তমোগুণের

দ্বারা সংহার করিতেছেন। ভগবৎ-আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেও ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

ব্রাহ্মণ। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ত আপনা-আপনিই হইতেছে। বস্তুর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণে পরস্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগই বস্তু উৎপত্তির কারণ। বস্তু সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন হইয়া নানারূপ কৌশলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হয় এবং কালে আবার লয়প্রাপ্ত হয়। ইহার জন্য এক এক জন ঈশ্বর কল্পনা করার প্রয়োজন কি?

বাবাজী। আচ্ছা, সামান্য একটি কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। যে জ্ঞানের বলে আপনি এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, এই জ্ঞান কোথা হইতে জন্মিল?

ব্রাহ্মণ। নানারূপ শাস্ত্র আলোচনাদ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়। এই পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির কৌশলে শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধান জন্মে। এই সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধানেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বাবাজী। বেশ! এই শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল কিরূপে?

ব্রাহ্মণ। চিন্তাশক্তি দ্বারা বেদের অপৌরুষেয় বাক্যকে পরিস্ফুট করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিবার মানসে পূর্ব্ব ঋষিগণ যে বাক্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাকেই শাস্ত্র বলে।

বাবাজী। বেদের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল?

ব্রাহ্মণ। বেদ স্বয়ংপ্রকাশ।

বাবাজী। আচ্ছা, আপনি বেদ মানেন?

ব্রাহ্মণ। বেদ না মানিলে চলিবে কেন?

বাবাজী। বেদ বলিয়াছেন ঃ—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সচ্চিদানন্দঘনরসময়ত্বাচ্চ। তবে আপনি কেন ঈশ্বর মানিবেন না? ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বহু বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সে সমস্ত আমি আর

কত দেখাইব ? আমার বিশ্বাস—যাঁহার সামান্য বর্ণজ্ঞান আছে, তিনি কখনও ভগবৎ-সত্তা লোপ বা অস্বীকার করিতে পারেন না।

ব্রাহ্মণ। এতক্ষণ শান্তভাবেই ছিলেন; কিন্তু এইবার একটু গরম হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনিই না হয় আমাকে বর্ণজ্ঞান শিখাইয়া দিন, যে বর্ণজ্ঞানে ভগবৎ-সত্তা স্বীকার করা যায়।"

বাবাজী। আপনি রুষ্ট হইবেন না; একটু ভাবিয়া দেখুন, অকারাদি হকারান্ত তেতাল্লিশটি বর্ণ। ঐ বর্ণে বর্ণে যোগ হইলে শব্দের উৎপত্তি হয়। বেদ এবং পুরাণাদি শব্দাত্মক। শব্দের মূল বর্ণ। এই বর্ণের আদি অকার। প্রত্যেক বর্ণের ভিতরে এই অকার রহিয়াছে; অ না থাকিলে কোনও বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে না। যথা—ক বলিতে ক্+অ, এইরূপ খ্+অ=খ, চ্+অ=চ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ। এ ত ব্যঞ্জনবর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণ পরাধীন; স্বরবর্ণ স্বাধীন। স্বরবর্ণের মধ্যে ত আর অকার থাকিতে পারে না।

বাবাজী। কেন, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, যাবতীয় বর্ণের মধ্যেই অকার আছে। শেষ হইতে ধরুন—অকারে এবং ওকারে মিলিত হইয়া ঔকারের উৎপত্তি হইয়াছে; তবে ঔকারের ভিতরে অকার আছে। এইরূপ অকারে উকারে ওকার, অকারে একারে ঐকার, অকারে ইকারে একার হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, ইকার ও উকারের মধ্যে অকার কোথায় ?

বাবাজী। ই এবং য এর উচ্চারণস্থান তালু, উ এবং ব এর উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। ইকারের উৎপত্তিস্থান যকার এবং উকারের উৎপত্তিস্থান বকার। তবেই ভাবিয়া দেখুন, য এবং ব ইহার ভিতর অকার রহিয়াছে; কাজেই ইকার উকারের ভিতরেও অকার আছে। আপনি পণ্ডিত, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমা অপেক্ষা আপনিই অনেক বেশী বাহির

করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। তবে দুই একটি দেখাইতেছি—যেমন ইষ্ট, ইজ্যা প্রভৃতি শব্দে যজ্ ধাতুর য স্থানে ই হইয়াছে। এই যকারের মধ্যে যে অকার ছিল, তাহাও ঐ ইকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ত? এইরূপ উপ্ত এবং উক্ত প্রভৃতি শব্দে বপ্ এবং বচ্ ধাতুর ব স্থানে উ হইয়াছে। এই বএর অকার ঐ উকারের ভিতর আছে ত? এইরূপ পৃচ্ছতি, বৃশ্চতি, ভৃজ্জতি প্রভৃতি পদে প্রচ্ছ্, ব্রশ্চ্ ও ভ্রসজ্ ধাতুর র স্থানে ঋ হইয়াছে। সুতরাং ঐ রএর অকার ঋএর মধ্যে রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এবার একটু স্তম্ভিত ও বিস্মিত ভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রতি বর্ণের মধ্যে অকার আছে, একথা না-হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইহাতে ভগবত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি বলা হইল?

বাবাজী। প্রতি বর্ণের মধ্যে অকার স্বীকার করিলেই ভগবত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল। শাস্ত্রে আছে—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥"

একাক্ষর কোষাভিধান বলিয়াছেন,—"অকারো বাসুদেবঃ স্যাদাকারশ্চ পিতামহঃ," সুতরাং প্রতি বর্ণের মধ্যে যদি অকাররূপে বাসুদেব অর্থাৎ বিষ্ণু রহিলেন, তাহা হইলে বর্ণে বর্ণে শব্দের যোজনা হেতু শব্দের মধ্যেও বিষ্ণুরূপী ভগবান্ আছেন। শব্দে থাকিলেই স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিতেও আছেন; কাজেকাজেই পাঞ্চভৌতিক বস্তুমাত্রেই বিষ্ণু আছেন।

ব্রাহ্মণ। তাহা হইলে আপনার কথায় বুঝা গেল যে, সত্ত্বগুণের অধীশ্বর পালনকর্ত্তা বিষ্ণুই প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান আছেন।

বাবাজী। এই বিষ্ণু শব্দে সর্ব্বেশ্বর, গুণাতীত অথচ গুণময় ভগবান্‌কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিষ্ণু শব্দের ধাতুগত অর্থ—'বিষ ব্যাপ্তৌ' অর্থাৎ যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী স্থূলসূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তুতেব্যাপক

রূপে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকেই বিষ্ণু বলা যায়। অতএব এই বিষ্ণুশব্দ এবং ব্রহ্মশব্দ একার্থবাচক।

এতক্ষণে ব্রাহ্মণের চোখে জল আসিল—হৃদয় দ্রব হইল—গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! এতদিন আমি শাস্ত্রালোচনায় বহু লোকের নিকট জয়লাভ করতঃ অভিমানমঞ্চে বসিয়াছিলাম। জানিতাম—আমি খুব জ্ঞানী ও পণ্ডিত; কিন্তু আজ আপনার মুখে সরল ভাষায় অপূর্ব্ব ভগবত্তত্ত্ববিষয়ক সুসিদ্ধান্তশ্রবণে মনে হইতেছে যে, এতদিন আমি বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি! আপনি মহাত্মা; আমার অন্তরের ভাব সকলই বুঝিতে পারিতেছেন। আপনার নিকট আমার আর কিছুই বলিবার নাই; এইমাত্র প্রার্থনা—যেন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবত-সত্তা অনুভব করিতে পারি।" বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন, "নিতাই নিতাই! বাবা, আমি নিতান্ত অজ্ঞ; আপনি পণ্ডিত, তাহাতে ব্রাহ্মণ। আপনারা জগদ্‌গুরু, আপনাদের কৃপাকটাক্ষ হইলে জগদ্বাসী নরনারী ভগবৎকৃপার অধিকারী হইতে পারে।"ইত্যাদি নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে দেখিয়া লালুবাবু স্নানাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলে বাবাজী মহাশয় স্নান করিতে গমন করিলেন। উপস্থিত লোকসকল স্বীয় স্বীয় বাসায় প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও যথাসময়ে স্নানাহ্নিকাদি করিয়া প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

—*—

উকীল ব্রহ্মানন্দবাবু

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। জাজপুরের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ ক্রমে বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। চারিদিকেই ইঁহার বিষয় আলোচনা—ইঁহার কথিত সমীমাংসার প্রশংসা—ইঁহার গানের ব্যাখ্যা, নৃত্যভঙ্গির অপূর্ব্বত্ব এবং ইঁহার সরলতা ও সদ্ব্যবহার প্রভৃতির যশোঘোষণা চলিতে লাগিল। বাবাজীমহাশয়ের চিরন্তন স্বভাব যে, যে স্থানে প্রতিষ্ঠা বা প্রশংসা হইবে, সে স্থানে কিছুতেই থাকিবেন না। আজও তাহাই হইল; সকালে উঠিয়াই লালুবাবুকে বলিলেন, "দেখ লালবিহারী! বহুদিন হইল জাজপুরে আসা হইয়াছে। এইবার একবার পুরী যাওয়া দরকার; অতএব আগামী কল্য পুরী রওনা হওয়া যাক্।" লালুবাবু বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজ্ঞে, আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে আরও কয়েক দিন এই স্থানে থাকিয়া উপদেশামৃতসিঞ্চনে আমাদের হৃদয়-মরুভূমি একটু সরস করিয়া দিন!" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা ভাই! নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হয় ত আবার আসা যাইবে, এ যাত্রা আর থাকিতে মন হইতেছে না।" ইত্যাদি নানা কথোপকথন হইতেছে এই সময় দুই তিনটি ভদ্রলোক সঙ্গে উকীল ব্রহ্মানন্দবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় অতি সমাদরের সহিত সকলকে বসাইলে ব্রহ্মানন্দবাবু করযোড়ে বলিলেন, "বাবা! আমার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে, একবার সদলে আমার বাড়ীতে গিয়া একটু কীর্ত্তনানন্দ করা হয়।"

বাবাজী। বাবা! আমার ত কোনই আপত্তি নাই। তবে পুরী

যাইবার জন্য মনটা একটু ব্যস্ত হইয়াছে। আবার যদি কখন প্রভু এই স্থানে লইয়া আসেন তখন দেখা যাইবে।

ব্রহ্মানন্দবাবু সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞে আপনি যাহাই বলুন না কেন, এ নরাধমের আশা পূর্ণ করিতেই হইবে। সেদিন মোহিনীবাবুর বাড়ীতে আপনাকে দর্শন করা অবধি আমার মনে আশা জন্মিয়াছে। যদিও আমি নিতান্ত নরাধম, অসচ্চরিত্র, কিন্তু আপনি ত পরম দয়াল, অদোষদর্শী পতিতপাবন!

বাবাজী। বাবা! আমি পতিতপাবনও নই, পরমদয়ালও নই; তবে তাঁর দাস বটি।

ব্রহ্মানন্দ। আজ্ঞে আপনি যাহাই হউন না কেন, আমি ত আপনাকেই জানি।

বাবাজী। কবে তোমার ওখানে যাইতে হইবে?

ব্রহ্মানন্দ। আপনার যেদিন ইচ্ছা হয়; আমি ত মনে করিয়াছিলাম যে আজ হইলেই ভাল হইত।

বাবাজী। বেশ, কথা! আজ তোমাদের বাড়ী কীর্ত্তন করিয়া কাল পুরী রওনা হইলেই ভাল হইবে।

ব্রহ্মানন্দবাবু পরমানন্দিত মনে বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া নিজ বাসায় প্রস্থান করিলেন। এই সময় লালুবাবু আসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে ব্রহ্মানন্দবাবুর বাড়ী যাওয়া আমার মতে যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ সে ভয়ানক মাতাল এবং ঘোর পাষণ্ড। বিশেষতঃ সাধুবৈষ্ণবের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বিহীন।

বাবাজী। বেশ; ভাল কথা! তবে তোমাদের মতে কেবল ভক্ত এবং বিশ্বাসী লোকের বাড়ীতেই যাওয়া উচিত। নিতাইচাঁদ প্রকট লীলায় জগাই মাধাই প্রভৃতি বহু পতিত পাষণ্ডীদিগকে উদ্ধার করিয়া-

ছিলেন ; অপ্রকটে নামরূপে কি একজন লোকেরও মতি পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম হইবেন ? কখনই নয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ; কাহারও সাময়িক অসদ্‌বৃত্তি দর্শন করিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। আজ যে ব্যক্তি ঘোর পাষণ্ড, কাল হয় ত প্রভুর কৃপায় সে একজন পরম সাধু হইতে পারে। আবার আজ যিনি পরম সাধু, কালপ্রভাবে হয় ত তিনি অসৎপথাবলম্বী অবিশ্বাসী ঘোর পাষণ্ড হইতে পারেন।

এইরূপ কথোপকথনে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। বাবাজী মহাশয় স্নানাদি শেষ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে ইঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ব্রহ্মানন্দবাবুর বাড়ী হইতে লোক আসিলে বাবাজী মহাশয় পুরী যাইবার মানসে সকলের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সগণে নাম করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দবাবুর বাড়ী রওনা হইলেন।

এদিকে ব্রহ্মানন্দবাবু জাজপুরস্থ বহু উকীল, মোক্তার এবং অন্যান্য বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বাবুভায়াগণ বাবাজী মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ইঁহারা উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে একেবারে ব্রহ্মানন্দবাবুর বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানা ঘরটি ফরাশ, সুগন্ধি দ্রব্য ও নানারূপ আলোদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। বাবুভায়াগণ সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাতামাতি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দবাবু করযোড়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন, আর চোখের জলে তাঁহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ! দুই দিন পূর্ব্বে যিনি মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া সাধুবৈষ্ণব দেখিলে অবজ্ঞাভরে অপমান করিয়া বা দুটি কটু কথা বলিয়া নিজেকে পরম বুদ্ধিমান্‌বোধে জগতের জীবসমূহকে নগণ্য মনে করিতেন, যিনি নামসংকীর্ত্তন ত দূরের কথা—ভক্তি-মাখান আত্মদৈন্য-পরিপূর্ণ, অনুতাপসূচক পদকীর্ত্তন শুনিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করিতেন

তিনি আজ কয়েকটি বাবাজীর তালমান-রহিত নামসংকীর্ত্তন এবং উদ্দণ্ড নৃত্যে আত্মহারাভাবে অঝোরে ঝুরিতেছেন! কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড-নৃত্য-কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় বাবুভায়াগণের মন জানিয়াই যেন উপবেশনপূর্ব্বক কীর্ত্তন ধরিলেন :—

ও মন এখনও কি কর কাম।
জান না কি বলি, শমন খাতায়, লিখিয়া আইলে নাম ॥
যখন এখানে, যে কাজ করিছ, দূতে জানাইছে সাটে।
তখনই সেখানে, কাগজে ধরিয়া, পলকে পলকে আঁটে ॥
উলটি পালটি, নাড়িছে দেখিছে, যখন ফুরাবে জমা।
আঁটিয়া সাঁটিয়া, বাঁধিয়া লইবে, বুঝিয়া দে রে ভাই ক্ষমা ॥
কামেতে চঞ্চল, হইয়া বিকল, কুকাজ করিছ কত।
পূরব স্মরিয়া, দেখনা রে ভাই, আপন বিচার মত ॥
ব্যাপারে আসিয়া, মূল হারাইলি, ধরিয়া মানব দে।
আপন গরবে, আপনি ডুবিছ, তোরে বুঝাইবে কে ॥
আইন লইয়া কত, বিচার করিছ, দিবস রজনী জাগি।
আপন বিচার, করিয়া দেখ না, কে তোর পাপের ভাগী ॥
একাল গণিছ, পাছু না ভাবিছ, আপনা আপনি দড়।
ভাবিছ শমনে, ফাঁকি দিবে ভাই, নিজেই চতুর বড় ॥
এ ঘর এ বাড়ী, যত টাকা কড়ি, এ মোর ও মোর কথা।
ক্ষণেকে সকল, হইবে বিফল, তুমি বা থাকিবে কোথা ॥
দারা সুত লয়ে, আমোদে প্রমোদে, কাটালি সকল দিন।
নয়ন মুদিয়া ভাবিয়া দেখ না, পরমায়ু কতদিন ॥
ধন্য কলিযুগে, জনম পেয়েছ, ভারত ভূমেতে বাস।
হেলায় শ্রদ্ধায়, হরি হরি বল, পূরিবে মনের আশ ॥

এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ নানারূপ মনঃশিক্ষাসূচক পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বাবুভায়াগণ একেবারে স্তম্ভিত! ব্রহ্মানন্দবাবু এক পার্শ্বে বসিয়া অঝোরে ঝুরিতেছেন, আর এক একবার হায় হায় বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মানন্দবাবু ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে পতিত হইলে ইনি উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানারূপ সান্ত্বনাসূচক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইলে সকলেই মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। ব্রহ্মানন্দ বাবু একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন; হঠাৎ বাবাজী মহাশয় ডাকিলেন, "এস বাবা! আমার কাছে এস।"

ব্রহ্মানন্দ। আজ্ঞে আমি ইহার ভিতরে যাইবার যোগ্য নহি।

বাবাজী। কেন বাবা! এ ত মহাপ্রসাদ—চিন্ময় বস্তু। ইহাতে স্পর্শদোষ হইতে পারে না। সুতরাং তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট আসিয়া ব'স।

ব্রহ্মানন্দবাবু বাবাজী মহাশয়ের কথা অবহেলা করিতে না পারিয়া অগত্যা সেইস্থানে ইঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে একজন ইঁহাকে একখানা পাতা আনিয়া দিলে পূজারী পরিবেশন করিতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দবাবু যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। প্রসাদ পাইবেন কি, বাবাজী মহাশয়ের যে ব্যবহারটি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতেছে, তাহাতেই যেন উঁহার মন হরণ করিতেছে। কেবল বাবাজী মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ইঁহার ভাবভঙ্গিই লক্ষ্য করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে সকলেই বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ একটি কুঠরীতে বাবাজী মহাশয়ের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া রওনা হইবেন, এই সময় ব্রহ্মানন্দবাবু অতি বিনীতভাবে বলিলেন,

"আজ্ঞে আজকার দিনটি এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া অধমের পশুজীবন উদ্ধার করিয়া দিন। আমি ঘোর পাষণ্ড। শাস্ত্রে অজামিল, রত্নাকর জগাই, মাধাই, প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে; কিন্তু আমি তাহাদের অপেক্ষা কোটিগুণে নিকৃষ্ট। আমাকে উদ্ধার করিতে আপনি ভিন্ন আর যে কেহ আছে বা থাকিতে পারে, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব এ পতিতের গতি করিতেই হইবে।" বাবাজী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নিতাইচাঁদ পতিতপাবন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে কিছুই বিচিত্র নহে। আজ আর আমাদিগকে এস্থানে রাখা বোধহয় নিতাইচাঁদের অভিপ্রায় নহে। তুমি দুঃখ করিও না বাবা! প্রভুর ইচ্ছা হইলে সময়ান্তরে আবার দেখা হইবে।" বলিয়া "নিতাইগৌর রাধেশ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরেরাম" এই নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাবাজী মহাশয় কখন কাহাকেও রাস্তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন না; চরণে চরণ দিয়া নাচিতে নাচিতে গমন করিতেছেন। সঙ্গিগণও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন। ব্রহ্মানন্দবাবু সঙ্গেই আছেন। প্রায় এক মাইল দূরে একটি গাছতলায় হঠাৎ বাবাজী মহাশয় থমকিয়া দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রদ্বয় হইতে দরদরিত ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন হইতেছে—সর্ব্বাঙ্গে পুলক, গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রক্তিম ও কম্পিত। এদিকে ব্রহ্মানন্দবাবু সংকীর্ত্তনদলের পশ্চাদ্ভাগ হইতে রোদন করিতে করিতে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় দ্রুতগতি আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে পতিত হইলে ইনি চমকিতভাবে চরণের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মানন্দবাবুকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "আহা মরি কি করুণা! লীলাময়ের লীলার বালাই যাই।" এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দবাবুকে তুলিয়া আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করতঃ কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিলেন। সঙ্গিগণের আনন্দ আর ধরে না! ব্রহ্মানন্দবাবু পুনরায় ইঁহার চরণতলে পড়িয়া

বলিতে লাগিলেন, "প্রভো ! আমি ঘোর মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র নারকী। আমার বিশ্বাস—আমাকে উদ্ধার করিতেই আপনার অবতার। প্রভু ! আমি আমার নিজের অবস্থা বলিয়া বুঝাইতে ভাষাপাইতেছি না। আপনি অন্তর্য্যামী, সকলই জানেন বা জানিতেছেন ! আমি আর কি বলিব ? অধমের ভার শ্রীচরণে লাগিল।" বলিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে উঁহাকে প্রবোধ দিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, নিজেও পুনরায় নাম করিতে করিতে বৈতরণী ষ্টেশনের দিকে গমন করিলেন। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে যেমন উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি কয়েকজন ভক্ত আসিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "আজ্ঞে! আমাদের সকলের অভিলাষ যে অন্ততঃ এ বেলা এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন ! অনুমতি হয় ত ঠাকুরের ভোগের যোগাড় করিয়া দিই।" বাবাজী মহাশয় ভক্তের অনুরোধে অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। সুচতুর সঙ্গিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রান্না শেষ করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিলেন। ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় স্নানাদি করিয়া "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত" কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রামখানি যদিও অতি ক্ষুদ্র কিন্তু স্ত্রীপুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেই ভক্ত। সকলেই স্ব স্ব গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছেন। ক্রমে সংকীর্ত্তনসমাপ্তি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে গাড়ী আসিয়া পেঁাছিলে সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া শ্রীধাম পুরী রওনা হইলেন।

—০—

শ্রীধাম পুরী প্রত্যাবর্ত্তন ও শ্রীরাধারমণকুঞ্জে অবস্থিতি

রাত্র অনুমান এগারোটার সময় গাড়ী আসিয়া পুরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় সগণে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে কেহই থাকিও না, তোমরা সকলে নাম করিতে করিতে ঝাঁজপিটা মঠে গমন কর। আমি এ বারে রাধারমণকুঞ্জে থাকিব। সকলেই ইঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইনি যখন বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা সকলেই নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন। জাজপুর হইতে ষ্টেশনে আসিবার সময় ললিতাদাসীর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ায় তিনি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের ভাব যে কোনও কৌশলে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। বাবাজী মহাশয় ঘটী হাতে করিয়া ষ্টেশন হইতে সমুদ্রের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, ঐ রাস্তায় যাইতে লাগিলেন। ললিতাদাসীও ধীরে ধীরে ইঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে একটি পুলের নিকট গিয়া বাবাজী মহাশয় পুর্ব্বদিক্-বর্ত্তী মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ললিতাদাসী পুলের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ইনি যেমন উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি একটি পুলিশ কন্ষ্টেবল আসিয়া ইঁহাকে যাত্রিক জ্ঞানে বলিতে লাগিল, "আপ কোন্ হো, হিঁয়া টাট্টি গিয়া? চল অব্ থানামে জানে হোগা।" বাবাজী মহাশয় একটু অপ্রতিভের ভাণ দেখাইয়া বলিলেন, "বাবা! কি করিব? আমার ত প্রয়োজন হইয়াছে বাহ্যে গিয়াছি; এখন নিতাইচাঁদের ইচ্ছায়

তোমার যাহা ভাল মনে হয় কর। থানায় যাইতে হয় চল। আমারও একটু সুবিধা হয়; কারণ অনেক দিন বঙ্কিমবাবু, পূর্ণবাবু প্রভৃতির সহিত দেখা হয় নাই। এই উপলক্ষ্যে সে কার্য্যটিও সম্পন্ন হইবে।” জ্যোৎস্না রাত্রি; কনষ্টেবলটি একটু নিকটে গিয়া যেমন বাবাজী মহাশয়কে চিনিতে পারিল অমনি বলিল, “আজ্ঞে মহাপ্রভু! মু চিহ্নি পারি নাহি, মোহর অপরাধ ঘেনিবে নাহি” বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তখন বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ললিতাদাসীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে রাধারমণকুঞ্জ মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠের অধীশ্বর শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ শয়নে ছিলেন বলিয়া আর তাঁহাকে জাগান হইল না। ললিতাদাসী বাবাজী মহাশয়ের বিছানা করিয়া দিলেন। আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী মহাশয় কিছুই খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কাজেই আর কোনও যোগাড় করা হইল না। বাবাজী মহাশয় শয়ন করিলেন; অন্যান্য দুই একজন যাঁহারা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব অভিপ্রায় মতে বিশ্রাম করিলেন।

—o—

বালমুকুন্দ বাবুর সহিত মিলন

ঝাঁজপিটা মঠের সেবার ভার কুসুমমঞ্জরী দাসী সখীর উপর দেওয়া হইয়াছে। সেই স্থানে থাকিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গী মধুসূদন দাস ভিক্ষা করেন। রাধারমণ কুঞ্জে কুঞ্জদাস বাবাজী, ললিতাদাসী এবং রসরঙ্গিণী দাসী সখী এই কয়েকজন বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকেন। শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের সেবার জন্য একসের চাউল রান্নার ব্যবস্থা করা

হইয়াছে। স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বালমুকুন্দ বাবু প্রায়ই বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু বিশেষ সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। একদিন উঁহার বাসায় সগণে বাবাজী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ। ললিতাদাসী এবং কুসুমদাসী রান্না করিতে গিয়াছেন। বেলা আন্দাজ দশটার সময় বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন লইয়া উঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন রবিবার—বাবুর অফিস বন্ধ; কাজেই কীর্ত্তন শুনিবার বিশেষ সুযোগ হইল। বালমুকুন্দ বাবু যদিও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত নহেন, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ এবং অতি মৃদুস্বভাব। কোমল জিনিষে সহজেই অপর বস্তুর সহযোগ ঘটিয়া থাকে। আজ বালমুকুন্দ বাবুর কোমল হৃদয়েও ভগবৎ-প্রেমের ছাপ পড়িল—সংকীর্ত্তনে হৃদয় যেন আরও দ্রব হইয়া গেল—চোখে জল আসিল—ভগবানের উপাসনা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মিল—ব্যগ্রতার সহিত বাবাজী মহাশয়কে দীক্ষার কথা বলিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাঁহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক উঁহার হৃদয়ের উৎকণ্ঠার মাত্রা আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার মানসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমে বালমুকুন্দ বাবুর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় উহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন। সেই হইতে বালমুকুন্দ বাবু প্রত্যহ একবার কুঞ্জমঠে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত গ্রহণপূর্ব্বক আফিসে গমন করেন। ঘটনাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঁহার উপর একটু বিরূপ হইয়া পড়িলেন; কারণ বালমুকুন্দ বাবু একটু স্বাধীনচেতাঃ। কাছারিতে যাইবার সময় কোন কোন দিন হয় ত নাকে তিলক করিয়া যান। উঁহার মুখে বেশ গোঁফ ছিল। একদিন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ বালমুকুন্দ! এই গোঁফে তোমাকে ঠিক ব্রজগোপের ন্যায় দেখা যাইতেছে। দে'খ যেন গোঁফটি ফেলিয়া

দিও না।" জানি না বাবাজী মহাশয়ের ঐ বাক্যটি বালমুকুন্দ বাবু কি ভাবে গ্রহণ করিলেন। পরদিবস প্রাতে গোঁফ কামাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কি রে পাগলা! গোঁফ ফেলিতে বারণ করিলাম! এ কি?" তিনি বলিলেন, "বাবা বেশ হইয়াছে।" "গলায় তুলসীর মালা, আর মুখে গোঁফ! ও যেন কেমন ভাববিরুদ্ধ বলিয়া আমার মনে হইতেছিল। আজ মনটি বেশ প্রসন্ন হইয়াছে।" অনুভবের কথা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় উঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। সাহেব উঁহার ব্যবহারে কেন যেন ক্রমেই অধিক পরিমাণে বিরক্ত হইয়া কিছু মাহিনা কমাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন বালমুকুন্দবাবু বেলা নয়টার সময় আফিসের পোষাকে কুঞ্জমঠে উপস্থিত হইয়াছেন। দৈবক্রমে ক্ষণকাল পূর্ব্বে একজন পান্ডা একগাছি জগন্নাথ দেবের প্রসাদী গাঁদাফুলের মালা বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিয়া গিয়াছেন। বালমুকুন্দবাবু প্রণাম করিবামাত্র ইনি ঐ মালাগাছটি উঁহার গলায় দিয়া রাধাবিনোদকে উঁহার কপালে তিলক করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। তিনিও বেশ মোটা করিয়া একটি তিলক করিয়া দিলেন। তখন বালমুকুন্দবাবু বাবাজী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অধরামৃত গ্রহণপূর্ব্বক অতি আনন্দভরে কাছারিতে গমন করিলেন। একেই ত সাহেব একটু চটা, তাহাতে আবার আজ মালাতিলক ধারণ করিয়া কাছারি গিয়াছেন! দেখিবামাত্র সাহেব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "এ কি?"

বালমুকুন্দ। সাহেব! এটি আমাদের ভগবানের প্রসাদী মালা।

সাহেব। আফিসে এসব আনা নিতান্ত অন্যায়।

বালমুকুন্দ। কেন সাহেব! আফিসের সঙ্গে কি ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই?

সাহেব। থাকিলেও ঐরূপ পোষাকে আসা উচিত নহে।

বালমুকুন্দ। কেন সাহেব! তুমি ত তোমার পোষাক পরিয়া আসিয়াছ। আমিও আমার পোষাক পরিয়া আসিয়াছি! ইহাতে কি কোন দোষ হইতে পারে? আমি যদি কোনও বে-আইনী বা রাজার অনিষ্টকর কোন কার্য্য করি, তবে আমার দোষ হইতে পারে।

ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। কিছু সময় পরে সাহেব বলিলেন, "আমি তোমার মাহিনা কমাইয়া দিব।"

শুনিয়া বালমুকুন্দ বলিলেন, "সাহেব! আমার মাহিনা কমাইবার ইচ্ছা হয় কমাও, কোনও আপত্তি নাই; আমি কিন্তু আমার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না।" সহৃদয় সাহেব উঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যাহাতে উঁহার কিছু বেতন বৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে চেষ্টিত হইলেন। বালমুকুন্দবাবুর প্রতি সাহেবের যে বিদ্বেষভাব ছিল, সেই দিন হইতে তাহা দূর হইয়া পরম প্রীতিভাবের সঞ্চার হইল। নানাকারণে বালমুকুন্দ বাবুর ভক্তিভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উঁহার স্বভাবটি ঠিক বালকের ন্যায়। বাবাজী মহাশয়কে দূর হইতে দেখিবামাত্র অতি দ্রুতগতি আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ অন্ততঃ চারি পাঁচ মিনিট সময় ইঁহার পেটের উপর মাথাটি রাখিয়া পরমানন্দলাভ করিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "যে দিন আমি বাবার পেটে মাথা দিতে না পারি, সেদিনটি আমার অশান্তিতে যায়।" এইরূপ ভাবে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ললিতাদাসীর পরীক্ষা

রাধারমণ কুঞ্জে একসের করিয়া চাউল রান্না হয় এবং শ্রীরাধারমণ দেবের ভোগ লাগিলে বাবাজী মহাশয় প্রসাদ সেবা করার পর অন্যান্য

ভক্তগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধরামৃত পান। ঝাঁজপিটা মঠে ভোগ হইলে তথাকার বৈষ্ণব-সেবার পর কুসুমমঞ্জরীদাসী মহাপ্রসাদ লইয়া আসেন। সেই মহাপ্রসাদ ললিতাদাসী, রসরঙ্গিণীদাসী ও কুসুমমঞ্জরীদাসী প্রভৃতি সেবা করেন। একদিন বাবাজী মহাশয়ের কি খেয়াল হইল—প্রথম একসের চাউল রান্না হইয়া রাধারমণদেবের ভোগ লাগিল, ঐ মহাপ্রসাদ নিজে তিন চারিজন ভক্তসঙ্গে সমস্ত সেবা করিলেন। হঠাৎ কয়েকজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিলেন, "দেখ, আর দুইটি চাউল রান্না করিয়া রাধারমণের ভোগ দাও ত!" "শুনিবামাত্র নবদ্বীপ দাদা পার্শ্বস্থ কুঞ্জবিহারী রায়ের বাড়ী হইতে দুই সের চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিলে ললিতাদাসী তাহা হইতে একসের চাউল রান্না করাইয়া রাধারমণের ভোগ দিলেন। ভোগের পর বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে ভক্তগণ সেই অধরামৃত পাইয়া উঠিবেন, এই সময় আবার কয়েকজন ভক্ত আসিলেন। বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ রান্না করিতে বলায় ললিতাদাসী অবশেষ চাউল দুইটি রান্না করাইলেন। ইত্যবসরে ঝাঁজপিটা মঠ হইতে মহা-প্রসাদের পারশ আসিলে বাবাজী মহাশয়ের আদেশে উভয় প্রসাদ মিশ্রিত করিয়া ভক্তগণকে দেওয়া হইল। যাহা কিছু অবশেষ ছিল, কুসুমমঞ্জরীদাসী এবং রসরঙ্গিণীদাসীকে পাইবার আদেশ করিলেন। তাঁহারা একবার বলিলেন, "দিদি এখনও কিছু খান নাই।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় যেন একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা পাও, তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না।" কাজেই যাহা কিছু অবশেষ ছিল উঁহারা দুইজনে পাইলেন।

বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে এরূপ কাজের আদেশ করিতেছেন যে, ইচ্ছা থাকিলেও তিনি কোনও রূপ প্রসাদাদি পাইতে পারিতেছেন না। সকলের প্রসাদ পাওয়ার পর বাবাজী মহাশয় শয়ন করিলেন।

ইত্যবসরে জেনামঠ হইতে কিছু চিঁড়াভাজা, ঘনাবর্ত্ত দুধ ও মিষ্ট আসিল। বাবাজী মহাশয় নিদ্রিত জানিয়া লোকটি অতি সন্তর্পণে যেমন রাধারমণের অঙ্গনে উপস্থিত হইল, অমনি ইনি ঘর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, ঐ সমস্ত দ্রব্য ঠাকুর জাগিলে পরে ভোগ লাগিবে। এখন সমস্ত আমার ঘরে আনিয়া রাখ।" তখন ললিতাদাসী বুঝিল যে আজ ইঁহার মনে কোন খেয়াল উদয় হইয়াছে; কাজেই হাসিতে হাসিতে উক্ত দ্রব্য-সকল বাবাজী মহাশয়ের ঘরে রাখিল।

বেলা চারিটার সময় পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে ভাজা চিঁড়া, ঘনাবর্ত্ত দুধ ও মিষ্ট সহযোগে রাধারমণজীউকে ভোগ লাগান হইল। বাবাজী মহাশয় হাত-মুখ ধুইয়া উক্ত প্রসাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে নিজ হস্তে সমস্ত বাঁটিয়া দিলেন; কিন্তু ললিতাদাসী বাদ পড়িয়া গেলেন। তখন ললিতাদাসীর মুখপানে তাকাইয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও! তাই ত ইহাকে ত ভুল হইয়া গেল! আচ্ছা, এই বাসন প্রভৃতিতে যাহা লাগিয়া আছে, উহাতেই উহার যথেষ্ট হইবে।" ললিতাদাসীও হাসিতে হাসিতে অঙ্গুলিদ্বারা কিঞ্চিৎ অধরামৃত গ্রহণপূর্ব্বক বাসন পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য যে তাহাতেই উহার ক্ষুধানিবৃত্তি ও পরম পরিতৃপ্তি হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বাবাজী মহাশয় জগন্নাথ দর্শনে বাহির হইলেন। যাইবার সময় ভুবন সাউর বাড়ী হইতে কিছু পুরী, কচুরী এবং মোহন-ভোগ প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং একখানি পুরীর একপাশ ছিঁড়িয়া তাহার বড় ছেলেকে বলিয়া দিলেন, "বলিবি আমার অধরামৃত!" সেও কুঞ্জমঠে গিয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল। এদিকে বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে বলিয়া গিয়াছেন, "আমার জন্য যদি কোনও খাবার আসে, সাবধান! যেন খরচ করিও না। ললিতাদাসী

ভুবন সাউর বড় ছেলে নিতাইদাসের হাত হইতে থালাখানি লইয়া গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া দিল। ক্রমে রাত্র অনুমান নয়টার সময় বাবাজী মহাশয় আসিয়া ললিতাদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জন্য যে খাবার আসিয়াছিল তাহা কোথায় ?"

ললিতা। কেন! সে যে অধরামৃত! আমি সমস্ত পাইয়াছি!

বাবাজী। কে বলিল অধরামৃত ?

ললিতা। কেন আপনিই ত নিতাইদাসের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন!

বাবাজী। সে যে মিথ্যা কথা! আমি তোদের পরীক্ষার জন্য বলিয়াছি!

ললিতা। আচ্ছা, আপনারই কথা যদি মিথ্যা হইতে পারে, তবে না হয় আমারও কথা মিথ্যা হইল।

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সেই পুরী-কচুরীর থালাখানা আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে দিল। বাবাজী মহাশয় ঐ থালা দেখিয়া একটু বিস্মিতভাবে কিঞ্চিৎ নিজে গ্রহণ করিয়া ললিতাদাসীকে খাইবার আদেশ করিলেন। ললিতাদাসী নিজ কার্য্যের অবকাশমতে উপস্থিত সকলকে লইয়া সেই অধরামৃত পাইল।

—*—

টোটাগোপীনাথের নটবরবেশ

এইরূপ পরমানন্দে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনানন্দে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আনুগত্যে ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, গুণ্ডিচা মার্জ্জন ও রথযাত্রা প্রভৃতি

লীলা পূর্ব্ববৎ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নটবরবেশ ও বালধূপ নামক ভোগ হইতে লাগিল। একদিন বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসঙ্গে টোটাগোপী-নাথ দর্শনে গিয়াছেন। গোপীনাথজীউর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে রাধাভাবাবেশে মিলন করাইয়া মনে মনে কি ভাবিলেন ইনিই জানেন—পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি গোপীনাথের নটবরবেশ করিতে পারিবে ?" পূজারী বলিল, "আজ্ঞে আপনার কৃপা হইলে পারিব বই কি !" শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক বলরামবাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ বলরাম ! শ্রীগোপীনাথজীউর নটবরবেশ করিবার জন্য আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে ; অতএব আজ ভিক্ষায় বাহির হইব মনে করিয়াছি।" বলরামবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে নটবরবেশে আর কি বেশী খরচ হইবে ! উহার জন্য আবার ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি ?" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বলরাম ! ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা ভগবৎসেবায় যত প্রীতি জন্মে, কোনও একজনের অর্থ দ্বারা সেইরূপ প্রীতি হইতে পারে না ; অতএব চল, সকলে মিলিয়া ভিক্ষা করা যাক্।" বলিয়া 'ভজ নিতাইগৌর রাধেশ্যাম। জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম॥" এই নাম করিতে করিতে ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

সঙ্গে অনেক লোক—খোল করতাল বাজিতেছে। প্রথমে পুরীবাসী-গণ মনে করিয়াছিলেন যে, বাবাজী মহাশয় নগরকীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন, পরে যখন দেখিলেন যে ইঁহার কাঁধে ঝোলা, তখন সকলেই সাগ্রহে বলরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "আজ কি উপলক্ষ্যে বাবাজী মহাশয় ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন ?" বলরামবাবু বলিলেন, "টোটা-গোপীনাথের নটবরবেশ করিবার মানসে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন।"

শুনিবামাত্র সকলে নিজ নিজ রুচি-অনুসারে কেহ পাঁচ, কেহ দশ, কেহ বা দুই এক টাকা করিয়া ভিক্ষার ঝোলায় দিতে লাগিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর ঝাঁজপিটা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঝোলা নামাইলে বলরামবাবু গণিয়া দেখেন যে, বিরানব্বই টাকা চারি আনা হইয়াছে। তখন বাবাজী মহাশয় উহাকে বলিলেন, "দেখ বলরাম! গোপীনাথজীউর নটবরবেশের দরুণ কাপড় প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন হয় তাহা সংগ্রহ কর।" নবদ্বীপ দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেবল নটবর বেশ করিলেই ত হইবে না। লীলাকীর্ত্তন, নাচ এবং বৈষ্ণব-সেবা হওয়া চাই ত! বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা সরল প্রাণে প্রার্থনা কর, নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় টাকার অভাব হইবে না।" বলরামবাবু বলিলেন, "এক দল আখড়াপিলার নাচ আনাইলে ভাল হয় না কি?"

বাবাজী। কোথাকার দল ভাল হইবে?

বলরাম। আজ্ঞে সত্যবাদির বিহারী ও তার দলটি বড়ই ভাল। তাহার ছেলেটি বেশ নৃত্য করে।

বাবাজী। বেশ ত তাহাদিগকে খবর দাও।

বলরামবাবু অতি হৃষ্টচিত্তে সত্যবাদিতে লোক পাঠাইলেন। এদিকে তিনি নানারূপ বেশভূষার যোগাড় করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় শিবুদাসকে ডাকাইয়া গোপীনাথের বাড়ী দুইমণ দুধের সুজির পায়স এবং একশত টাকার জগন্নাথের ভোগের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। পুরীবাসী সমস্ত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করা হইল। মহা ধুমধাম ব্যাপার! পরদিবস অতি প্রত্যুষে নবদ্বীপদাদাকে বেশ করিবার জন্য পাঠান হইল এবং সকলে স্নানাদি করিয়া বেলা আন্দাজ আটটার সময় নাম করিতে করিতে গমন করিলেন। এদিকে বলরাম বাবু সত্যবাদিতে

বিহারী ও তার দল আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। গোপীনাথজীউর ভোগ রান্না হইতে লাগিল। এদিকে নবদ্বীপ দাদা ও একজন পূজারী ঠাকুরের বেশ করিতে লাগিলেন।

বেলা আন্দাজ দশটার সময় গোপীনাথজীউর দর্শন খোলা হইল। লোকে লোকারণ্য। অপূর্ব্ব দর্শন! যে একবার গোপীনাথজীউর চন্দ্রবদন দর্শন করিতেছে, সে যেন জন্মের মত বিকাইয়া যাইতেছে। কেহ বা আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কেহ কেহ বা গোপীনাথজীউর বদনপানে চাহিয়া অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছে। যথাসময়ে গোপীনাথের ভোগের যোগাড় হইলে ভোগ-আরতি কীর্ত্তনান্তে শয়ন দেওয়া হইল; ইঁহারাও মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিহারী ও তার দল আসিয়া পেঁীছিলে গান আরম্ভ হইল। বিহারীর ছেলেটি অতি অপূর্ব্ব গান ও নৃত্য করে। বাবাজী মহাশয় প্রেমে বিভোর ভাবে গান শুনিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকারী বালকটি এমনই অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছে যে, দেখিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। রাত্র আন্দাজ সাতটার সময় গান শেষ হইল। এদিকে বৈষ্ণবমণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হইলে মহাপ্রসাদ পঙ্গত আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর এমনই অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে যে, যে একবার দর্শন করিতেছে, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে বাবাজী মহাশয়ের মনে কি ভাবের সঞ্চার হইল—নিজে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ঃ—

ব্রজ অভিসারিণীর, ভাবে বিভাবিত,
রসময় গৌরকিশোর।
স্বরূপের করে ধরি, কহে শুন সহচরি,
কাঁহা মোর রসিকশেখর ॥

না হেরি সে চাঁদমুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
ক্ষণে যুগ সম মোর লাগে।
চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, মল্লিকা মালতী গুচ্ছ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
(সই) কি ক্ষণে হেরিনু রূপখানি।
মদন মোহন ঠাম, জিনি কত কোটি কাম,
তাহে আধ বঙ্কিম চাহনি॥
গলে বনমালা দোলে, রমণীর মন ভোলে,
কটিতে কিঙ্কিণী ভাল সাজে।
কপালে চন্দন চাঁদ, ভুবন মোহন ফাঁদ,
চরণে নূপুর ঘন বাজে॥
পীতবাস করে শোভা, বিজুরী জিনিয়া আভা,
নটবর নাগর রাজ।
রজনী অধিক ভেল, গুরুজন ঘুমাওল,
চল সবে না কর বেয়াজ॥

—*—

বাম অঙ্গুলি বাম নাসিকাতে দিল।
শ্রীহরি সঙরি বাম পদ বাড়াইল॥
স্বরূপ রামানন্দ দোঁহে চলে দুই পাশে।
চলিতে চলিতে পঁহু কহয়ে তরাসে॥
অবশ হইল গা চলিতে না পারি।
কত দূরে বৃন্দাবন কহ সহচরি॥
স্বরূপ কহয়ে আর বহু দূর নয়।
শ্যাম-অঙ্গ সৌরভ গন্ধ নাসিকাতে বয়॥

শুনিয়া আনন্দে পঁহু বিভোর হইয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া ॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারু পানে চায়।
নিকুঞ্জ মাঝারে শ্যাম দেখিবারে পায় ॥
গোপীনাথের বামে দাঁড়াইল গৌরহরি।
নবীন জলদে জনু থির বিজুরী ॥
শ্যাম বামে কিবা শোভা রসের মঞ্জরী।
সখীগণে জয় দেয় দুঁহু রূপ হেরি ॥

ইত্যাদি নানারূপ পদ গান করিয়া নিজেও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, উপস্থিত জনগণকেও আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন করিলেন। রাত্র অধিক হইয়াছে দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করার পর ঠাকুরের শয়ন দিবার জন্য পুজারী উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গী শীতলদাস ও ব্রজেন্দ্রদাস এই দুই জনে একটু আড়ালে থাকিয়া মৃদুস্বরে গাহিতে লাগিল,—

তনু তনু মিলিল রসের আবেশে।
প্রিয় সহচরীগণ রহু চারিপাশে ॥
কি দিব উপমা রূপের কি দিব উপমা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥
অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি বয়ানে বয়ান।
চাঁদ চকোর পারা নয়ানে নয়ান ॥
নব জবধর কিয়ে সৌদামিনী কোলে।
রসের ভ্রমরা কিয়ে কনক কমলে ॥
আধশিরে মোহন চূড়া আধশিরে বেণী।
শিখিকোরে দোলে জনু কালভুজঙ্গিনী ॥

পদটি শেষ হইতে না হইতেই বাবাজী মহাশয় একটি হুঙ্কারধ্বনি করতঃ ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বিশেষ অনুধাবন না করিলে শ্বাস আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে না। যেন একটি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। তখন নবদ্বীপদাদা প্রভৃতি চারিজনে পাশা-পাশি উপবেশনপূর্ব্বক আস্তে আস্তে ইঁহার দেহখানি কোলের উপর শোয়াইয়া রাখিলেন এবং শীতলদাদাকে পুনর্ব্বার ঐ গানটি গাহিতে বলিলেন। বালক শীতলদাস বাবাজী মহাশয়ের ঐরূপ অবস্থা দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল; সুতরাং আর গান করিতে সম্মত হইতেছে না দেখিয়া নবদ্বীপদাদা বাবাজী মহাশয়ের এই অবস্থা যে অতি আনন্দপ্রদ এই কথা উহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার পর বালক আবার গান করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ইনি অধৈর্য্যভাবে ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। গোপীনাথের বারান্দার পাথরগুলি অসমান। স্থানে স্থানে এমন অবস্থা যে কোন জায়গায় লাগিলে রক্তপাত না হইয়া যায় না। কৌশলী সঙ্গিগণ কৌশল করিয়াও বাবাজী মহাশয়কে স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। এমন কি ইঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া উঁহাদেরও ঐরূপ দশা হইতেছে। এদিকে রাত্র অধিক হওয়ায় গোপীনাথ জীউর শয়নের জন্য পূজারীগণ ব্যস্ত, কাজেই নবদ্বীপদাদার পরামর্শে সকলে একত্রিত হইয়া বাবাজী মহাশয়কে ধরাধরি করতঃ বাহিরে একটি বটবৃক্ষতলে লইয়া শয়ন করাইলেন। ইনি সে স্থানে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া আবিষ্টভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি নিজের জীবনের কতক-গুলি ইতিবৃত্ত অর্থাৎ 'আমি ঘরে একভাবে ছিলাম, তুমি নানারূপ চক্রান্ত করিয়া আমাকে ঘর ছাড়াইলে, আবার বহু দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করাইতেছ। তোমার রূপগুণে মুগ্ধ করাইয়া আমায় পাগল করিলে;

কিন্তু এখন ধরা দিতেছ না। মনে নাই—একদিন স্বপ্নে কত কি উপদেশ দিয়া আমাকে নীলাচলে আসিতে বলিলে? যখন আমি সাক্ষিগোপাল আসিলাম তখন আমার কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিলে। আবার যখন যে স্থানে থাকিতে বা যাইতে হইবে, সে সমস্তই সর্ব্বদার তরে আদেশ করিতেছ; কিন্তু একবারও সাক্ষাৎ দর্শন দিতেছ না কেন?" ইত্যাদি কত যে আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তখন আবিষ্ট ভাবে নূতন ধরণে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভিসার কীর্ত্তন ধরিলেন। আনন্দের অবধি নাই। সকলেই আনন্দে আত্মহারাভাবে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্র প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল। ইনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করতঃ নাম করিতে করিতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই 'গোরা-অভিসার' শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু নামক উড়িষ্যাবাসী জনৈক একনিষ্ঠ বাঙ্গালী যুবকের প্রতি বিশেষ কৃপাশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক যাহা স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল :—

নীলাচলে গোরারায় সঙ্গেতে নিতাই।
স্বরূপাদি রামরায় শ্রীবাস রামাই॥
মুরারি মুকুন্দ নরহরি গদাধর।
বাসুদেব বক্রেশ্বর আদি সহচর॥
সংকীর্ত্তনাবেশে রাত্রিদিন নাহি জানে।
কি ভাব উঠয়ে কভু না যায় কথনে॥
যখন থাকয়ে প্রভু কাশীমিশ্রাবাসে।
নিরন্তর মগ্ন রহে রাধাভাবাবেশে॥

স্বরূপ রামানন্দ দোঁহে দেখি সখীবোধে।
ললিতা বিশাখা বলি সদাই সম্বোধে ॥
কুটিলার ভয়ে যেন অন্তরে তরাস।
কদাপি নাহিক শুনি মুখে উচ্চভাষ ॥
শ্যামের বিচ্ছেদ সদা হিয়ামাঝে জাগে।
শ্যামগুণ আলাপন সদা ভাল লাগে ॥
হেন ভাবে সদা প্রভুর বিবশ হৃদয়।
শারদীয় ঋতু আসি হইল উদয় ॥
শারদীয় শুভ্র নিশায় চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রবাহিত সুরভিত বায়ু সুশীতল ॥
নেহারি দ্বিগুণ উঠে ভাবের তরঙ্গ।
অবশ হইল মনপ্রাণ সর্ব্ব-অঙ্গ ॥
দেখি সহচরগণ উৎকণ্ঠিত মন।
প্রভুর রক্ষণে সদা করে সুযতন ॥

—*—

(একদিন) অপরাহ্নে গোরা শশী, কাশীমিশ্রগৃহে বসি
নখে ক্ষিতি করয়ে লিখন।
বাম করে গণ্ড রাখি, অধোমুখী মনোদুখী,
অঝোরে ঝরয়ে দুনয়ন ॥
মলিন দেখিয়া মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কিসের লাগিয়া প্রভু কাঁদে।
দেখিয়া স্বরূপ আসি, আথে ব্যথে কাছে বসি,
হৃদয়ে ধৈরজ নাহি বাঁধে ॥
বস্ত্রাঞ্চলে নেত্রবারি, মুছাইয়া ধীরি ধীরি,
করে কর করিলা ধারণ।

মানি নর্ম্মসহচরী, দ্বিগুণ নয়নবারি,
উথলিল না যায় বারণ ॥
স্বরূপের গলা ধরি, কাঁদে প্রভু গৌরহরি,
ফুকরি ফুকরি মনোদুখে।
বাষ্পে কণ্ঠ হয় রুদ্ধ, বাক্য না নিঃসরে শুদ্ধ
নীরবে থাকয়ে অধোমুখে ॥

—*—

মনের বেদনা, কারে আমি কব, শুনলো ললিতা সই।
শ্যামের বিরহে, মনপ্রাণ দহে, কিসে তার দেখা পাই ॥
পূরব পীরিতি, তুমি জান সব, মম প্রাণবঁধু কালা।
কেমনে তাঁহারে, বারেক দেখিয়া, জুড়াই হিয়ার জ্বালা ॥
নব জলধর, রসে ঢর ঢর, বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ, অমূল্য রতন, মণি মানিকের মালা ॥
নয়ন সুচারু, সুভঙ্গিম ভুরু, তেরছ চাহনি তায়।
অপাঙ্গ নেহারি, কুলবতী নারী, তেজে কুললাজ ভয় ॥
সুরঙ্গ অধরে, সুভঙ্গ মুরলী, বরষে ললিত রব।
কামিনী কুরঙ্গ, শুনি অবশাঙ্গ, ধায় সেই দিকে সব ॥
কৃষ্ণ কেশদাম, অতি অনুপাম, তাহে বাঁধিয়াছে চূড়া।
মল্লিকা মালতী, ফুল নানাজাতি, চতুর্দ্দিকে আছে বেড়া ॥
তথি' পরে উচ্চ, চারু শিখিপুচ্ছ, ঈষত বামেতে হেলা।
নেহারি কামিনী, আকুল পরাণি, অন্তরে অনঙ্গ জ্বালা ॥
উন্নত নাসায়, গোরোচনা শোভে, ললাটে চন্দনবিন্দু।
সুনীল গগন, মাঝে শোভে জনু, অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু ॥

পরিসর উরে, কিবা শোভা করে, চারু কুসুমের দাম।
সেরূপ নেহারি, আপনা ধিক্কারি, মূরছিত হয় কাম ॥
রাতা উতপল, জিনি করতল, ভুজ করিকর জিনি।
চম্পকের কলি, জিনিয়া অঙ্গুলি, নখে কোটি শশী মানি ॥
কত না যতনে, রতন বলয়, পরিধান ভুজরাজে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি, শোভে সারি সারি, অতি সুললিত সাজে ॥
পরিহিত নব, সুপীত বসন, পীত উত্তরীয় গলে।
নীল জীমুতে, থির বিজুরি, শোভিছে গগন তলে ॥
রক্ত কোকনদ, জিনি পদযুগ, রতন নূপুর সাজে।
চঞ্চল চরণে, হেলিতে দুলিতে, মধুর মধুর বাজে ॥
জগমোহনিয়া, ত্রিভঙ্গিম ঠাম, কদম্বতলায় কানু।
রাধে রাধে রাধে, কিবা মন সাধে, ডাকিছে মোহন বেণু ॥
সে রূপ মাধুরি, আহা মরি মরি, জাগিছে হিয়ার মাঝে।
ওই শুন সখি, মোহন মুরলী, গহন বিপিনে বাজে ॥
আমি কুলবতী, নবীনা যুবতী, কানুর পীরিতি তায়।
হিয়ার মাঝারে, জাগে নিরন্তরে, কহ করি কি উপায় ॥
হাস পরিহাস, ললিত বিলাস, তেরছ চাহনি সই।
সঙরি সঙরি, ধৈরজ পাসরি, সদাই অধীরা হই ॥
শুন শুন ওই, ও গো প্রাণসই, শ্যামের বাঁশরীরব।
বাজিছে আবার, গৃহেতে এবার, না থাকিব একলব ॥
(আমি) চলিনু এখনি, যথা নীলমণি, বিপিনে বাঁশরী বায়।
বিলম্ব না সয়, কি হ'তে কি হয়, যাবি তোরা যদি আয় ॥
বলিতে বলিতে, প্রভু শচীসুতে, রাধাভাবে হই ভোর।
পাগলিনী প্রায়, দ্রুতবেগে ধায়, যথা শ্যাম চিতচোর ॥

আথে ব্যথে উঠি, তখনে স্বরূপ, আঙ্গিনা মাঝারে গিয়া।
দুবাহু পসারি, নেত্রে বহে বারি, রহে পথ আগুলিয়া ॥
সম্মুখে তাঁহারে দেখি গোরারায়, বলিছে বিনয়-বাণী।
কেন গো ললিতে, মম প্রাণাধিকে, নিষেধহ মোরে তুমি ॥
(আমার) মনের বেদন, তুমি সব জান, এখনি ভুলিলে সব।
আকুল পরাণি, শুনিনু যখনি, শ্যামের বাঁশরীরব ॥
তোমারে সতত, মম মনোমত, জানিতাম নিরন্তর ।
মম কর্ম্মফেরে, নিঠুরা হইলে, নহে কেন ভাবান্তর ॥
আমার পরাণ, করে আন চান, বিনে শ্যাম নীলমণি।
তাঁরে না দেখিয়া, পরাণ সংশয়, বাহিরায় হেন মানি ॥
এই বাক্য ধর, মম হিত কর, তোমা ঠাঁঞি ভিক্ষা চাই।
পথ ছাড়ি দেহ, নাহি নিষেধহ, শ্যামের সমীপে যাই ॥
যদি হিত চাহ, মোরে না বারহ, আর না বিলম্ব সয়।
নতুবা অচিরে, পরাণ আমারি, রহে কিবা নাহি রয় ॥

—*—

স্বরূপের হাতে ধরি প্রভু গোরা রায়।
কাকুতি মিনতি করি সকাতরে চায় ॥
কভু বা বিনয় করি বলে মৃদু বাণী।
কভু বা সাদরে বলে প্রিয়সখী মানি ॥
কভু ভয় কভু দুঃখ কভু করে ক্রোধ।
স্তব্ধ হই থাকে স্বরূপ না আইসে প্রবোধ ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে স্বরূপ বলয়।
কেমনে যাইবা ধনি নিকুঞ্জ নিলয় ॥

রাজার নন্দিনী তুমি কুলের কামিনী।
দিবসে কেমনে বনে যাবে একাকিনী ॥
তাহাতে ব্রজের লোক কি বলিবে শুনি।
পথি মাঝে আলুথালু যেন পাগলিনী ॥
বাতুলীর প্রায় দেখি সবে উপহাসি।
কলঙ্ক রটাবে নামে ভাল নাহি বাসি ॥
নবনীত সম তব তনু সুকোমল।
প্রখর আতপতাপে হইবে বিকল ॥
কমলের দল জিনি কোমল চরণে।
কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হবে ব্রজের বিপিনে ॥
শুনি স্বরূপের বাণী বলে গোরারায়।
কে না জানে ব্রজে শ্যামকলঙ্কিনী রাই ॥
যেদিন শ্যামের রূপে মজিয়াছে চিত।
তিলাঞ্জলি কুলে শীলে দিনু সুনিশ্চিত ॥
কি মোর কুলের লাজে কিবা লোকভয়।
এখনি যাইব চলি যথা শ্যামরায় ॥
কি মোর শরীরে কাজ এ শূন্য জীবনে।
কেমনে দেখিব আমি মুরলী বদনে ॥
বৃথা নিবারণ মোরে না কর ললিতে।
বুঝিতে নারহ কিবা দুখ মোর চিতে ॥
পায় ধরি বলি সই ছাড় মোর পথ।
বিলম্ব হইলে জান ঘটিবে বিপদ ॥

—*—

মনেতে চিন্তিয়া, যুকতি করিয়া, স্বরূপ বলিছে বাণী।
আছে এত বেলা, না হও উতলা, বলি শুন কমলিনী॥
জটিলা মুখরা, কুটিলা প্রখরা, এখনি লাগাবে দ্বন্দ্ব।
কত না গঞ্জনা, সহিবে যাতনা, কত না বলিবে মন্দ॥
শুনিতেই মাত্র, প্রভু গোরারায়, জটিলা কুটিলা বোল।
চুপে চুপে গিয়া, গৃহে প্রবেশিয়া, নেত্রে ঘন বহে লোর॥
বিধিরে ধিক্কারি, প্রভু গৌরহরি, বিলাপয়ে মনে মনে।
বিধি নিরবোধ, নাহি বোধাবোধ, ভাবাভাব নাহি জানে॥
শ্যাম রূপরাশি, হেরি দিবানিশি, মনে ছিল বড় সাধ।
মোরে নারীকুলে, জনম করায়া, তাহে পড়িয়াছে বাধ॥
তাহে কুলবতী, নবীনা যুবতী, শাশুড়ী ননদী জ্বালা।
কত ছলা করি, দিবস শর্ব্বরী, হেরিতে চিকণ কালা॥
এবারে মরিয়া, জনম লইব, ধরিব পুরুষ তনু।
যখনি ইচ্ছিব, তখনি দেখিব, যাইয়া নন্দের কানু॥
কাল ভুজঙ্গিনী, সম ননদিনী, শাশুড়ী ব্যাঘ্রীর পারা।
কতই ঝুরিব, অন্তরে অন্তরে, হেরিতে দুকূল চোরা॥
গুমরিয়া কাঁদি, মুঞি নিরবধি, ফুকারি কাঁদিতে নারি।
তুষানল যেন, মরম বেদনা, আর না সহিতে পারি॥
বলিতে বলিতে, হয় উচ্ছলিত, গোরার নয়ন-লোর।
অঝোরে ঝরয়, নিবারণ নয়, রাধাভাবে হয় ভোর॥

—o—

ভাবের আবেগ প্রভুর সহনে না যায়।
দণ্ডে দণ্ডে উঠিয়া আকাশপানে চায় ॥
মুহূর্ত্তেক শত যুগ সম করি মানি।
কতক্ষণে অস্তমিত হয় দিনমণি ॥
ভিতরে বাহিরে কোথা সোয়াথ না পায়।
কভু অধোমুখে বসি করে হায় হায় ॥
কভু পূর্ব্বমত বেগে উঠি চলি যায়।
বহু প্রবোধিয়া স্বরূপ প্রভুরে রহায় ॥
কভু উদ্ধর্দৃষ্টি রহে দুই কর্ণ ভেরী।
হৃদয় ভরিয়া শুনে শ্যামের বাঁশরী ॥
তিলে তিলে শতগুণ বাড়ে ব্যাকুলতা।
দেখিয়া স্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥
হেনকালে অস্তাচলে গত দিবাকর।
শারদ প্রদোষ আবির্ভাব ধরাপর ॥
সন্ধ্যা-আগমনে সব পারিষদগণ।
ক্রমে ক্রমে প্রভু পাশে কৈলা আগমন ॥
শ্রীপাদ নিতাই আর রায় রামানন্দ।
শ্রীবাসাদি করি যত ছিলা ভক্তবৃন্দ ॥
আর যত ভক্তগণ বাহিরে থাকিলা।
গম্ভীরাতে নিত্যানন্দ রামরায় গেলা ॥
প্রভুর দেখিয়া ভাব নিতাইর উল্লাস।
ধীরে ধীরে দুইজনে বৈসে প্রভু পাশ ॥
দোঁহারে দেখিয়া প্রভুর উৎকণ্ঠা বাড়য়।
অনঙ্গ মঞ্জরী বিশাখিকা ভাব হয় ॥

আগ্রহে পুছয় "তুমি ছিলা সব কতি।
পরাণ রাখহ মোর করিয়া মুকতি ॥
শ্যামের বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হয় তনু।
ত্বরায় মিলাহ মোরে নন্দসুত কানু ॥"
বলিতে বলিতে প্রভুর ভাব উথলিলা।
দুহুঁ গলা ধরি উচ্চে কাঁদিতে লাগিলা ॥
সখীকণ্ঠ ধরি কাঁদে আকুল অন্তরে।
কাঁহা মোর প্রাণসখা শ্যাম নটবরে ॥
কাঁহা মোর কানু বলি হয় কণ্ঠরোধ।
সখীগণে মিলি দেয় প্রভুরে প্রবোধ ॥

—*—

কিছুক্ষণ পরে, গোরার অন্তরে, অভিনব ভাবোদয়।
শ্যাম অভিসারে, যাইবে বিচারি, আনন্দে মাতিয়া রয় ॥
বরজ রমণী, রাই বিনোদিনী, সাজেতে সাজিতে আশ।
নিপুণা সখীরে, আদেশিছে ধীরে, মনে মনে মহোল্লাস ॥
ক্রন্দন সম্বরি, বলে গৌরহরি, সখীগণে সম্বোধিয়া।
শ্যাম অভিসারে, যাইব সত্বরে, দেহ মোরে সাজাইয়া ॥
যতন করিয়ে, বেণী বিনাইয়ে, দুলাইহ পৃষ্ঠদেশে।
মালতীর হারে, তাহে থরে থরে, সাজাইহ চৌপাশে ॥
কুঙ্কুমের বিন্দু, কপালে রচহ, সিন্দুরের বিন্দু পাশে।
চন্দনে চর্চ্চিতে, কর সর্ব্ব-অঙ্গ, পরাইহ শুভ্রবাসে ॥
কুসুম রচন, করি আভরণ, সাজাইহ যথাস্থানে।
(আমি) শ্যাম নটবরে, নবীন নাগরে, মিলিব নিকুঞ্জ বনে ॥
সুবাসিত বারি, সুবর্ণের ঝারি, ভরি লহ মোর সাথে।

তাম্বুলাদি যত, উপহার শত, লই চল অলক্ষিতে ॥
এতেক বলিয়া, চলিল উঠিয়া, অভিসারিকার ভাবে ।
(যেন) নিকুঞ্জভবনে, শ্যাম দরশনে, চলে রাই অনুরাগে ॥

কমলিনী ভাবে গোরা চলে অভিসারে ।
অলক্ষিতে সশঙ্কিতে গমন মন্থরে ॥
কাশীমিশ্র বাটী ছাড়ি সমুদ্রের পথে ।
অভিসারে যায় গোরা টোটাগোপীনাথে ॥
ভক্তগণ আপনারে সহচরী মানি ।
রাইয়ে ঘিরিয়ে চলে যেন বরজ-রমণী ॥
নিৰ্ম্মল শারদ নিশি ফুল্ল চন্দ্রোদয় ।
সুশীতল মন্দ মন্দ বহিছে মলয় ॥
পুষ্পোদ্যানে চতুর্দ্দিকে কুসুম বিকাশ ।
জ্যোৎস্নাময়ী ধরা যেন পরা শুভ্রবাস ॥
তপ্ত স্বর্ণবর্ণ তনু লিপ্ত মলয়জে ।
লাজে পূর্ণচন্দ্র বুঝি ত্যজে ধরামাঝে ॥
অঙ্গের ছটায় দীপ্তি পায় নিশাপতি ।
মন্থরে চলয়ে শ্যাম-অনুরাগে মাতি ॥
দক্ষিণে নিতাই চলে বামেতে স্বরূপ ।
গোরা-অভিসার করে অতি অপরূপ ॥
আগে আগে রামরায় বিশাখার ভাবে ।
নিকুঞ্জের পথে পথে যায় অনুরাগে ॥
চতুৰ্দ্দিকে ভক্তগণ মণ্ডলী করিয়া ।
শ্যামগুণ গাই চলে ধনিরে ঘেরিয়া ॥

সমুদ্রের পথে নাহি লোক গতাগতি।
চন্দ্রকরে বালুরাশি শোভাপায় অতি ॥
সমুদ্র নিরখি প্রভুর যমুনা স্মরণ।
তীরে বালু দেখি হয় পুলিন ভরম ॥
শ্যামগুণ গানে প্রভু আনন্দেতে মাতি।
কভু ধীরে ধীরে যায় কভু দ্রুতগতি ॥
নিতাই স্বরূপ গলে তুলি দুই কর।
বিবশ হইয়ে চলে গোরা নটবর ॥
রামরায়ে পুছে শুন বিশাখা সুন্দরী।
কত দূরে কুঞ্জবন কহ ত্বরা করি ॥
চলিতে না পারি আর অবশ সব্বাঙ্গ।
হেনকালে পায় গোরো শ্যাম-অঙ্গ গন্ধ ॥
ফিরিয়া পরাণি যেন পাইলা শরীরে।
চলিতে লাগিলা গোরা অতি ধীরে ধীরে ॥
চলিতে চলিতে গোপীনাথের সম্মুখে।
উপনীত গোরাচাঁদ হন মনসুখে ॥

ওই গোরারায় —

শ্রীরাধাভাবে, দাঁড়ায়ে গোপীনাথে চায়।
গিয়ে গোপীনাথ আগে, দেখে গোরা অনুরাগে,
ভাবাবেশে ওষ্ঠাধার ঈষত কাঁপয়।
প্রণয়মানেতে ভোলা, অপাঙ্গে নেহারে কালা,
নীরবে দাঁড়ায়ে থাকি কিছু না বলয় ॥
কভু দৈন্যে করে স্তুতি, বলে তুমি প্রাণপতি,
তোমা না দেখিলে মোর জীবন সংশয়—

বিষাদেতে গোরা রায় কভু করে হায় হায়,
মুই অভাগিনী নারী কিসে তোমা পাই ॥
নয়নে বহিছে ধারা, বলে কানু চিতচোরা,
(আমি) তব পদে ক্রীতদাসী রাখ রাঙ্গা পায় ।
আমি নারী পরবশ, তুমি মোর সরবস,
হিয়া মাঝে থুয়ে তোমা জীবন জুড়াই ॥
শ্যাম কলঙ্কের ডালি, মাথে করি বনমালী
যেন সদা হই শ্যাম-কলঙ্কিনী রাই ।
প্রেষ্ঠ মানি অনুরাগে, আলিঙ্গহ সবা আগে,
কিংবা অদর্শনে মম বিদর হৃদয় ॥
কিবা যথা তথা কুরু, তুমি লম্পটের গুরু,
তবু প্রাণনাথ মম অন্য কেহ নয় ।
গোপীনাথে গৌরহরি, আত্মসমর্পণ করি,
রাধাভাবে অনিমিখে দাঁড়াইয়া রয় ॥

—*—

টোটাগোপীনাথের সেবার ব্যবস্থা

একদিন বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিটা মঠে বসিয়া আছেন, এই সময় স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র পরস্পর নমস্কার ও প্রীতিসম্ভাষণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। হরিবল্লভবাবু যেন কি বলিবার ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু নানারূপ ভগবৎ-কথার আলোচনা হইতে থাকায় অবকাশ পাইতেছেন না! কিছু-পরে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এই যে মঠের অতি সুন্দর সেবা, এই সেবা কিরূপে চলে?"

বাবাজী। বাবা। যাঁর সেবা তিনিই চালান।

হরি। সে ত সত্য, তবুও একটা উপলক্ষ্য আছে ত ?

বাবাজী। একমাত্র ভিক্ষাদ্বারাই সমস্তই চলে।

হরি। যদি কোনদিন ভিক্ষা না মিলে অথচ বহুমূর্ত্তি বৈষ্ণব উপস্থিত হন, তবে কিরূপ ব্যবস্থা হয় ?

বাবাজী। ইচ্ছাময় প্রভু যখন যাহাকে যে স্থানে আনিবেন, পূর্ব্ব হইতেই তাহার আহার-ব্যবহারাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখুন, যখন আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন কোন্ বুদ্ধি বা বিদ্যার কৌশলে আহারাদির সংগ্রহ হইয়াছিল ? আবার যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন কে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছিল ? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোহসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥

হরি। কথা সত্য বটে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস চাই। আপনার যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, সকলের সেরূপ হওয়া ত আর সহজ কথা নয় !

বাবাজী। বাবা ! তিনি অন্তর্য্যামী, বিশ্বাস হইলেই যে দিবেন আর বিশ্বাস না হইলে দিবেন না, এরূপ কোন কথা নাই। ভালমন্দ যে কেহই হউক না কেন তিনি সকলকেই আহার দিয়া থাকেন। তবে বিশ্বাসীর পক্ষে সুগম বা সুখকর, অবিশ্বাসীর পক্ষে একটু কষ্টকর।

হরি। আচ্ছা, ধনের সার্থকতা কি ?

বাবাজী। সদ্ব্যয় করা, দুঃখীর দুঃখ মোচন করা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করা এবং ভজনশীল ব্যক্তির ভজনানুকূল্য প্রভৃতিই অর্থের সার্থকতা।

হরি। বেশ কথা ! এই আশ্রমে এত যে বৈষ্ণবমূর্ত্তি ভজন করিতেছেন, কোনও অর্থবান্ ব্যক্তি যদি ইঁহাদের কিঞ্চিৎ ভজনানুকূল্য করেন অর্থাৎ যাহাতে ইঁহাদের আহারাদির জন্য কোনওরূপ চিন্তা করিতে

বা উদ্বেগ পাইতে না হয়, এইরূপ মাসিক কিছু বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি? মোট কথা—বাবা! প্রভুর কৃপায় আমার যথেষ্ট অর্থ রহিয়াছে, আমার ইচ্ছা—এই স্থানে কিছু মাসিক বন্ধানী করিয়া এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদিগের ভজনের কিছু সাহায্য করি।

বাবাজী। দেখুন বাবা! আপনাকে প্রভু অর্থ দিয়াছেন। আপনার মনে এইরূপ বাসনার উদয় হওয়া অতিশয় আনন্দের বিষয়, তবে একটি কথা—আপনি সুবিজ্ঞ লোক, যে কার্য্য করিতে হয় তাহার ভালমন্দ ফলাফল বিচার করিয়া কার্য্য করা উচিত। আপনি যে ভাবে এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হইবার সম্ভাবনা। প্রথম কারণ—যে দিন হইতে আপনি মাসিক বন্দোবস্ত করিবেন সেই দিন হইতেই আপনি তাহাদের উপাস্য দেবতা হইবেন। মাসান্তে ইহারা স্বীয় অভীষ্টদেবকে না ভাবিয়া আপনাকেই চিন্তা করিবে। একদিন বিলম্ব হইলে আপনার উপর কল্পনা আনিবে। দ্বিতীয় দিন মনে হইবে—বাবু কি রকম ভদ্র লোক, মাসকাবারি হইয়া গেল, কৈ আজ পর্য্যন্ত টাকা দিলেন না! কিরূপভাবে ঠাকুরসেবা চলিবে? এইরূপভাবে যতই অভাব হইবে ততই আপনার উপর বৈষ্ণবের কটাক্ষ পড়িবে। দ্বিতীয় কারণ—ইহাদের মনে সঙ্কোচভাব জন্মিবে অর্থাৎ বাবু যে টাকা মাসিক দিয়া থাকেন, সেই টাকার মধ্যে যাবতীয় খরচ চালাইতে হইবে, ইহাতে বৈষ্ণব-সেবা হউক চাই নাই হউক। তবেই দেখুন, আপনার অর্থসাহায্য দ্বারা ভজনের আনুকূল্য হইল, না প্রাতিকূল্য হইল? আর এই আকাশবৃত্তিতে ইচ্ছা করিয়া হউক অনিচ্ছায় হউক ভগবৎ-নির্ভরতা আসিবে। আয়ের নির্দ্দিষ্ট বা পরিমাণ থাকিলেই ব্যয়ের সঙ্কোচ আসিবে।

হরি। এ কথা ত সত্য, তবে কিরূপভাবে অর্থসাহায্য করিলে উভয়কুল রক্ষা পাইতে পারে?

বাবাজী। যখন ইচ্ছা হইবে সেই সময় সাহায্য করা বরং ভাল। সাময়িক দানে কাহারও অনিষ্ট হইবার আশংকা নাই।

হরি। এ কথা না হয় জীবিতকাল পর্য্যন্ত সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু যাহাতে চিরদিন একটি কার্য্য চলিতে পারে সেরূপ কার্য্য কি হইতে পারে?

বাবাজী। আচ্ছা, তাহা হইলে এস্থানে কিছু না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদত্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর টোটাগোপীনাথ জীউর সেবার কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ভাল হয়।

শুনিয়া হরিবল্লভবাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "বাবা! টোটাগোপীনাথের সেবার জন্য প্রতিদিন দুই টাকা করিয়া বন্দোবস্ত করা হউক; কিন্তু এই মঠের অন্য আরও কিছু আশা রহিল। যদি কৃপা করিয়া অন্য কোনও আদেশ করেন তবে বড়ই সুখী হইব।" বাবাজী মহাশয় একটু উদাস ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, সময়ান্তরে নিতাই যাহা বলান তাহাই হইবে।" শুনিয়া হরিবল্লভবাবু হৃষ্ট-বিষাদিতভাবে বাসায় গমন করিলেন। ইনিও নিজ নিত্যকৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই হইতে হরিবল্লভবাবু টোটাগোপীনাথজীউর সেবার জন্য প্রত্যহ দুইটি করিয়া টাকা বন্ধানী করিয়া দিলেন!

আনন্দ মিত্রের সহিত মিলন

এইরূপ পরমানন্দে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপদাদা কটকে গিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন

অপরাহ্ন সময় তিনি এবং জনৈক ভদ্রলোক পুরীধামে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটি ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর বলিলেন, "আজ্ঞে আমি আপনার নিকট একটি প্রার্থনা জানাইতে ইচ্ছা করি।"

বাবাজী। স্বচ্ছন্দে বাবা! প্রাণ খুলিয়া বল।

ভদ্র। আজ্ঞে আপনাকে একবার কটকে লইয়া যাইবার জন্য উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে পাঠাইয়াছেন। একবার অনুগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে।

বাবাজী। আনন্দ মিত্র কে? আমরা যখন কটকে গিয়াছিলাম তখন কি তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই?

ভদ্র। আজ্ঞে তিনি কে, আমি আর কি পরিচয় দিব? তবে শাস্ত্রে জগাই মাধাই বা রত্নাকর প্রভৃতির নাম যাহা শুনা যায়, তাহাদের সহিত তুলনায় কোনও অংশে তিনি কম ছিলেন না, তবে এই নবদ্বীপদাদার কৃপায় তাঁহার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি; তাই দাদার কাছে আপনার কথা শুনিয়া আপনাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

বাবাজী। কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল? একবার আমূল বৃত্তান্ত বল দেখি!

ভদ্র। সে এক মহাভারত, শুনিতে অনেক সময় লাগিবে।

বাবাজী। কোনও চিন্তা নাই, তুমি নিঃসঙ্কোচে যথাযথ বৃত্তান্ত সকল আমূল বর্ণনা কর।

ভদ্র। আনন্দমিত্র অনুমান ৩৫।৩৬ বর্ষ বয়স্ক সুন্দর গৌরবর্ণ যুবা-পুরুষ। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস রঘুনাথপুর। ওকালতী পাস করিয়া কটকের কাঠগড়াসাহিতে বাড়ী করিয়াছেন। প্রায় সর্ব্বদাই কটকে থাকেন। কটকের মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বড়লোক। ওকালতীতেও

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এমন কি এক এক সময় বড় বড় উকীলগণের অবোধ্য বিষয় সকল অতি সহজে উদ্ধার করিতে আনন্দবাবুর ন্যায় আর কেহই নাই। আনন্দবাবু নামমাত্র হিন্দু; কিন্তু ধর্ম্ম বা মতামত সম্বন্ধে হিন্দুর সহিত কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। আহার সম্বন্ধে চরম-পন্থী—কিছুতেই বিমুখ নহেন—জাতিভেদটা কুসংস্কার বলিয়া ধারণা। প্রতিমাপূজা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে কোন সারবত্তা আছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস নাই। তবে তাঁহার গুণের মধ্যে হৃদয়টি কোমল; পরের দুঃখ দেখিলে সময়ে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু আবার সঙ্গপ্রভাবে সেই ভাবটাকে অনেক সময় হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। আনন্দবাবু ঘোর বিলাসী। নিজের মনোবৃত্তি-অনুযায়ী সুখস্বচ্ছন্দতা ও আহারবিহারাদি দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন এবং মনের আনন্দবিধানই মনুষ্য-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন।

একদিন বেলা অনুমান দশটা। আনন্দবাবু কাছারির পোষাক পরিতেছেন, অমন সময় এই মহাত্মা পাগলপারা আলুথালু মলিন বেশে করতাল বাজাইয়া সহাস্য বদনে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম করিতে করিতে আনন্দবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আনন্দবাবুর ভৃত্যগণ তাড়াতাড়ি তাহাদের বাবুর রুচিবিগর্হিত ওরূপ কার্য্য করিতে ইঁহাকে নিষেধ করিল। কিন্তু ইঁনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আনন্দিত মনে নাম করিতেছেন। আনন্দবাবু বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন' "এখানে কি চা'স?" ইঁহার খেয়াল নাই—আপন মনেই নাম করিতেছেন। আনন্দ-বাবু একটু বিরক্ত হইয়া কর্কশভাবে বলিলেন, "এই পাগলা! কথা

শুনিছিস্ না, এখানে কি চা'স্ ?" এইবার যেন ইঁহার কানে কথাটা প্রবেশ করিল—ইনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কিছুই না।"

আনন্দ। তবে কি করিতে আসিয়াছিস্ ?

ইনি। জানি না।

আনন্দবাবু তখন চারিটি পয়সা দিয়া ইঁহাকে বিদায় করিবার জন্য একজন ভৃত্যকে আদেশ করতঃ বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। ভৃত্য চারিটি পয়সা লইয়া ইঁহাকে দিতে গেলে ইনি তাহা না নিয়া পূর্ব্ববৎ নাম করিতে লাগিলেন। আনন্দবাবু তখন বৈঠকখানা হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে! পয়সা দিয়া উহাকে বিদায় করিয়া দে না রে!" ভৃত্য অতি ত্রস্তভাবে বাবুর নিকট গমন করিয়া বলিল, "বাবু! ও যে পয়সা নেয় না, যেতেও চায় না।" বাবু তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "বেটা বদমায়েস! এখানে বদমায়েসি পেয়েছো, দাঁড়া আমি যাচ্ছি।" ভৃত্য তাড়াতাড়ি আসিয়া ইঁহাকে বলিল, "হ্যাঁরে! বাবু আস্‌ছে, পালা, না হয় মার খাবি।" ইনি সে কথায় একটু হাসিয়া আর একটু উচ্চ কণ্ঠে নাম করিতে লাগিলেন। আনন্দবাবু তখন কাছারি যাইবার জন্য বাহিরে আসিয়া ইঁহাকে বলিলেন, "হ্যাঁরে তুই কি চাস ?" ইনি কোনও কথা না বলিয়া কেবল প্রেমময় দৃষ্টিতে আনন্দবাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আনন্দবাবু—ইনি যে পাগল ইহাই দৃঢ় ধারণা করিয়া একটু মৃদুভাবে বলিলেন, "এই পয়সা নিয়ে চ'লে যা, কেন মিছামিছি জ্বালাতন করছিস্ ?" ইনি তাহাতেও যখন কোনও কথা কহিলেন না, তখন আনন্দবাবু বিশেষ বিরক্ত হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "হ্যাঁরে চাবুক নিয়ে আয় ত! বেটার বদ্‌মায়েসি ভেঙ্গে দিই।" বলিবামাত্র ভৃত্য কোচম্যানের নিকট হইতে চাবুক আনিয়া হাজির করিল; কিন্তু ইনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত না হইয়া যেন আরও আনন্দে

মাতিয়া উঠিলেন। ইঁহার চক্ষু হইতে যেন কি এক আনন্দময় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। বদন-মণ্ডল পুলকে উদ্ভাসিত হইয়া ওষ্ঠাধর প্রীতিপূর্ণ মধুর হাস্যে নৃত্য করিতে লাগিল। আনন্দবাবু কিন্তু বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। তিনি ইঁহাকে যেরূপ নগণ্য ভিক্ষুক মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিমার্জ্জিত বিচারবুদ্ধি যেন সেরূপ বলিতে চাহে না। তাঁহার বিবেক যেন ইঁহাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে বলিল। তাই তিনি একটু কোমল ভাষায় বলিলেন—"তুমি কি চাও বল দেখি?" ইনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমায় কিছু খেতে দাও, আমি খাব।"

আনন্দ। কি খাবে?

ইনি। মুড়ি খাব।

আনন্দবাবু চারিটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই পয়সা নিয়া যাও, খাও গে।"

ইনি। পয়সা কি হবে! পয়সা কি খাওয়া যায়?

আনন্দবাবু বিস্মিতভাবে একটি সিকি ইঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নেও, মুড়ি কিনে খাও গে।"

ইনি সেই রজতখণ্ডে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। আনন্দবাবু অনিমেষনয়নে ইঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইনিও অদৃশ্য হইলেন, আনন্দবাবুও কাছারি চলিয়া গেলেন। কাছারি পেঁছান পর্য্যন্ত আনন্দবাবুর হৃদয়ে ইঁহারই হাবভাব ব্যবহারাদির বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। ক্রমে কাছারিতে পেঁছিয়া নানারূপ বিষয়-ব্যাপারে সব ভুলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার দুইদিন পরে বেলা আটটার সময় আবার পূর্ব্ববৎ—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম করিতে করিতে ইনি গিয়া আনন্দবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

আনন্দবাবু বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া মকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতেছেন, ইঁহার কণ্ঠ শুনিবামাত্র যেন কেমন হইয়া গেলেন। একজন ভৃত্যকে বলিলেন,—"ঐ পাগলটাকে ডাকিয়া আন্ ত?" ভৃত্য হুকুমমত ইঁহাকে ডাকিয়া আনিল। সেদিন ইঁহার বেশ কিছু অন্য রকম। নাসিকায় ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হরিমন্দির তিলক, চাদরখানা গায়ে বাঁধা। আনন্দবাবু ইঁহাকে দেখিবামাত্র মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে! আজ আবার কি মনে ক'রে? আজ যে আবার অন্যরূপ ভব্য সভ্য বেশ দেখ্‌ছি। গলায় মালা, কপালে তিলক, দেখে ত বৈরাগী বলে বোধ হয়! তা কেন এলে বল দেখি?"

ইনি নিরুত্তর; কেবল মৃদু মৃদু হাসি ও সরলতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দ বাবুর হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন। আনন্দবাবু কোনও উত্তর না পাইয়া বলিলেন,—"কি হে! কিছু জবাব নাই যে? এস, এগিয়ে এস!"

ইনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আনন্দবাবুর টেবিলের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দবাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ঐ চৌকীতে বোস।" ইনি বসিলেন। আনন্দবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে! ব্যাপারটা কি বল দেখি?" ইনি নিরুত্তর।

আনন্দ। তোমার নাম কি?

ইনি। (মৃদু হাসিয়া) অনেকে নবদ্বীপ দাস বলিয়া ডাকে।

আনন্দ। কি মনে করে এখানে এসেছ?

নবদ্বীপ। আমায় কিছু খেতে দাও।

আনন্দ। কি খাবে?

নবদ্বীপ। মুড়ি খাব।

আনন্দ। আচ্ছা, তা না হয় দিলাম। তুমি এখানে কোথায় থাক?

নবদ্বীপ। আমি কাঙ্গাল, আমার আবার থাকার নির্দ্দিষ্টতা কি? যে দিন যে স্থানে আশ্রয় পাই সেই দিন সেই স্থানে।

আনন্দ। খাও দাও কোথায়?

নবদ্বীপ। যেদিন যেখানে জোটে।

আনন্দবাবু একটি টাকা ইঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নেও, মুড়ি খেতে চাইছিলে খাও গে।"

নবদ্বীপ। তা ত খাব, তুমি ত দিতে পার্‌লে না। আমি চাইছি মুড়ি, তুমি দিচ্ছ টাকা। সংসারটা এমনি বটে, এক চাই আর পাই!

বলিয়া হাসিতে হাসিতে চৌকী হইতে উঠিলেন। আনন্দবাবু একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—"আ রে শোন শোন বোসো আমিই না হয় মুড়ি আনিয়ে দিচ্ছি।"

নবদ্বীপ। আচ্ছা, আর একদিন হবে।

বলিয়া পূর্ব্ববৎ নাম করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। টাকাটি সেইখানেই পড়িয়া রহিল। আনন্দবাবু বিস্মিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ লোকটা কিরূপ! অবস্থা ভিক্ষুকের মতন; কিন্তু টাকা পয়সা নেয় না। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম—পাগল, এখন কথাবার্ত্তায় কোনরূপ মস্তিষ্কের বিকার ত বোঝা যাইতেছে না! বৈষ্ণবের বেশ; কিন্তু বৈষ্ণবগণ যেমন অশিক্ষিত অসভ্য থাকে এ ত সেরূপ নহে। আমার কাছেই বা আসে কেন? আমি ত কোন ধর্ম্মের ধার ধারি না; তবে আমার কাছে কি প্রত্যাশায় আসে? জিজ্ঞাসা করিলে কেবল বলে, 'কিছু খেতে দাও।' সেও এক মুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। এই দুই দিন এলো, ঠিক একই কথা! সেও খেলে না, আমিও দিলাম না।

এইরূপ নানা কথা আন্দোলন করিতেছেন, এই সময় টং টং করিয়া

ঘড়িতে নয়টা বাজিল ; কাজেই অন্য ব্যাপারে মন দিলেন। তিন চার দিন যায়, একদিন অপরাহ্ন অনুমান ছয়টার সময় আনন্দবাবু কাছারি হইতে আসিয়া একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া সট্‌কায় তামাক খাইতেছেন, অল্পবয়স্কা একটি বালিকা নিকটে খেলা করিতেছে, এই সময়ে নবদ্বীপদাস পূর্ব্ববৎ করতাল বাজাইয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" এই নাম করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ আনন্দবাবু ইঁহাকে দেখিবামাত্রই অতিশয় ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, এস এস ! তোমাকেই আমি খুঁজিতেছিলাম।" যেমন কোনও বস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ প্রাপ্ত হইলে অপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাণের ব্যগ্রতার সহিত প্রাপ্তির হর্ষ মিশ্রিত হইয়া একটা আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠে, আনন্দবাবুর তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে ঠিক সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। ভৃত্যকে আর একখানা চেয়ার আনিতে আদেশ করিবামাত্র সে চেয়ার লইয়া আসিলে ইনি তাহাতে বসিলেন।

আনন্দ। তবে ঠাকুর ! আজ কি মনে করিয়া বল দেখি ?

নবদ্বীপ। সে দিন ব'লে গিয়েছিলাম, তাই আজ মুড়ি খেতে এসেছি।

আনন্দ। মুড়ি কেন, অন্য কিছু খাবার খাও, আনিয়ে দিই।

নবদ্বীপ। না না, মুড়ি খাব। দিতে পার ত বল, না হয় চলে যাই।

আনন্দ। আচ্ছা, তাই আনিয়ে দিচ্ছি। হ্যারে মুড়ি নিয়ে আয় ত রে !

আদেশ পাইয়া ভৃত্যটি তাড়াতাড়ি মুড়ি আনিতে গেল। এদিকে আনন্দবাবু নবদ্বীপদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি রোজ রোজ আমার নিকট আস কেন ?

নবদ্বীপ। তুমি বলিতে পার, রোজ রোজ তুমি কাছারি যাও কেন ?

আনন্দবাবু নবদ্বীপদাসের এই কথায় একটু আশ্চর্য্যান্বিত এবং ঈষৎ

বিরক্তও হইলেন, কারণ তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ সুশিক্ষিত ধনী ব্যক্তিকে সামান্য একটা পথের কাঙ্গাল যেরূপ নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করিল, ইহাই আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা। আনন্দবাবুর ধারণা—তিনি একজন বক্তা, সুমীমাংসক ও শিক্ষিত। আজ পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার এই ধারণাকে পুষ্ট করিয়াছে। যে কেহই তাঁহার সহিত কোন বিষয় লইয়া বিচার করিতে আসে, সকলেই প্রায় তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট পরাভূত। যে আনন্দবাবু অল্প বয়সে ওকালতী বিষয়ে বহু পক্ককেশ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তিকে এজলাসে নাস্তানাবুদ করিয়া নিজ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন, তিনি আজ একটা ভিক্ষুকের প্রশ্নের উত্তর দিতে থতমত খাইলেন। এই সমস্ত অহঙ্কারের মূলে আঘাত পড়িবার দরুণই ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "আমি যে জন্য কাছারিতে যাই, তুমিও কি ঠিক সেই জন্য আমার নিকট আস ?"

নবদ্বীপ। তুমি লেখাপড়া জান, আমি ত মূর্খ। তোমাদের বিজ্ঞান শাস্ত্রে না বলে—সবই না কি এক নিয়মের অধীন। সেটা যদি সত্য হয় তবে এটাই বা হবে না কেন ?

আনন্দ। তুমি কি বলিতেছ আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।

নবদ্বীপ। তোমরা হয় ত ঈশ্বর মান না ; কিন্তু নিয়ম মান, বিজ্ঞান মান। বিজ্ঞানের মতেই ত বলিয়া থাক, যে নিয়মে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, প্রভৃতি ঘুরছে বা আপন আপন স্থানে স্থির থাক্‌ছে, ঠিক সেই নিয়মেই গাছের পাতা মাটিতে খ'সে পড়্‌ছে।

আনন্দ। এ ত ঠিক কথা, ইহাকে বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

নবদ্বীপ। তা যাই হউক, মনে কর তুমি না হয় একটা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ; কারণ তুমি অত বড় উকীল—কত টাকা পয়সা রোজগার কর—তোমার এত বড় বাড়ী—কত গাড়ীঘোড়া, কত চাকরচাকরাণী তোমার

দাপে খাট্‌ছে ; কাজেই তুমি না হয় তেমনি মস্ত বড়, আর আমি ভিক্ষুক, পেটের দায়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াই—আমি একটি ছোট গাছের পাতা ; কিন্তু আমরা যে দুজনেই সংসারে ঘুরছি, এর কারণ কি এক নয় ?

আনন্দবাবুর মুখখানি আরক্তিম হইল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে নবদ্বীপদাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “আমি ত কাছারিতে যাই টাকার জন্য, তুমিও কি আমার কাছে সেই জন্য আস ?”

নবদ্বীপ। হয় তুমি আমাকে ঠকাবার জন্য এ কথাটি বলছ, না হয় তুমি তোমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পার নাই।

আনন্দ। কেন ? টাকা ছাড়া কাছারিতে যাবার আর কি কারণ আছে ?

নবদ্বীপ। টাকার জন্যই যদি যাও তবে টাকা পেয়েই চুপ করে ব’সে থাক না কেন ?

আনন্দ। টাকা রোজগার করি অভাব পূরণের জন্য।

নবদ্বীপ। তা হলেই দেখ—টাকার জন্য কাছারিতে যাও না, অভাব পূরণের জন্য যাও !

আনন্দ। বেশ ; তাই না হয় হল।

নবদ্বীপ। এই অভাবটা কি ?

আনন্দ। খাওয়া দাওয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা।

নবদ্বীপ। এই খাওয়া-পরা, খাওয়ান-পরানই কি শেষ, না এর মূলে আরও কিছু আছে ?

আনন্দ। আর কি থাক্‌বে !

নবদ্বীপ। বেশ করে ভেবে দেখ, আমরা খাই পরি বা স্ত্রীপুত্রাদিকে খাওয়াই পরাই কেন ?

আনন্দ। তাতে আমার সুখ হবে তাই করি।

নবদ্বীপ ! তা হ’লেই ভেবে দেখ ভাই ! তুমি যে কিছু কার্য্য কর কিসের জন্য ?

আনন্দ। তা সুখের জন্যই বটে।

নবদ্বীপ। আমিও আমার সুখের জন্য তোমার নিকট আসি। তোমার নাম আনন্দচন্দ্র শুনে আনন্দের একটু কিরণ পাবার জন্য আসি।

এই সময় ভৃত্য মুড়ি লইয়া আসিলে আনন্দবাবু বলিলেন, "এই নেও তোমার মুড়ি এসেছে।" নবদ্বীপদাস আনন্দে উৎফুল্লভাবে ব্যগ্রতা সহকারে মুড়ির পাত্রটি হাতে লইয়া বলিলেন, "বা! বেশ মুড়ি হয়েছে। দেখ ভাই! আমার একটা গোঁড়ামি আছে। সেটা হয়ত তোমার ভাল লাগবে না; কিন্তু কি করি, সংস্কার বা স্বভাব ছাড়া বড়ই মুস্কিল! আমার একটি তুলসীপত্র চাই, কারণ এই মুড়িগুলি ভোগ না দিলে আমার খেয়ে সুখ হবে না। বোধ হয় এখানে পাওয়া যাবে না।

আনন্দ। তা পাওয়া যাবে না কেন? হ্যারে! তুলসীপাতা নিয়ে আয় ত?

বলিবামাত্র ভৃত্য তুলসীপত্র আনিতে গেল। আনন্দবাবু চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া নবদ্বীপ দাস বলিলেন, "কি ভাই! তুমি কি ভাবছ? আমার এই ভগবানকে নিবেদনটি কুসংস্কার মাত্র, এই না?"

আনন্দ। ঠিক ঐ কথাটা না হলেও অনেকটা ঐরূপই বটে; কারণ যাঁর অস্তিত্ব আমরা ধারণা করতে পারি না বা অস্তিত্ব প্রমাণ করা পর্য্যন্ত আমাদের দুঃসাধ্য, তাঁকে আবার আবেদন-নিবেদন করা কি জন্য?

নবদ্বীপ। অতি সত্য কথা; প্রকৃতই তাঁর অস্তিত্ব নির্ণয় করা আমাদের দ্বারা হয় না।

আনন্দ। তবে আবার এইসব করা কেন?

নবদ্বীপ। আচ্ছা ভাই! তোমার পিতা কি বর্ত্তমান?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। তাঁর কথা তোমার বেশ মনে আছে?

আনন্দ। আছে বৈ কি।

নবদ্বীপ। তোমার পিতামহকে তুমি দেখেছ কি?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। প্রপিতামহকেও বোধ হয় দেখ নি?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। তাঁদের বিষয় তুমি কি বিশ্বাস কর?

আনন্দ। কিরূপ বিশ্বাস?

নবদ্বীপ। এই একদিন তাঁরা জীবিত ছিলেন—এক সময় তোমার মত পয়সা রোজগার করতেন। তোমার প্রপিতামহের পুত্র তোমার পিতামহ, পিতামহের পুত্র তোমার পিতা, আবার তোমার পিতার পুত্র তুমি ইত্যাদি।

আনন্দ। হ্যাঁ, তা বিশ্বাস করি বই কি!

নবদ্বীপ। কেন, কোন্ যুক্তি বা প্রমাণ অনুসারে তোমার প্রপিতামহের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?

আনন্দ। (একটু চিন্তা করিয়া) আমি নিজে এবং এই চারিদিকের মানবসমাজই এই বিশ্বাসের প্রমাণ।

নবদ্বীপ। তা হ'লে কোনও অপ্রত্যক্ষ বিষয় অন্য প্রত্যক্ষ বিষয় দেখে বিশ্বাস করা যেতে পারে, এটা স্বীকার কর?

আনন্দ। হ্যাঁ, তা করতে হয় বৈ কি!

নবদ্বীপ। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে ঐটা কর না বা করাটাকে কুসংস্কার মনে কর।

আনন্দ। কেন? কিসে?

নবদ্বীপ। নয় ত কি? অপ্রত্যক্ষ তোমার প্রপিতামহ বা পিতামহের কথা প্রত্যক্ষ মানবসমাজ এবং তোমার নিজেকে দেখে বিশ্বাস

করতে পার, আর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ, অধঃ প্রভৃতি যে দিকে চাইবে, সেই দিকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ আনন্দময়ের প্রকাশ দেখেও তাঁকে বিশ্বাস কর না? প্রত্যক্ষবাদ স্বীকার করতে হ'লে সর্ব্বত্রই স্বীকার করা দরকার। কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হ'তে পারে কি? এই যে স্থাবর-জঙ্গল, পশুপক্ষী, গিরিনদী, আকাশপাতাল, গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য্য, তরুলতা পত্রপুষ্প প্রভৃতি পরিবেষ্টিত বৈচিত্র্যময় অপূর্ব্ব মহিমান্বিত এই জগৎ, এর সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানতে পার না কেন? কেউ মানলেও সেটা কুসংস্কার বলে মনে হয় কেন?

আনন্দবাবু আলবোলার নলটি মুখে দিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ইঁহার কথা শুনিতেছেন, আর ক্রমে যেন কি রকম অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইঁহাকে সামান্য নির্বোধ ভিক্ষুকের পরিবর্ত্তে সুশিক্ষিত জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভৃত্য তুলসীপত্র লইয়া আসিলে নবদ্বীপদাস তাহার হাত হইতে তুলসী লইয়া মুড়িগুলি ভোগ দিতে লাগিলেন।

আনন্দবাবু কিছুকাল পরে বলিলেন, "আচ্ছা তোমরা যখনই কিছু খাও, তখনই কি ভগবান্‌কে ভোগ দিয়া খাও?"

নবদ্বীপ। হ্যাঁ! আমার গুরুদেবের তাই আদেশ। সাধ্যমত ত'ার আদেশ পালনের চেষ্টা করি; তিনি বলেন, "অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্ বিষ্ণোরনিবেদিতম্। অনিবেদিত বস্তু গ্রহণে অপরাধ হয়।"

আনন্দ। আচ্ছা এরূপ করবার উদ্দেশ্য কি?

নবদ্বীপ। ভাই! তুমি সুশিক্ষিত এবং আধুনিক সভ্যতার পক্ষপাতী। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা কি আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ নয়? আমরা সংসারে সকল বিষয়ে—এমন কি নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, চাকরবাকরের নিকট হ'তেও কোন সাহায্য পেলে অমনি হাতে হাত দিয়ে 'থ্যাংক ইউ'

ব'লে কৃতজ্ঞতা-পাশ হতে নিজেকে মুক্ত করে থাকি। আর যাঁর দয়ায় মাতৃগর্ভে আহার পেয়েছিলাম, আর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র যে দয়াময় দয়া ক'রে আমাদের আহারের জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার ক'রে দিয়েছেন, আবার প্রতিদিন জীবনের কত প্রকার উত্থান পতনের মধ্যে নিরন্তর যাঁর কৃপায় এ দেহ ধারণ করতে সমর্থ হচ্ছি, যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল, শীতে আতপ, গ্রীষ্মে বাতাস যোগাচ্ছেন, তাঁর প্রতি অন্ততঃ প্রতিদিন আহারের সময় একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা কি বিশেষ বর্ব্বরতা বা পাগ্‌লামি হ'ল ? ভাই ! একটু চোখ বুজে ভেবে দেখ, তিনি না দিলে কেহ কিছু দিতে বা খেতে পারে কি ? এই ত কদিন আমি তোমার নিকট দু'টি মুড়ি খেতে চাইছি, তুমি দিতে পারলে কি ? আমরা হয় ত মনে করব, তোমার মত একজন বড়লোক মনে করলে আমার মত ভিখারীকে মুড়ি কেন যা ইচ্ছা খাওয়াতে পারে ; কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল। ভগবান্ না দিলে তুমি কোন্ ছার ! একজন সম্রাট্ও কাউকে এক কপর্দ্দক দিতে সমর্থ হন না। আজ তিনি দিয়েছেন, তাই তাঁর দয়ার দান তাঁকে সমর্পণ ক'রে তাঁর প্রসাদরূপে গ্রহণ করা কি মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য নয় ?

আনন্দ। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারই কি তোমাদের ভোগ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য।

নবদ্বীপ। কোনও বিষয় জান্‌তে বা বুঝতে হ'লে সে বিষয় তুমি গ্রহণ কর আর নাই কর, তাহাতে কিছু আসে যায় না ; কিন্তু একটু স্থির-চিত্তে সে বিষয়টির মর্ম্ম গ্রহণ করা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি আমার কিছু জানতে বা বুঝতে ইচ্ছা হয়, আর প্রথম থেকেই যদি সে বিষয়ে অশ্রদ্ধাবান্ হয়ে সেটা কিছু নয় এই সিদ্ধান্ত মনে স্থির করি, তবে সে ধর্ম্মমতে যতই সত্যতা থাক্ না কেন—সে মত যতই

বিশুদ্ধ হউক না কেন, ঐ সকল অনর্থের মূল অনর্থ অহঙ্কারই তার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে দেয় না। আমরা যদি অহংকারের উচ্চ মঞ্চ হতে নেমে বসতে পারি, তা হলে এ সংসারের প্রত্যেক বিষয় হ'তেই কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিতে কিংবা আনন্দ পেতে পারি। তা না করে কেউ বিদ্যার, কেউ ধনের, কেউ পদমর্য্যাদার, কেউ রূপের, কেউ জ্ঞানের এবং কেউ সাধনের অহংকারমদে মাতাল হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যভাবে নিরন্তর ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করে থাকি। তাই বলি দাদা! তুমি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হও চাই নাই হও, তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু একটু শুদ্ধচিত্তে অর্থাৎ অবজ্ঞাহীন ও অহংকারহীন হয়ে সরলতার সহিত প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে চেষ্টা কর, নিতাই বুঝিয়ে দেবেন। এই সনাতন ধর্ম্মের উপর বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর তোমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা; কিন্তু আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু আলোচনা করেছ বা শাস্ত্রাদি কিছু পড়েছ কি? অন্ততঃ টাকা রোজগারের জন্য আইনশাস্ত্রাদি যেরূপ আলোচনা করেছ, বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি সেরূপ কিছু আলোচনা করেছ কি? যদি বা খুব বেশী পড়ে থাক সেও কতকগুলি বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত পণ্ডিতের সংকীর্ণ মতামত আলোচনা ক'রে হৃদয়টাকে শূন্য ক'রে বসে আছ এবং সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হ'য়ে আচারে, বিচারে, আহারে, ব্যবহারে বিকৃত ভাবাপন্ন হয়ে আত্মসুখের লালসায় নিরন্তর ভ্রমণ করছ।

আনন্দ। কথাটা বড় মিথ্যা নয়। আচ্ছা, আমি সাধ্যমত সরল অন্তঃকরণে তোমার কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করব। আচ্ছা, ভগবানকে ভোগ দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট করে বল দেখি।

নবদ্বীপ। অন্য কারণ তুমি বিশ্বাস করবে কি?

আনন্দ। বিশ্বাসযোগ্য হলে কেন বিশ্বাস করব না?

নবদ্বীপ। কার বিশ্বাসযোগ্য ?

আনন্দ। আমার।

নবদ্বীপ। তুমি কে ?

আনন্দ। আমি মানুষ।

নবদ্বীপ। মানুষ বললেই কি তুমি কে বলা হ'ল ? বেশ বুঝে বল।

আনন্দ। এর আর বোঝাবুঝি কি ? আমি মানুষ ছাড়া আর কি ?

নবদ্বীপ। মানুষ ত বটেই, তবে মানুষ বললে তুমি কি বোঝ, আমি তাই জিজ্ঞাসা করি অর্থাৎ মানুষের লক্ষণ কি ?

আনন্দ। ভাই! আমি এ সমস্ত বিষয় কখনও আলোচনা করিনি। আচ্ছা, তুমিই বল শুনি।

নবদ্বীপ। তুমি একজন উচ্চশিক্ষিত, তাতে আবার আইন-ব্যবসায়ী। প্রতিদিন কত আইনের জটিলতা নিয়ে বড় বড় জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথা ঘুরিয়ে দাও, আর সামান্য মানুষের লক্ষণটা বলতে অত ভাবছ ? আমাদের শাস্ত্রে বলে—মানুষ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বে গঠিত অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও মহৎ এই চব্বিশটি বস্তু দ্বারা আমাদের এই দেহটি গঠিত হয়েছে কেমন তাই নয় কি ?

আনন্দ। আরও একটু পরিষ্কার ক'রে না বললে হবে না।

নবদ্বীপ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ; পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ; পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ।

আনন্দ। হ্যাঁ, এটি বেশ বোঝা গেল।

নবদ্বীপ। তারপর মন, বুদ্ধি, অহংকার ও মহৎ এই চারটি। সংকল্প-

বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিবিশেষের নাম মন। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিশেষের নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান। তার পর মহৎ।

আনন্দ। মহৎটা কি ?

নবদ্বীপ। যা বলা যায় না বা বোঝান যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। দেখান যায় না, কিন্তু দেখা যায়, আস্বাদন করা যায় না, কিন্তু আস্বাদ করা যায়।

আনন্দ। ঐটাই ত গোলযোগের কথা! যার কোনও প্রমাণ-প্রয়োগ নেই এবং যেটা কাকেও দেখান যায় না, বোঝান যায় না বা বলা যায় না, সেটা বিশ্বাস করি কি ক'রে ?

নবদ্বীপ। সেটা ঠিক কথা। আচ্ছা, তুমি যখন অঘোরে নিদ্রা যাও, সে সময় তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি কাহারই কার্য্য থাকে না ; কারণ তখন তোমাকে কেহ গালাগালি দিলে বা প্রশংসা করলে তুমি বোঝ না বা হর্ষবিষাদাদি কোনই ক্রিয়া হয় না। এমন কি সে সময় তোমাকে বাঘ বা সাপ আক্রমণ করতে এলেও তোমার বুদ্ধিশক্তি দ্বারা তুমি আত্মরক্ষা করতে পার না। অথচ তুমি থাক এবং তোমার জ্ঞান থাকে। এ কোন্ জ্ঞান বল দেখি ?

আনন্দ। তখন যে আমার কোনও রূপ জ্ঞান থাকে, তার প্রমাণ কি ?

নবদ্বীপ। যদি তোমার জ্ঞান না থাকে, তবে নিদ্রাভঙ্গের পর নিদ্রাকালীন সুখদুঃখের স্মৃতি হয় কিরূপে ? অর্থাৎ তুমি নিদ্রা হ'তে উঠেই বললে, "ভাই! আজ বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছি এবং কোনই বাহ্যস্মৃতি ছিল না।" ইত্যাকার জ্ঞান ত থাকে ?

আনন্দ। জ্ঞানকেই কি মহৎ বলে ?

নবদ্বীপ। না, ঠিক তা নয়, এ জ্ঞানকে চৈতন্য অর্থাৎ অবিনাশী

নিত্য পদার্থ বলে। মহৎ শব্দের অর্থ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না ; তাই শাস্ত্রে ওকে অব্যক্ত বলেছেন। ওটা কেবল অনুভূতিগম্য। আমি নিতান্ত মূর্খ। আমি এ বিষয়ে কি বলব? তাতে আবার তুমি একজন শিক্ষিত লোক—বাল্য হ'তে পাশ্চাত্য ভাষা অভ্যাস ক'রে তাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছ! কেবল ভাষা অভ্যাস নয়—সেই জাতীয় আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অভ্যাস ও আচরণ করছ। তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তবে আমার গুরুদেবের নিকট যা শুনেছি বা শ্রুত বস্তু যতটুকু ধারণা করেছি, তা বললে যদি তোমার তৃপ্তি হয় বলতে পারি।

আনন্দ। তা ত বলবে! আগে আমার একটি কথার উত্তর দিতে হবে। ইংরাজী বা কোনও অন্য দেশীয় ভাষা বা আচার-ব্যবহার ও ভাবকে তোমরা এত ঘৃণা কর কেন?

নবদ্বীপ। কে বলে আমরা ঘৃণা করি? আমার কথার ভাবে যদি তোমার সেরূপ ধারণা হয়ে থাকে, তা হ'লে আমি বোধ হয় আমার নিজের মনের ভাব ভাষায় ঠিক ব্যক্ত করতে পারি নাই। আমরা কোন ভাষা বা ভাবকে ঘৃণা করতে পারি না ; কারণ আমার গুরুদেবের আদেশ ও শিক্ষা তা নয়। তিনি বলেন—একমাত্র অহঙ্কারে মোহিত নিজের নীচ বৃত্তি ছাড়া এ সংসারে ঘৃণা করবার আর কিছুই নাই। জগতে দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থই ভগবৎ-প্রকাশ। আমরা যদি কাকেও ঘৃণা বা তাচ্ছল্য করি, তবে আমাদের অধর্ম্ম হয়।

আনন্দ। তবে তুমি আমাকে বা আমার আচার-ব্যবহারকে এত ঘৃণা কর কেন?

নবদ্বীপ। তোমাকে বা তোমার আচার-ব্যবহারকে যদি আমি ঘৃণাই করব, তবে কি তোমার নিকট খেতে আসি?

আনন্দ। তুমি আমায় ঘৃণা কর না?

নবদ্বীপ। আমার ত বিশ্বাস তাই; অন্ততঃ ঘৃণা না করবার সাধ্যমত চেষ্টা করি।

আনন্দ। তোমার কথায় অনেক সময় পাশ্চাত্য ভাষা বা আচার-ব্যবহারের প্রতি একটা কটাক্ষ আছে বলে বোধ হয়।

নবদ্বীপ। কখনই নয়। তবে যে কথাটা কটাক্ষ ব'লে তুমি ধরেছ, সেটা কেবল স্বধর্ম্ম ত্যাগের প্রতি অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী মঙ্গলময় ভগবান্ যেস্থানে যেকালে যে অবস্থায় যাহাকে জন্ম দিয়েছেন, তদুচিত আচরণ, ধর্ম্ম বা কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করা কখনই মঙ্গলপ্রদ হ'তে পারে না। আমরা নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজেদের মনগড়া একটা উন্নতি কল্পনা ক'রে অপরের আচার-ব্যবহার বা ধর্ম্মের যে অনুকরণ করতে যাই, সেইটি কি কখনও হিতকারী হ'তে পারে? এই কথাকে লক্ষ্য করেই ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

আনন্দ। তুমি কি বলতে চাও—ইংরাজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কোনও সারবত্তা নাই?

নবদ্বীপ। কে এরূপ কথা বলল? এমন কোনও ধর্ম্ম বা ব্যবহার থাকতে পারে না, যার সারবত্তা নাই। তবে কি জান, দেশকাল-পাত্রানুসারে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা দরকার। বাতের রোগীকে কুইনাইন খাওয়াইলে চলবে কেন? স্বধর্ম্ম ত্যাগ বা ত্যাগের উপদেশ সম্পূর্ণ ভ্রমজনক।

আনন্দ। স্বধর্ম্মে যদি কোনও ভ্রম থাকে, তবুও সেই ভ্রমই কি আচরণ করতে হবে? পিতা-পিতামহাদি হয় ত সংস্কার বা অজ্ঞানতা

বশতঃ কোনও কার্য্য আচরণ করেছেন, আমি যদি সেইটি না করি, তা হ'লেই কি আমার স্বধর্ম্ম ত্যাগ হ'ল ?

নবদ্বীপ। প্রথম দেখতে হবে সেই যে আচরণ সেইটি আধুনিক না প্রাচীন। যদি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের আদিষ্ট পন্থা হয়, তবে নিশ্চয়ই সে পথ অভ্রান্ত ; আমি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বা ক্ষুদ্র জ্ঞানে সে বস্তু ধারণা করিতে পারি না ব'লেই আমার ভ্রম মনে হয়। কারণ পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক নিজেরা আচরণ ক'রে তার দোষগুণ অনুভব করতঃ তবে বিধিবদ্ধ করেছেন। আমি সামান্য জ্ঞানে তাঁদের আশয় কি ক'রে বুঝব ? এই ভগবানকে নিবেদন ক'রে আহার করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বোঝবার পূর্ব্বে আমাদের আহার করার উদ্দেশ্য কি বোঝা দরকার। আচ্ছা তুমিই বল দেখি, আমরা আহার করি কেন ?

আনন্দ। আহার করি দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য।

নবদ্বীপ। শুধু কি দেহেরই পুষ্টিসাধন ? সঙ্গে সঙ্গে মন বা আধ্যাত্মিক শক্তির নয় কি ?

আনন্দ। আহারের সঙ্গে মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি না।

নবদ্বীপ। কেন ভাই! একটু চিন্তা ক'রে দেখ দেখি! আহারের সহিত মনের কত নিকট সম্বন্ধ! একদিন যদি তুমি ঠিক সময়ে আহার করতে না পাও, তোমার মন কত চঞ্চল হয়। আবার আহার করামাত্র মনটি কেমন শান্তভাব ধারণ করে! এই তৃপ্তি অনুভব কে করে ?

আনন্দ। ঠিক কথা, দেহের সহিত মনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বটে ; কারণ আমাদের দেহের কোনওরূপ বৈপরীত্য ঘটলে মনের স্থিরতা রাখা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

নবদ্বীপ। তা হ'লে বোঝা গেল—আহার দ্বারা যেমন দেহের পুষ্টি সাধন হয়, তেমনি মনেরও হয়ে থাকে।

আনন্দ। তা হ'লই বা, তাতে ভগবান্‌কে নিবেদনের কি হ'ল ?

নবদ্বীপ। আচ্ছা, এই দেহ ও মনের পুষ্টি বললে আমরা কি বুঝব।

আনন্দ। দেহের পুষ্টি বললে দেহ সবল, সুস্থ ও নীরোগ থাকা বোঝায়, আর মনের পুষ্টি বললে মনের শান্ত অবস্থাকে বোঝায়।

নবদ্বীপ। মনের শান্ত অবস্থা কাকে বলে ?

আনন্দ। শান্ত অবস্থা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির তাড়নাহীন-নির্ব্বিকার অবস্থা।

নবদ্বীপ। অন্য উদ্দেশ্য যা আছে তাহা তোমার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে বোঝান আমার মত লোকের পক্ষে সহজ নহে। আর বুঝলেও তুমি বিশ্বাস করবে কি ?

আনন্দ। যুক্তিসঙ্গত কথা হলে কেন বিশ্বাস করব না ?

নবদ্বীপ। মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি বল দেখি !

আনন্দ। খাওয়া দাওয়া, মৌজ করা অর্থাৎ আহার-বিহারাদি।

নবদ্বীপ। আহার-বিহার ছাড়া মানব জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই কি ?

আনন্দ। আর কি থাকবে ?

নবদ্বীপ। তা হ'লে মনুষ্যজীবনে ও পশুজীবনে পার্থক্য কি ?

আনন্দ। পশুর আহার-বিহারাদি সীমাবদ্ধ—তাহাদের ইচ্ছাশক্তির সেরূপ বিকাশ দেখা যায় না। মনুষ্য স্বাধীন, আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করতে সমর্থ।

নবদ্বীপ। আচ্ছা, এই যে আহার-বিহার জীবনের উদ্দেশ্য বললে এই কথাটা কি একবার ভেবে দেখেছ ?

আনন্দ। এর মধ্যে ভাববার কি আছে ?

নবদ্বীপ। আছে বৈ কি ! আচ্ছা বল দেখি তুমি আহার কর কেন ?

আনন্দ। ক্ষুধানিবৃত্তি ও শরীর পালনের জন্য আহার করি।

নবদ্বীপ। ক্ষুধা জিনিসটা কি ?

আনন্দ। অভাব।

নবদ্বীপ। এই অভাব দূর করাই যদি আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে ত যা তা খেলেই চলতে পারে। ভাল কালীয়া, পোলাও, দুধ, ঘি খাবার ইচ্ছা কর কেন ?

আনন্দ। ওটা অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুরূপ। ভাল খেতে কার না ইচ্ছা হয় ? তবে অবস্থায় কুলায় না ব'লে লোকে যা তা খেয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি করে।

নবদ্বীপ। তবেই আহারটা কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নয় ; ওর সঙ্গে একটা প্রবৃত্তির যোগ আছে ; যার জন্য মানুষ ভাল খেতে চায়।

আনন্দ। তা আছে বটে ?

নবদ্বীপ। আচ্ছা, সে প্রবৃত্তিটা কি ?

আনন্দ। আমার বিশ্বাস সেটা সুখেচ্ছা।

নবদ্বীপ। কেমন ভাই ! প্রথম বলেছিলে আহার-বিহারই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ; এখন বুঝলে যে আহারের সঙ্গে আনন্দ চাই ?

আনন্দ। এ ত সত্য কথা, কারণ যে কার্য্যই করতে যাই, সুখ না পেলে করতে পারি কি ?

নবদ্বীব। এখন বেশ ক'রে বুঝে দেখ, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কেবল আহার-বিহারাদি নয়—আনন্দ। কেউ হয় ত দশদিন অনাহারে একাসনে ব'সে দিন কাটাচ্ছে, কেউ নীচে আগুন জ্বেলে সুর্য্যের প্রখর কিরণের মধ্যে উর্দ্ধপদে হেঁটমাথে রয়েছে, আবার কেউ বা দুগ্ধফেনিভ

শয্যায় শয়ন ক'রে দিন যাপন করছে। বল দেখি সকলেরই উদ্দেশ্য এক নয় কি? প্রথমে মনে হয় দুটি; কিন্তু চিন্তা করে দেখতে গেলে এক ভিন্ন আর কিছু মনে হবে না।

আনন্দ। তা ত সত্য! আনন্দই সকলের উদ্দেশ্য।

নবদ্বীপ। তবে এখন প্রকৃত বিষয় হ'ল আনন্দ। আনন্দ পাবার জন্য কেবল মানব কেন, জীবমাত্রই লালায়িত। এই আনন্দ নিত্য কি অনিত্য বল দেখি!

আনন্দ। জীবের যখন নিত্যত্ব নাই, তখন তদাশ্রিত আনন্দ নিত্য হবে কিরূপে?

নবদ্বীপ। আশ্রয়ের সহিত আশ্রিতের এমন কোনও নিকট সম্বন্ধ হ'তে পারে না, যাতে আশ্রয়ের অনিত্যতায় আশ্রিতে অনিত্যতা হবে। আনন্দ নিত্য পদার্থ; সচ্চিদানন্দ আদিপুরুষ গোবিন্দের হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ আনন্দ অপ্রাকৃত। আমরা সংসারে যে আনন্দ উপভোগ করি, সেইটি আনন্দের ছায়া মাত্র! আহার-বিহার, সংযোগ-বিয়োগ আনন্দ নয়, আনন্দের সহায় বা অবলম্বন। ধর, তোমাকে যদি এই কটক হ'তে পুরী যেতে হয়, তবে তোমাকে প্রথম ঘোড়ার গাড়ী, শেষে রেলগাড়ীতে চ'ড়ে যেতে হবে! এই পুরী তোমার প্রাপ্তির বিষয়, আর রেলগাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু সেই বিষয় প্রাপ্তির সহায় বা অবলম্বন। তেমনি আনন্দই একমাত্র জীবের প্রাপ্তির বিষয়, সাংসারিক ব্যাপার তার সহায়।

আনন্দ। আচ্ছা! এই জগৎ প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত?

নবদ্বীপ। এই জগৎ প্রাকৃত।

আনন্দ। জাগতিক ব্যাপার অবলম্বনে চিন্ময় অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ হ'তে পারে কি? ধর, এই আহার বিহারাদি তুমি

বললে আনন্দের অবলম্বন, এদিকে আবার বললে আনন্দ নিত্য এবং অপ্রাকৃত। অনিত্য বস্তু অবলম্বনে নিত্য বস্তু পাওয়া যায় কি ?

নবদ্বীপ। বড়ই সুন্দর প্রশ্ন করেছ। এতক্ষণে যে আমার সঙ্গে বাদানুবাদ হচ্ছিল, তার শেষ মীমাংসার কথা উপস্থিত হয়েছে। ভগবান্‌কে ভোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য এই—আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালক সদৃশ—বস্তুর ভালমন্দ আমাদের বোধ নাই। কাজেই আমাদের বুদ্ধি অনুসারে বস্তুর বিচার না ক'রে যা কিছু উপস্থিত হয়, প্রভুকে সমর্পণ ক'রে দিই, তিনি ওর হেয় অংশ বাদ দিয়ে উপাদেয় অংশ আমাদিগকে প্রদান করেন। যেমন কোনও বালক একটি সুপক্ক বেলফল পেয়ে পরমানন্দিতভাবে পিতা বা মাতার নিকটে নিয়ে গেল। কৌশলী পিতা বা মাতা উক্ত ফলের আবরণ মোচন করতঃ উত্তম সংস্কার ক'রে বালককে খেতে দিলেন। বালক অতি পরিতৃপ্তভাবে উক্ত ফল খেয়ে আনন্দিত ও পরিপুষ্ট হল। যে বালক পিতামাতাকে না জানিয়ে নিজের স্বাধীনতা অনুসারে উক্ত ফল খেতে গেল, সে হয়ত বেলের খোসা চিবিয়ে নীরস বোধে দূরে নিক্ষেপ করল। তিনি অপ্রাকৃত নিত্য চিন্ময় সর্ব্বব্যাপী। তাঁর কৃপাপ্রদত্ত বস্তু একবার মাত্র তাঁর নাম স্মরণ ক'রে তাঁর হস্তে সমর্পণ করতে পারলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল। তারপর তিনি যেরূপ ভাবেই হউক সেই বস্তুর প্রাকৃতত্ব নষ্ট ক'রে অপ্রাকৃত গুণ সঞ্চার করতঃ আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। খাদ্য বস্তুর কথা ত দূরে, আমরা সময়ে বিষ পর্য্যন্ত তাঁর হাতে দিয়ে থাকি ; কিন্তু তিনি এমনি করুণাময় যে সেই বিষকে অমৃত ক'রে আবার আমাদিগের হস্তে অর্পণ করেন। প্রহ্লাদের পিতা তাকে হলাহল বিষমাখা অন্ন খেতে দিলেন। প্রহ্লাদ যেমন ভগবানকে অর্পণ করলেন, অমনি সেই বিষ অমৃতে পরিণত হ'ল। এইরূপ মীরাবাঈএর প্রাণবিনাশ

মানসে রাণা অতিশয় তীব্র বিষধর কালসর্প শালগ্রাম নাম করে তার নিকট প্রেরণ করেছিলেন। মীরা সরলপ্রাণে পেটরা খুলে দেখে অপূর্ব্ব শালগ্রামশিলা! দেখ, মীরা কিন্তু জানেই না যে পেটরায় কি বস্তু আছে। কেবল রাণা যে শালগ্রাম নাম করেছিলেন, পরম দয়াল ভগবান্ সেই নামপ্রভাবেই পেটরা হ'তে কালসর্প দূর করতঃ নিজে তন্মধ্যে প্রবেশ করলেন। হায় রে! জীব এমন দয়াল প্রভুকেও ভজতে চায় না!

আনন্দ। আচ্ছা, তোমরা যখন যা কর সকলই কি ভগবান্‌কে জানিয়ে কর?

নবদ্বীপ। করবার চেষ্টা করি। আচ্ছা ভেবে দেখ, তুমি কোনও একটা কার্য্য গোপনে করতে গিয়েছ, কিন্তু একজন তা দেখতে পেল, সেই সময় তোমার কি করা উচিত?

আনন্দ। কি আর করব? যখন সে জানতেই পারল, তখন তাঁকে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে বলাই উচিত।

নবদ্বীপ। তবে দেখ, ভগবান্ বিশ্বতশ্চক্ষু, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ন্তা। তুমি যতই গোপনে কার্য্য করতে যাও না কেন, তিনি তোমার নিকটে থেকে হাসছেন। তোমার জানাবার পূর্ব্বেই তিনি জেনেছেন। তুমি যাবার পূর্ব্বে তিনি গিয়েছেন। তুমি না দেখতেই তিনি দেখেছেন। বল দেখি, যিনি সমস্ত জানলেন, তাঁর নিকট গোপন করা মূর্খতা নয় কি?

আনন্দ। তিনি যে সমস্ত জানলেন, আমি কি ক'রে বুঝব?

নবদ্বীপ। একথা অপরের বুঝিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি যখন কোনও অন্যায় কার্য্য বা মিথ্যা মকর্দ্দমা করতে যাও, তখন তোমার প্রাণের মধ্যে কোনওরূপ ভীতি বা সঙ্কোচ-ভাব আসে না কি?

আনন্দ। সময় সময় আসে বটে; কিন্তু সে এক মিনিট আধ মিনিটের মধ্যেই আবার বিলীন হয়ে যায়।

নবদ্বীপ। এই যে আসা, ইহাই ভগবানকে জানবার পরিচয়। অর্থাৎ গোপনীয় কার্য্য যেমন কাহারও নিকট কিঞ্চিৎ প্রকাশ পেলে মনের মধ্যে ভীতি আসে, তেমনি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে অতি গোপনে গভীর রাত্রে গৃহাভ্যন্তরে পাপকার্য্য করতে গিয়েও মনে ভীতির সঞ্চার হয় কেন? না সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবানের গোচর হ'য়েছে ব'লে।

এইবার আনন্দবাবুর হৃদয়টা কি রকম হইয়া গেল, চক্ষু দুইটি আরক্তিম এবং ছলছল; গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"দাদা! যে জন এইরূপ অশেষ পাপের পাপী, প্রবঞ্চক, অসদাচারী, লম্পট, তার কি কোন উপায় নাই? তার ত বোধ হয় অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করলেও প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

নবদ্বীপ। ভয় কি ভাই! পরম দয়াল অবতার। কলিযুগে যদি ঐরূপ বিচার ক'রে জীব উদ্ধার করতে হ'ত, তবে আর কলির জীবের গতি ছিল না। তাই দয়াল প্রভু কলিযুগের জন্য সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন। যে যতই পাপ ক'রে থাকুক না কেন, একবার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রজ্বলিত ক'রে ব্যাকুলপ্রাণে সরলভাবে ভগবাণের চরণে শরণ নিয়ে কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং আবার যাতে সে পথে যেতে না হয় তার জন্য প্রভুর চরণে জানালে তিনি কোলে তুলে নেবেন। ভগবান সব কাজ করতে পারেন, কেবল জীবকে ঘৃণা করতে পারেন না। তিনি করুণাময়, যে যতই দুরাচার হউক না কেন, তিনি ক্ষমা করে কোলে তুলে নেবেন।

এতক্ষণ আনন্দবাবু নীরবে নবদ্বীপদাসের কথা শুনিতেছিলেন, আর

দুইটি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন, এবার একেবারে অধৈর্য্যভাবে ইঁহার চরণতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মুখে কেবল এক বুলি—'হায়! আমার কি হবে? আমি যে অশেষ পাপের পাপী, আমাকে উদ্ধার করবে কে? আমি যে জগাই মাধাই হ'তেও দুরাচার!'

এইরূপ আর্ত্তি দেখিয়া নবদ্বীপদাদা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানারূপে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলে আনন্দবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— "দাদা! আমার উদ্ধারের কি উপায় হবে? আপনি আমায় কৃপা ক'রে যখন চৈতন্য দিয়েছেন, তখন আবার যেন নরকে না পড়ি। আমাকে কিরূপ ভাবে চলতে হবে, কিরূপ কি করতে হ'বে আদেশ করুন।" তখন নবদ্বীপদাস বললেন, "দেখ, আমার যতদূর শক্তি আমি বলেছি, এখন গুরুদেবের হাত। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করবেন সেইরূপই হবে।"

আনন্দ। আপনার গুরুদেব কোথায়? তিনি কি এই মহাপাপীকে স্পর্শ করবেন? এ মহাপাতকীর কি এমন শুভদিন হবে?

নবদ্বীপ। ভাই! তিনি পরম দয়াল, তাঁকে একবার দর্শন করলেই তুমি বুঝতে পারবে। তিনি সম্প্রতি শ্রীধাম পুরীতে আছেন।

আনন্দ। তাঁকে কিরূপে এখানে আনা যায়?

নবদ্বীপ। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ, জানি না আসবেন কি না, তবে তোমার যদি প্রাণে ব্যাকুলতা থাকে—প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ করতে পার, তবে আসলেও আসতে পারেন।

আনন্দ। দাদা! আমার ব্যাকুলতাও নাই আকর্ষণও নাই, আমার অবলম্বন একমাত্র তুমি। তোমার যা ইচ্ছা কর। তবে এইমাত্র আমার প্রার্থনা—আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না, যত সত্বর হয় ব্যবস্থা কর।

এই বলিয়া কাতরভাবে আমাকে ও দাদাকে পুরী আসিবার জন্য

বলিলেন। তাই তাঁহার প্রেরণায় আমরা দুইজনে আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনাকে একবার অবশ্যই যাইতে হইবে।

বাবাজী। বাবা, পতিতপাবন নিতাইচাঁদকে জানাও। তিনি লইয়া গেলেই যাইব।

তখন নবদ্বীপদাদা বলিলেন, "আজ অসময় হইয়াছে; কাল দিনের গাড়ীতে গেলেই ভাল হইবে।" এইরূপ নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরের আরতি দর্শন করিয়া সকলেই মনে মনে ভাবিতেছেন, কাহার উপর প্রভুর করুণা হইবে—কাহাকে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিবেন, ইচ্ছাময় প্রভুই জানেন। ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া মঠে আসিলেন। কেবল সেবার উপযোগী চারি পাঁচ-জনকে মঠে রাখিয়া আর সকলকেই সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলে সকলেই আনন্দিতচিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে নাম করিতে করিতে ষ্টেশনে রওনা হইলেন। বাবাজী মহাশয়কে যে-ই রাস্তায় দেখিতেছে, সে-ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "আজ্ঞে কতদিনে আবার পুরী প্রত্যাবর্ত্তন হইবে?"

বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "নিতাই কোথায় লইয়া যাইবেন, কোথায় রাখিবেন, আবার কবে আনিবেন তিনিই জানেন। তোমরা সকলে প্রভুকে জানাও, যথা তথা রাখেন যেন তাঁর নাম বিস্মৃত না হই" বলিয়া হাসিমুখে সকলকে বিদায় দিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে টিকিটের ঘণ্টা বাজিলে আনন্দবাবুর প্রেরিত ভদ্র-লোকটি বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে আনন্দবাবু সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করিতে আদেশ করিয়াছেন।" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! গাড়ীতে বড় লোক হইলে কি হইবে? কাল হয় ত কটকে ভিক্ষা করিতে হইবে; সুতরাং নীচের ক্লাসের টিকিট কাটাই ভাল।"

বাবুটি একটু অপ্রতিভ হইয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে ছাব্বিশ-খানি টিকিট করিয়া আনিলে ইঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বাবাজী মহাশয় খোল করতাল যোগে নাম আরম্ভ করিলেন। নবদ্বীপদাদার মনে কি এক কৌতুহল হইয়াছে যে আনন্দবাবুকে বাবাজী মহাশয়ের আগমনবার্ত্তা জানান হইবে না বা ইঁহার পরিচয়ও দেওয়া হইবে না। দেখা যাক্ তাহার কতদূর চিত্তের উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে! যদি সে তাহার ইষ্টদেবকে চিনিয়া লইতে না পারে, তবে জানিব আরও সময় বাকী আছে। এদিকে আনন্দবাবুর মনে কি ভাবের উদয় হইল, অন্তর্য্যামী প্রভুই জানেন। কোনই খবরাখবর নাই, হঠাৎ গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। যথা সময়ে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের স্বাভাবিক নিয়ম—গাড়ীতে উঠিবার সময় সকলকে আগে উঠাইয়া পরে নিজে উঠিয়া থাকেন। আবার নামিবার সময় সকলকে নামাইয়া তবে নিজে নামিয়া থাকেন। আজও তাহাই হইল। সঙ্গিগণ গাড়ী হইতে নামিয়া যেমন বাহির হইতেছেন, অমনি আনন্দবাবু করযোড়ে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিবার প্রার্থনা করিয়া ষ্টেশনের ঠিকে গাড়ীওয়ালাদিগকে বলিলেন, "দেখ্, এক এক গাড়ীতে দুই দুইজন করিয়া আমার বাড়ীতে লইয়া যা।" গাড়োয়ানগণও বাবুর হুকুমমত কার্য্য করিতে লাগিল। নবদ্বীপদাদা পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটির সঙ্গে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আনন্দবাবুর অনুরাগ পরীক্ষা করিতেছেন। ক্রমে সমস্ত সঙ্গিগণ চলিয়া গেলে বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দবাবু বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ইঁহার চরণতলে পতিত হইয়া ঠিক অপরাধী বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আমাকে উদ্ধার করুন। আমার আর কেহই নাই। এতদিন

আপনার বোধে যাহাদের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য বিচার না করিয়া প্রাণপণে খাটিয়াছি, এখন জানিলাম—তাহারা কেহই আমার পাপের ভাগী হইবে না। এখন একমাত্র আপনিই আমার ভরসা।" বাবাজী মহাশয় সজলনয়নে আনন্দকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! ভয় কি? পরম দয়াল পতিতপাবন নিতাইচাঁদ আছেন। চল, বাড়ী চল" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

ইত্যবসরে নবদ্বীপদাদা এবং পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি একখানা গাড়ী করিয়া অতি দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক আনন্দবাবুর বাড়ীর সংলগ্ন একটি পৃথক্ বাড়ীতে সকলের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যত কিছু ব্যবস্থার ভার নবদ্বীপদাদার উপর। আনন্দবাবুর গাড়ীতে বাবাজী মহাশয়, আনন্দবাবু, ললিতাদাসী এবং কুসুমমঞ্জরী দাসী এই চারিজন উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই আনন্দবাবু বাবাজী মহাশয়ের চরণ দুইখানি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দুইটি চোখের জলে ধৌত করিতে করিতে জীবনের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমি অশেষ পাপের পাপী। মদ্য মাংস প্রভৃতি এরূপ বস্তু জগতে কম আছে যাহা আমি ব্যবহার না করিয়াছি। আমার পেটে এখন পর্য্যন্ত বোধ হয় মুরগীর হাড় আছে! আমা হইতে কত স্ত্রীলোকের যে সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্রে জগাই মাধাই, অজামিল, রত্নাকর প্রভৃতি যে সমস্ত দস্যুর কথা শুনিয়াছি, তাহাদের অপেক্ষাও আমি মহাপাপী; কারণ দস্যুগণ মাথায় লাঠি মারিয়া লোকের নিকট যে সমস্ত ধন থাকে তাহা লইয়া যায়, আর আমি এমনই বিশ্বাসঘাতক যে, যে আমার উপকার করিয়াছে তাহারই যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছি। এক পক্ষের উকীল হইয়া টাকার লোভে অপরের কার্য্য করিয়াছি। অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছি। জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন বা একদিন আমার এই কৃতকর্ম্মের ফলে

আমায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এমন কি আমার উপর বিচার-কর্ত্তা কেহ আছে বলিয়া এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল না। গুরুলঘু মানি নাই ; সম্বন্ধ বিচার যে কাহাকে বলে আমার ধারণা ছিল না। বাবা ! কেবল নবদ্বীপদাদার কৃপায় আজ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, আজ আমি ত্রিজগৎ শূন্য দেখিতেছি ! যেদিকেই আমার দৃষ্টি পতিত হইতেছে, সেই দিকেই আমি অপার দুঃখ-জলধি দেখিয়া হতাশ হইতেছি। যাহার মুখ-পানে তাকাইতেছি তাহার নিকটেই আমার নিজেকে ঘোর অপরাধী বলিয়া মনে হইতেছে। বাবা গো ! আমার যে আর উপায় নাই, আমি যে অকূল সাগরে পতিত হইয়াছি। আমার উদ্ধার করিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই। আমার বিশ্বাস, আমাকে দেখিয়া নিতাই গৌর ভয়ে পলাইয়া যাইবেন। আমার কদাচারের কথা শুনিলে জগতে এ হেন জন নাই যে ঘৃণা না করিবে। বাবা ! একমাত্র আপনি ভিন্ন এ ঘোর নারকী অধম পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে এমন আর কেহই নাই।” এইরূপ ভাবে কত যে অনুতাপ করিতেছেন, কাহার সাধ্য তাহা ভাষায় ব্যক্ত করে ? বাবাজী মহাশয় অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, চরণদুখানি আনন্দের বুকের উপরেই রহিয়াছে। এক একবার ঈষৎ কম্পিতভাবে গদগদকণ্ঠে ‘জয় নিতাই, জয় নিতাই’ বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে আনন্দবাবু বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “বাবা ! চিন্তা কি ? ধন্য কলিযুগ ! পরমদয়াল অবতার অদোষদর্শী নিতাই-গৌরের কৃপায় কেহই বঞ্চিত হইবে না। তোমার জন্মজন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপ তাপ আমাকে দিয়া তুমি নির্ম্মলভাবে তাঁহাদের চরণে শরণাপন্ন হও” বলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বাবাজী মহাশয় স্থিরভাবে বসিলেন ; কিন্তু

কি আশ্চর্য্য ! ইঁহার মূর্ত্তিখানি এমনি শ্রীহীন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল যে, ইঁহাকে চেনা কঠিন হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল মধ্যে গাড়ী আসিয়া কাঠ-গড়াসাহি আনন্দবাবুর বাড়ীর সম্মুখে পঁহুছিলে সকলে গাড়ী হইতে নামিলেন। নবদ্বীপ দাদা আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিবামাত্র অতিশয় ব্যাকুলভাবে "হা নিতাই জয় নিতাই" বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। উভয়ের মনের ভাব উভয়েই জানিলেন। বাবাজী মহাশয় টলিতে টলিতে বামহস্তে নবদ্বীপদাদার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সকলে খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইলে ঐ স্থানে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কৌশলী নবদ্বীপদাদা তাঁহার প্রাণের প্রাণ দাদাকে লইয়া নাচিতে নাচিতে আনন্দবাবুর বসতবাটীর পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গিগণ চারিদিকে ঘেরিয়া নাম করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ আনন্দবাবুর বাড়ীতে অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশিগণ উধাও হইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সম্পূর্ণ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতেছে—"কি আশ্চর্য্য ! যাহার ভয়ে পাড়ার মধ্যে ভিখারী আসিত না, আজ তাহারই বাড়ীর মধ্যে নামসংকীর্ত্তন !" নিকটে গিয়া সকলে দেখে আনন্দবাবু দুইটি হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিভোরভাবে নৃত্য করিতেছেন। গায়ে জামা-জোড়া কিছুই নাই—দুইটি চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। এক একবার সংকীর্ত্তনের মধ্যে রজে গড়াগড়ি দিতেছেন দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতেছে, "এমন অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা ত দূরের কথা, কখনও শুনি নাই। এ কি আবার সত্যযুগ আসিল না কি ?" কেহ বলিতেছে, "ঐ যে পাতলা মত বাবাজীটি, উঁহাকে আমি আরও তিন চারি দিন নামগান করিতে করিতে বাবুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে

দেখিয়াছি। বোধ হয় উঁহার কৃপায়ই বাবুর মনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" কেহ কেহ বলিতেছে, "হ্যাঁ, এখনও মুরগীর ডিম ঘরে আছে। ওর আবার পরিবর্ত্তন! কেহ বা বলিতেছে "ভাই! সাধুর কৃপা হইলে মন ফিরিতে কতক্ষণ? দেখ না! ঐ যে মহাপুরুষটি নৃত্য করিতেছেন, উঁহার কেমন সুদীর্ঘ কলেবর, আজানুলম্বিত বাহু আর কেমন আবিষ্ট-ভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছেন! আহা মরি! কেমন সুমধুর কণ্ঠস্বর! ঐ দেখ না! আনন্দবাবু এক একবার কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ মহাপুরুষের চরণতলে পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, আর আকুলপ্রাণে কত কি না বলিতেছেন! নিশ্চয়ই তোমরা দেখিতে পাইবে—ঐ মহাপুরুষের কৃপায় আনন্দবাবু দেব প্রকৃতির লোক হইবে সন্দেহ নাই" ইত্যাদি যাহার যেরূপ মনের ধারণা সে সেইরূপ সমালোচনা করিতেছে। ইঁহারা কিন্তু নামানন্দে বিভোর। অনেকক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর সকলে উপবেশন করিলে পাড়ার অনেক ভদ্রলোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আনন্দবাবু ইঁহাদের আহারাদির বা সেবাশুশ্রূষার সম্পূর্ণ ভার নবদ্বীপদাদার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তমনে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে তত্ত্বকথা শুনিতে লাগিলেন। নবদ্বীপদাদাও সুচারুরূপে ভোগ রাগের বন্দোবস্ত করিলেন। রাত্র আন্দাজ এগারটার সময় সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

ভগবৎ-কৃপায় যেমন অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, ভগবদ্‌ভক্তের কৃপায়ও তেমনি মানববুদ্ধির অতীত কার্য্য অতি অলক্ষিতভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আজ আনন্দবাবু সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি, স্বর্গের দেবতা। আজ আর তাঁহার তেমন উদ্ধত প্রকৃতি নাই। মক্কেলগণ কোনও মকদ্দমার পরামর্শ করিতে আসিলে তিনি নম্রভাবে বলিতেছেন, "বাবা! যদি ইহার মধ্যে কোনওরূপ প্রতারণাময় ঘটনা প্রকাশ পায়, তবে কিন্তু আমি

সেই মুহূর্ত্তেই এই মকদ্দমা পরিত্যাগ করিব।" আর একটি অপূর্ব্ব গুণ আনন্দবাবুতে প্রকাশ পাইল। মক্কেলগণকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! মিছামিছি বিবাদবিসম্বাদ করিয়া সাধের মনুষ্যজন্ম নষ্ট করিবে কেন? যাও, পরস্পর মিটাইয়া ফেল, তাহাতে যদি কিছু ক্ষতি হয় সেও ভাল। ভাবিয়া দেখ, মাম্‌লা করিতে গেলেই ত অর্থদণ্ড ও শারীরিক পরিশ্রম, তাহাতে আবার অশান্তি। বল দেখি অর্থ ব্যয় করিয়া অনর্থ ক্রয় করে কে?" তাঁহার ঐরূপ মিষ্ট ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় এহেন লোক নাই, যাহার চোখে জল না আসিতেছে। স্ত্রীকে বলিলেন, "দেখ, আমার পূর্ব্ব স্বভাবের অনুকূল যে সমস্ত দ্রব্যাদি আছে, হয় ফেলিয়া দাও, অথবা কাহাকেও বিলাইয়া দাও। এ বাড়ীতে যেন ও সমস্ত বস্তুর কোনরূপ সংস্রব না থাকে। বৈঠকখানায় যে সকল বাজে ছবি ছিল, সে সব উঠাইয়া ভগবৎসম্বন্ধীয় চিত্রপট দেওয়াইলেন। চাকর দ্বারা বৈঠকখানা ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিলেন। যে আনন্দবাবুকে দেখিতেছে বা উঁহার অন্ততঃ ব্যবহারিক জগতেরও দুইটি কথা শুনিতেছে, সেই গদগদকণ্ঠে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দবাবুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছে।

বাবাজী মহাশয়ের সহিত আনন্দবাবুর পিতাপুত্র সম্বন্ধ। আনন্দবাবু বাবা বলিতে অস্থির। বাবাজী মহাশয় হয় ত বসিয়া আছেন, হঠাৎ আনন্দবাবু ছুটিয়া গিয়াই 'বাবা' বলিয়া চরণ দুইখানি বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! আনন্দের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে কে বলিবে যে এই ব্যক্তি কখনও উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিল বা রজোগুণ কখনও উহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল? যে আনন্দ বাবুর মুখে 'হ্যারে ওরে' ছাড়া চাকর চাকরাণী কখনও শুনে নাই, তিনি আজ বাবা বাছা ব্যতীত কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন না। আর যে সে কথায় যাহার তাহার নিকট আত্মগ্লানি প্রকাশপূর্ব্বক কাঁদিয়া অধীর হইতেছেন।

একদিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা ; কিন্তু আনন্দবাবু নিশ্চেষ্টভাবে বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছেন। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ! আজ কাছারি যেতে হবে না কি ?"

আনন্দ। বাবা! আমার আর ঐ প্রতারণাময় কার্য্য করিতে ইচ্ছা নাই ; আপনি কৃপা করুন, আমি আর কাছারি যাইব না।

বাবাজী। কেন বাবা! তুমি ত উচ্চশিক্ষিত, তুমি এরূপ ছেলে-মানুষের মত কথা বলিলে চলিবে কেন ? আচ্ছা, আমাকে তুমি বুঝাইয়া দাও যে, কাহার দোষে ওকালতি কার্য্য প্রতারণাময় হইল ?

আনন্দ। দোষ কাহার বলিব ? ও কার্য্যটাই এইরূপ যে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রবঞ্চনা করিতেই হইবে।

বাবাজী। আচ্ছা আইন শব্দের অর্থ কি ?

আনন্দ। আইন শব্দের প্রকৃত অর্থ রাজবিধি বা ন্যায়।

বাবাজী! বেশ! রাজপুরুষগণ যে আমাদের দেশে এই আইনের প্রচলন করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহাদের নিজেদের কল্পিত, না আমাদের কোনও শাস্ত্রসঙ্গত মত ?

আনন্দ। আইনটি কাহারও কল্পিত নহে সত্য ; কারণ মনু, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি হিন্দুদিগের স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে অভিপ্রায় লইয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

বাবাজী। স্মৃতিশাস্ত্রকে ব্যবস্থা-শাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র বলে। ধর্ম্ম শব্দ যে স্থানে থাকে, সে স্থানে কখনও প্রবঞ্চনা, কপটতা, ছলচাতুরী প্রভৃতি থাকিতে পারে না। বিচারালয়ের নাম ধর্ম্মস্থান। বিচারকের নাম ধর্ম্ম-অবতার! এতগুলি ধর্ম্ম শব্দ যে স্থানে, সে স্থানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কোথা হইতে আসিল ? উকীল ও মোক্তার শব্দের অর্থ সহায় ; অর্থাৎ

একটি অশিক্ষিত লোক রাজপুরুষের নিকট গিয়া তাহার নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। এমন কি সে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, বিচারক যে কে, তা সে জানে না। হয় ত অপর কোনও ব্যক্তির নিকট নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলে তাহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; একারণ সুকৌশলী রাজা প্রজাদিগের অভাব দূরীকরণার্থ সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ অথচ রাজসরকারের সুপরিচিত বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর এইরূপ একটি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, ইনি বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে যাহা বিচারককে বুঝাইয়া দিবেন, সেই অনুসারেই তিনি বিচার করিবেন। বল, রাজা কি অভিপ্রায়ে উকীল মোক্তারের সৃষ্টি করিলেন? তোমরা কিনা অর্থের লোভে নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পরের অনিষ্ট করিতেছ? কিন্তু দোষ দিতেছ আইনের বা বৃত্তির। কি ভয়ানক ব্যাপার! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—একটি উকীলের দোষে কতজন লোকের অনিষ্ট হইল! প্রথম যিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে মিথ্যা জিনিষটি এরূপভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে সেই মিথ্যাকেই সত্যবোধ করিতে বাধ্য হইলেন; কাজেই তাঁহার ঘোর অপরাধ হইল। আবার এই বৃত্তির দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে যিনি ধনী এবং সেই ধনে যাহারা পরিপুষ্ট তাহাদের অসদ্‌গতি! আবার যিনি এই উকীলবাবুর সহায়তা পাইয়া অপরের বিত্তাপহরণাদি করিতেছেন, তাঁহার সগোষ্ঠী এবং যাহারা সাক্ষ্য দিতেছে তাহাদের কি গতি হইবে! মোটকথা—এই সমস্ত অনর্থের মূল একমাত্র উকীলবাবুর স্বার্থপরতা নয় কি?

আনন্দ। তাই ত বাবা! আমি এরূপ অসৎ কার্য্য আর করিতে ইচ্ছা করি না।

ববাজী। কই বাবা! এ ত ওকালতী ব্যবসায়ের কোনও দোষ হইল না। আইনে ত আর তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া কতকগুলি লোকের নরকের পথ পরিষ্কার করিতে বলে নাই! বরং যাহাতে মিথ্যা ব্যবহার না হয় সেইরূপ চেষ্টা করিতেই বলিয়াছে। আমার মতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া যতই এই সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়, ততই ভাল, অর্থাৎ ততই অধর্ম্মের প্রশ্রয় কম হয়। বেশ ত, আজ হইতে তুমি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প কর যে—'আমি কোনওরূপ মিথ্যা ব্যবহার করিব না। মিথ্যা মকদ্দর্মায় যদি বহু অর্থও পাই, তথাপি তাহা গ্রহণ করিব না। প্রাণপণে সত্যের দিকে অগ্রসর হইব।" দেখিবে তোমার দিন দিন কত উন্নতি হইবে। তবে প্রথম প্রথম একটু অভাব বোধ হইবে বটে; কিন্তু সেই অবস্থায় একটু লোভ সংবরণ করিতে হইবে। হয় ত একজন একটি মিথ্যা মকদ্দর্মার জন্য পাঁচশত টাকা দিতে প্রস্তুত। তখন মনে হইতে পারে যে আমি হাতে পাইয়া এতগুলি টাকা পরিত্যাগ করিব! এমন কি হয়ত অনেক আত্মীয় স্বজন আসিয়া তখন উপদেশ দিবেন, "এ কি মহাশয়! ব্যবসা করিতে গিয়া ওরূপ করিলে চলে কি? এরূপ করিলে পসার থাকিবে কেন? আপনার চিরদিনের বাঁধা মক্কেলগণ অন্য উকীলের হাতে যাইবে এটা কি ভাল? ইত্যাদি।" কিন্তু বাবা! সেই সময় যদি একটু ধৈর্য্য ধরিতে পার তবে ভবিষ্যতে অর্থাৎ যখন প্রকৃত তোমার সত্যবাদিতা জগতে প্রকাশ পাইবে, তখন দেখিবে কত মক্কেল তোমার কাছে গড়াগড়ি যাইবে। প্রভু তোমাকে চারিদিক হইতে এত অর্থ এত সম্মান প্রদান করিবেন যে, তোমার সে সমস্ত সামলান কঠিন হইবে। বাবা! লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অধিক পরিমাণে রসগোল্লা খাইলে যখন অম্লশূল জন্মিবে, তখন রসগোল্লার দোষ দিলে চলবে কেন? দিবানিশি প্রভুর চরণে পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত পাপকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা এবংভবিষ্যৎ জীবনের জন্য

সত্যতা, ন্যায়-পরায়ণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি ভিক্ষা চাও। পিশাচপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দরুণ আত্মগ্লানি জন্মাইবার চেষ্টা কর, পরম শান্তিলাভ করিতে পারিবে। কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে সাধু হওয়া যায় একথা মনে করা ভুল। কপটতা পরিত্যাগ কর, ধর্ম্মের ভাণ করিও না—ভিতর বাহির এক করিতে চেষ্টা কর, ভগবানে নির্ভর কর, কখনও অসৎ পথে পতিত হইবে না। ভ্রমবশতঃ অসৎপথে গমন করিতে চাহিলেও নিশ্চয়ই প্রভু ফিরাইয়া আনিবেন।

আনন্দবাবু এতক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলেন আর এতদিন যে লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই এত অসৎ কার্য্য করিয়াছেন, এইটি ধারণা করিয়া মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে-ছিলেন। যেমন বাবাজী মহাশয়ের কথা শেষ হইল, অমনি অতিশয় ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ইঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও আস্তেব্যস্তে উঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন প্রদানে সুস্থ করতঃ কাছারিতে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগ লাগিল। ইঁহারাও মধ্যাহ্নকীর্ত্তনাদি শেষ করতঃ প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

—*—

আনন্দবাবুর দীক্ষা

বাবাজী মহাশয়ের নিকট আনন্দবাবুর সর্ব্বদাই আব্দার—সর্ব্বদাই ঠিক বালকের ন্যায় কান্না। একদিন বিশেষ জেদ করিয়া বলিলেন, "আমাকে দীক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাকে যদি নরককুণ্ড হইতে উদ্ধারই করিলেন, তবে আবার যাহাতে পতিত না হই সে ব্যবস্থাও ত করিতে হইবে! আমার আজ দুইদিন হইতে রাত্রে কেবল মনে হয়—বাবা আমাকে উপযাজকভাবে কোন কথা বলেন না কেন? আমি যে পশু সেই পশুই রইলাম। আমি যেন সর্ব্বদা দেহকে অপবিত্র মনে করিতেছি। অস্পৃশ্য হইয়া থাকিলে ত আর ভগবানের উপাসনা হইবে না! উপাসনা কাহাকে বলে বা উপাসনার ক্রম কি, কি উপায়ে ডাকিলে বা কোন্ পথে চলিলে সহজে ভগবৎপথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাও ত আমি কিছুই জানি না। আজ আমাকে মন্ত্র প্রদান করিতেই হইবে।"

বাবাজী মহাশয় আনন্দকে পরীক্ষা করিবার মানসে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! অত উতলা কেন? স্থির হও ক্রমে ক্রমে হইবে।"

আনন্দ। বাবা! আর কেন আমায় পরীক্ষা করিতেছেন? আর কি সময় আছে? আমি যে বাজে কাজে আমার জীবনের সমস্ত সময় নষ্ট করিয়াছি, আর ত আমার সময় নাই। না জানি কোন্ সময় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আর কেন বাবা! আজই আমার পশুত্ব দূর করিয়া দিন। পতিত অধম সন্তানকে একবার কোলে লইয়া আবার ঘৃণা কেন?

বাবাজী। বাবা! ঘৃণা নয়, নিতাইচাঁদ তোমাকে কৃপা করিবেন

তাহাতে আমার কি আপত্তি? তবে এ পুতুলকে নিমিত্ত না করিয়া অন্য কাহারও দ্বারা করিলেই ভাল হইত।

আনন্দ। আজ্ঞে, ত্রিজগতে এমন মানুষ বা দেবতা নাই, যিনি এই পাষণ্ডকে উদ্ধার করিতে পারেন। আমার বিশ্বাস—একমাত্র আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই বোধ হয় আপনার অবতার। নিতাইগৌর জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া পতিত-পাবন হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার কাছে তাঁহারাও পরাস্ত। আমার মনে ধারণা ছিল না যে আমার উদ্ধারকর্ত্তা কেহ আছেন। যেমন হিরণ্যকশিপুকে উদ্ধার করিবার জন্য নৃসিংহ অবতার হইয়াছিলেন, তেমনি আমাকে উদ্ধারের জন্য আপনার অবতার এটি ধ্রুব সত্য।

বাবাজী। পাগল! অমন কথা বলিলে অপরাধ হয়। 'বৃক্ষদ্বারে কৃপা করেন ইহা তাঁহার গুণ।' যা হউক, যদি নিতাই কৃপা করেন, তবে কাল দেখা যাইবে।

শুনিয়া আনন্দের আনন্দ আর ধরে না। দ্রুতগতি নবদ্বীপদাদার নিকট গিয়া বলিলেন, "দাদা! বাবা কাল মন্ত্র দেওয়ার কথা বলিলেন; আমার কিরূপ কি যোগাড় করিতে হইবে?" দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি আর করিতে হইবে! গলায় মালা পরিতে পারিবে কি?"

আনন্দ। দাদা! আমি ত কিছুই পারি নাই বা পারিবও না, তোমার যদি কৃপা-কটাক্ষ হয়, তবে এমন কি কার্য্য আছে যাহা না হইতে পারে?

নবদ্বীপ। ভাই! আমি কে? নিতাই যাহা করেন তাহাই হইবে। গলায় মালা এবং মস্তকে শিখা এ ত চাই আর কি বলিব? অপর যাহা কিছু দাদাকে জিজ্ঞাসা করিও।

এইরূপে সেদিন গত হইল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া আনন্দবাবু

চাকরকে হুকুম দিলেন, "বাবা! একটি পরামাণিক ডেকে নিয়ে আয় ত?" শুনিবামাত্র চাকর পরামাণিক ডাকিয়া আনিলে আনন্দবাবু পরামাণিককে বলিলেন, "বাবা! আমার মাথায় একটা শিখা রাখিয়া মাথা মুড়াইয়া দাও ত।" পরামাণিক শুনিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু! যথার্থই বলিতেছেন, না বৈরাগীদিগকে ঠাট্টা করিতেছেন?"

আনন্দ। কেন বাবা! আমার কি ঐরূপ বেশ হওয়া অসম্ভব মনে করিতেছ?

পরামাণিক। বাবু! আমি আপনার চাকর, কি আর বলিব? আপনার ওরূপ বেশ হওয়া ত দূরের কথা, আপনার মুখে ঐরূপ কথাটা শুনাও অসম্ভব মনে করিতেছি।

আনন্দবাবু সজলনয়নে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! মহতের কৃপা-কটাক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব আজ সম্ভব হইয়াছে। আজ আমার পুনর্জন্মদিন। আর কালবিলম্ব না করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও এবং তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে মতি ভক্তি থাকে।

পরামাণিক করযোড়ে আনন্দবাবুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবু! আজ আমি ধন্য হইলাম। এমন মহাপুরুষ জগতে আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আজ আপনার কৃপায় আমরা তাঁহার দর্শন-স্পর্শে কৃতার্থ হইলাম।" বলিয়া আনন্দবাবুর আদেশ অনুসারে উঁহার মাথা এবং মুখ ক্ষৌর করিয়া দিল। আনন্দবাবু অতি সত্বর কাঠজুড়ি নদীতে স্নান করতঃ মুণ্ডিত মস্তকে নবদ্বীপদাদার চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে দাদা উঁহাকে আস্তেব্যস্তে উঠাইয়া আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে পুরী অবস্থানকালে বাবাজী মহাশয়ের জন্য নূতন মালা প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু ইনি তাহা পরেন নাই, উহা সঙ্গেই ছিল। ঐ নূতন মালা আনন্দকে দিবার প্রস্তাব হওয়ায়

আনন্দবাবু "ও মালা আমি পরব না" বলিয়া দ্রুতপদে বাবাজী মহাশয়ের নিকটে গমনপূর্ব্বক ইঁহার চরণতলে পতিত হইলেন।

বাবাজী মহাশয় প্রথমে আনন্দবাবুকে চিনিতেই পারিলেন না। পরে বলিলেন—"এ কি! তোমাকে এরূপ করিতে কে বলিল?"

আনন্দ। বাবা! কে আর বলিবে? আপনি ভিন্ন আমার আর বলিবার কে আছে? আমাকে আপনার গলার মালা দিতে হইবে।

বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাবা! বেশ ত আছ, আবার মালা পরা কেন? অনেক সময় সাহেবদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহারা হয় ত উপহাস করিবে।

আনন্দ। বাবা! সন্তানকে অমন করিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? লোকের নিকট প্রতিষ্ঠার বা প্রশংসার আশায় এতদিন অনেক করিয়াছি; কিন্তু কই শান্তি ত পাইলাম না! প্রকৃত পথও পাইলাম না। যদি আপনি প্রকৃত পথ দেখাইয়া নিষ্কপটে সেই পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন, তবে আমার বিশ্বাস—আর কেহই উপহাস করিবে না। আমাদের অন্তঃকরণ দুর্ব্বল, তাই আমরা কোনও রাজা বা রাজপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইলে ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাই। এমন কি মালা তিলকাদি স্ব স্ব ধর্ম্মচিহ্ন পর্য্যন্ত গোপন করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভাবিয়া দেখি না যে এই কপটতার জন্য আমি প্রভুর নিকট এবং সেই রাজা বা রাজপুরুষের নিকট এই উভয় দিকেই কত অপরাধী হইলাম। আমার যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রকৃত নিষ্ঠা থাকে, আমি যদি নিষ্কপটভাবে প্রভুকে ডাকিতে পারি বা তদনুকূল বেশাদি করি তবে লোকে আমাকে উপহাস করিবে কেন? করিলেও তাহাতে আমার আনন্দ বই নিরানন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শুনিয়া বাবাজী মহাশয় অতিশয় আনন্দিতভাবে আনন্দবাবুকে

আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা! আজ আমি তোমার মুখে অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও নির্ভরতার কথা শুনিয়া যে কত সুখ পাইলাম তাহা আর কি বলিব? মনে দুঃখ করিও না, আমি তোমার মুখে এই কথা শুনিবার জন্যই ঐরূপভাবে বলিয়াছিলাম। তোমার সরলতা এবং নিষ্কপটভাবে আমি তোমার নিকট বিক্রিত হইলাম। এখন আমি তোমার, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" বলিয়া নিজের গলার পাঁচকণ্ঠী মালা ছিঁড়িয়া এক-জনকে বলিলেন, "আনন্দকে পরাইয়া তিলক করিয়া দাও।" বাবাজী মহাশয়ের আদেশে আনন্দবাবুকে তিলক করিয়া মালা পরাইয়া দেওয়া হইল এবং বাবাজী মহাশয়ের গলায় ঐ নূতন মালা পরাইয়া দিবামাত্র ইনি নাম ধরিলেন। সঙ্গিগণ আসিয়া নামকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। মাতামাতি-ভাবে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

যথাসময়ে বাবাজী মহাশয় আনন্দবাবুর কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। অনুতাপানলে উঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রের আবর্জ্জনা দগ্ধ এবং নয়নজলে বিধৌত ও সরস হওয়ায় আজ উহাতে বীজ পতিত হইবামাত্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল —উঁহার দেহে সমকালীন অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল; এতই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন যে, উঁহাকে সাম-লান সুকঠিন হইয়া পড়িল। সঙ্গিগণ নামে উন্মত্ত, আনন্দবাবু ভাবে উন্মত্ত। আনন্দের আজ যেন আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠিল। দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া বিভোরভাবে নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন দেখিয়া নবদ্বীপদাদা প্রেমানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন! কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। বাবাজী মহাশয় অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে এক একবার 'জয় নিতাই' বলিয়া যেমন হুঙ্কার করিতেছেন, অমনি সংকীর্ত্তন-তরঙ্গ অতি প্রবলভাব ধারণ করিতেছেন। আনন্দবাবু কিন্তু অচৈতন্য—দুইটি চক্ষু হইতে অবিরতধারে অশ্রু ঝরিতেছে—সর্ব্বাঙ্গ

পুলকাবলি-বিভূষিত—মুখখানি রক্তবর্ণ এবং প্রফুল্ল। এক একবার চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, আর এরূপভাবে কম্পিত হইতেছেন যে, দেখিয়া লোকসকল বিস্মিত। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় উহার হাত দুইখানি ধরিয়া উঠাইলেন। আনন্দবাবু অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলে ইনি নানারূপ প্রবোধবাক্যে উহাকে আশ্বস্ত করতঃ উঁহার হাত ধরিয়া প্রেমানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন; আনন্দবাবুও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। আনন্দবাবুর অবস্থা দর্শনে আগন্তুক লোকসকল বিমুগ্ধ, স্তম্ভিত ও বিস্মিতভাবে মহাপুরুষের কৃপার জয় দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় নাম সমাপ্তি করিলেন।

আনন্দবাবুর বৈঠকখানায় চারি হাত দীর্ঘ দুই হাত প্রস্থ একখানি আয়না আছে। বাবাজী মহাশয় আনন্দবাবুর হাত ধরিয়া উক্ত আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! আনন্দবাবু অতি দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, তাহাতে আজ মালা তিলক শিখা প্রভৃতি ধারণ এবং মস্তক মুণ্ডন করায় যেন সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি হইয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের তাৎকালিক শোভার কথা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে একবার বাবাজী মহাশয়ের বামে আনন্দকে দেখিতেছে, সেই আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেছে। হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের মনে কি ভাবের উদয় হইল—নিজ বাম হস্তখানি আনন্দের স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন! চারিদিকে ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। আজ আনন্দ সে আনন্দ নাই—আজ যেন অপ্রাকৃত আনন্দের মূর্ত্তি হইয়াছেন! ধন্য কৃপা! ধন্য মহাপুরুষের শক্তি-প্রভাব! আজ আনন্দের অবস্থা দর্শনে অতীতকালের রত্নাকর, অজামিল বা জগাই মাধাই উদ্ধারের কথা মনে উদয় হইতেছে। আহামরি! প্রভুর নিত্য লীলাখেলার কি মাধুরী! ইহা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে! অদ্যাপিহ

সেই লীলা করে গোরারায়। বরং প্রকট হইতে অপ্রকটে অধিক মাধুর্য্য—অধিক শক্তির বিকাশ। আমরা অন্ধ, বধির, অবিশ্বাসী জীব। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও দেখি না—শুনিয়াও শুনি না—বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না! মহানুভব ভক্তগণ একবার নিমীলিতনেত্রে আনন্দ মিত্রের তাৎকালিক অবস্থাটি ও মূর্ত্তিখানি মনে মনে ভাবিয়া দেখুন। যে আনন্দের প্রতাপে সহরের সাধু, বৈষ্ণব, ভিখারীগণ সশঙ্কিত—ভয়ে লুক্কায়িত, সেই আনন্দ আজ হাত তুলিয়া সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতেছে। গলায় পাঁচকণ্ঠীমালা, কপালে হরিমন্দির তিলক, নয়নে অশ্রু, অঙ্গে পুলক ও কম্প! যে ব্যক্তি সাধুবৈষ্ণব দেখিলে ভণ্ড বই বলিত না, সে আজ বৈষ্ণব নাম শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ নমস্কার-পরায়ণ। ধন্য নবদ্বীপদাদা! তোমার অহেতুকী কৃপার জয় হউক। যে বৈঠকখানায় পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ এবং পরবিত্তাপহরণ প্রভৃতির পরামর্শ হইত, সেই বৈঠকখানা আজ সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। যে বৈঠকখানা বাবুভায়াদের জুতার শব্দ ও আলবোলার শব্দে মুখরিত হইত, সেই বৈঠকখানা আজ খোল করতাল-ধ্বনিতে পরিপূরিত। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্' ইত্যাদি যাহা আমরা শুনিয়াছি, আজ আনন্দবাবুর পরিবর্ত্তন দর্শনে সে সকল বাক্যও যেন সামান্য বলিয়া মনে হইতেছে। আনন্দবাবু এক একবার সেই আয়নায় নিজমূর্ত্তি দেখিতেছেন আর পূর্ব্বকার পোষাক পরিচ্ছদকে ধিক্কার দিতেছেন। দুটি চোখের জলে মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে। ক্ষণকাল পরে আনন্দবাবু কার্য্যানুরোধে যেমন বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন, অমনি নবদ্বীপদাদা তথায় উপস্থিত হইয়া আনন্দবাবুর পত্নী ও চাকরাণী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মা সকল! তোমরা আজ তোমাদের বাবুর চেহারা দেখিয়া যথার্থ বল দেখি, আগের মূর্ত্তি ভাল ছিল, না এই মূর্ত্তি ভাল?" তখন সকলেই

একবাক্যে বলিয়া উঠিল, বাবুর আগের মূর্ত্তি দেখিলেই যেন আমাদের ভয় হইত, এমন কি কথা বলিতে সাহস হইত না। আর এ যেন মাধুর্য্যের মূর্ত্তি। দর্শনমাত্রই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। আনন্দবাবুর পত্নী আসিয়া নবদ্বীপদাদার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা! আমি এমন কি অপরাধ করিলাম যে আমার উদ্ধার হইল না? আমি কি এইরূপ পশুই থাকিব?" শুনিয়া নবদ্বীপদাদা গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি? পতিতপাবন অবতারে কেহই বঞ্চিত হইবে না।" এইরূপ ভাবে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঠাকুরের ভোগরাগ শেষ হইলে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। আনন্দবাবু বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত নিজে পাইলেন এবং বাটীস্থ সকলকে দিলেন। এইরূপভাবে প্রত্যহ বাবাজী মহাশয়ের, নবদ্বীপদাদার এবং বৈষ্ণবদিগের অধরামৃত ও চরণামৃত দ্বারা আনন্দবাবুর গৃহ পরিশুদ্ধ হইলে উঁহার প্রার্থনায় বাবাজী মহাশয় যথাসময়ে উঁহার পরিবারস্থ সকলকে মন্ত্রপ্রদান করিলেন। ক্রমে আনন্দবাবুর ভবনে সাত্ত্বিক আহার ব্যবহার ও সাত্ত্বিক আচারাদি দর্শনে কটকবাসী লোকসকল বাবাজী মহাশয়কে বিশেষভাবে ভক্তি করিতে লাগিল।

—*—

সদলে পুরী প্রত্যাবর্ত্তন

আনন্দ মিত্রের বাড়ীতে মাসাবধি কাল অতীত হইল। বাবাজী মহাশয় কোথাও যাইবার কথা বলিলেই আনন্দবাবু অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বলেন, "বাবা! আর কয়েকদিন থাকিতে হইবে।" এমন কি কেহ ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে আনন্দবাবু ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ফেলেন। একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় অতি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, এই সময় আনন্দবাবু দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র ইনি বলিলেন, "বাবা! আজ পুরী যাইতে হইবে। বহুদিন হইল জগন্নাথদেব দূরে রাখিয়াছেন; আজ তাঁহার জন্য মন বড়ই উতলা হইয়াছে। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে, যতদূর পার সাধুসঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে। অসত্য ব্যবহার, হিংসা, পরচর্চ্চা, পরছিদ্রান্বেষিতা, পরনিন্দা, পরের অনিষ্ট চেষ্টা প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। সর্ব্বদা নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে, কোনই বিপদ হইবে না। প্রভু মঙ্গলময় এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।" ইত্যাদি নানারূপ সদুপদেশ দান করিতে লাগিলেন। আনন্দবাবু কিন্তু বাবাজী মহাশয় যে প্রথমে বলিয়াছেন, শ্রীধাম পুরী যাইতে হইবে সেই কথাই চিন্তা করিতেছেন; গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! আর কিছুদিন এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অবোধ সন্তানকে একটু স্থির করিয়া গেলেই ভাল হইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! নিতাইচাঁদ সমস্ত পূরণ করিবেন। আজ আর বাধা দিও না।" বলিয়া সঙ্গিগণকে পুরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। এদিকে আগন্তুক ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্নে শ্রীধাম পুরী গমন করিবার মানসে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলেন। আনন্দবাবু সেদিন আর কাছারি যান নাই ; সুতরাং ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে চলিলেন। যথাসময়ে ষ্টেশনে পেঁাছিয়া টিকিট করা হইলে আনন্দবাবু বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আমি কিছুতেই থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনার সঙ্গে লইতে হইবে।" বাবাজী মহাশয়ের নানারূপ প্রবোধবাক্যে উঁহাকে আশ্বস্ত করতঃ কয়েকদিন পরে একবার পুরী যাইবার আদেশ করিয়া ট্রেনে উঠিলেন। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়িয়া দিলে আনন্দবাবু দুঃখিত-চিত্তে নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ সেই ট্রেনে উঠিয়া সেই মধুময় সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া রহিলেন। স্ত্রীপুত্রাদি তাঁহাকে আনমনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার সেই বিরহ-ব্যাধি যেন ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। এদিকে যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া পুরী উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় সদলে অবতরণপূর্ব্বক ঝাজপীটা মঠে আসিয়া পেঁাছিলেন।

প্রাণবল্লভ মঠ প্রাপ্তি

পুরীতে আজ হইতে আবার নূতন আনন্দ চলিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রত্যহ সংকীর্ত্তন করিয়া নাম করিতে করিতে সমুদ্রস্নান ও মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। পুরীবাসী পাণ্ডা পুজারীগণ বাবাজী মহাশয়ের প্রতি এতই আকৃষ্ট যে, ইনি উপস্থিত না থাকিলে তাঁহারা যেন একটা বিশেষ অভাব বোধ করেন। এমন কি স্পষ্টই বলেন, "দেখুন, আপনি না থাকিলে জগন্নাথকে আমাদের ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। আমাদের বিশ্বাস—জগন্নাথ আপনাকে পাইলে বড়ই

সুখী থাকেন।” এইরূপ পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন উকীল শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ ঘোষ মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, “বাবা! আমার শরীরটা তত ভাল নয়। আমার ইচ্ছা—আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি। অতএব আমার এই বৃদ্ধ অবস্থার অনুরোধটি আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে। কবে দিন ধার্য্য করিবেন আমাকে আদেশ করুন।”

বাবাজী। বাবা! আমি কি বলিব? কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এ কাঠের পুতুলকে নিমিত্ত করিয়া নিতাইচাঁদ আপনাকে কৃপা করিবেন তিনিই জানেন।

প্রাণবল্লভ। বাবা! আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি পাঁজি দেখিয়াছি—কাল বেশ ভাল দিন আছে; অতএব কালই আমার বাসনা পূরণ করিতে হইবে। তবে কি কি যোগাড় করিতে হইবে আমায় আদেশ করুন।

বাবাজী। বাবা! এ সমস্ত কার্য্যে একমাত্র ভগবানের আরাধনা ব্যতীত আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। আপনি শিক্ষিত লোক, আপনিই ভাবিয়া দেখুন, প্রভু ভাবগ্রাহী, একমাত্র ভাব ভিন্ন তিনি আর কিছু আমাদের নিকট চান না। যাহার যেরূপ প্রাণের ভাব তাহাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে কৃপা করেন। আচ্ছা! তিনি যেরূপ করাইতে ইচ্ছা করেন করুন।

প্রাণবল্লভ। আমার ইচ্ছা—মঠে যে কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব আছেন, সকলে কাল এই স্থানে প্রসাদ পান।

বাবাজী। বেশ, আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে। তবে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ত মধ্যাহ্নে পাওয়া যায় না।

প্রাণবল্লভ। না, পূজারী দ্বারা এই স্থানে ঠাকুরের ভোগের আয়োজন করিয়া দিলে কোনও আপত্তি আছে কি?

বাবাজী। না বাবা! আপত্তি আর কি? তবে পূজারীটি একটু সম্প্রদায়ী দীক্ষিত ও সদাচারী হইলেই হইবে।

এই বলিয়া বাবাজী মহাশয় চলিয়া গেলেন। প্রাণবল্লভ বাবু চেষ্টা করিয়া সেইরূপ সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে রান্না আরম্ভ হইল। বেলা দশটার সময় বাবাজী মহাশয় নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাণবল্লভবাবু দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে ইঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইলেন। নামকীর্ত্তন হইতে লাগিল। আনন্দের অবধি নাই। অনেক শিক্ষিত উকীল মোক্তার-গণ আসিয়াছেন। সকলেই অত্যন্ত আনন্দ পাইলেন। এদিকে বাড়ীর মধ্যে একটি ঘরে নানাবিধ পূজার দ্রব্য আয়োজন করা হইয়াছে। ভক্তের বাসনানুসারে বাবাজী মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাহিরে নাম হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রাণবল্লভবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। বাড়ীর একটি চাকরাণী এবং আরও তিন চারিজন লোকও ঐ সঙ্গে মন্ত্রগ্রহণ করিল। যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপনান্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন যায়—একদিন সংবাদ আসিল, প্রাণবল্লভ-বাবুর শরীর বড়ই অসুস্থ। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমার বড়ই অভিলাষ যে আমার এই বাড়ীটি শ্রীশ্রীরাধা কান্ত জীউকে অর্পণ করিয়া আমি ভেক গ্রহণ করি। কারণ আমার বিশ্বাস—আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কেন আপনার স্ত্রী যখন বর্ত্তমান আছেন, তখন এত উতলা হইবার প্রয়োজন কি?" প্রাণবল্লভবাবু বলিলেন, "স্ত্রীর জন্য দেশে সম্পত্তি

আছে, আমার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি আমি নিজহাতে ভগবৎ উদ্দেশ্যে দান করিয়া যাইব এই অভিলাষ।” উঁহার স্ত্রীও এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করতঃ বিশেষ উৎসাহের সহিত বাড়ীটি লেখাপড়া করিয়া দিলেন। চারি পাঁচ দিন পরেই প্রাণবল্লভবাবুর দেহ ক্রমে অপটু হইতে লাগিল। কাজেই তাঁহার প্রার্থনানুসারে বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে ভেক দিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় ভেক গ্রহণের কয়েকদিন পরেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার মহোৎসবাদি করিয়া কিছুদিন পরে দেশে গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় ঐ বাড়ীটির নাম রাখিলেন **প্রাণবল্লভ মঠ**। স্থানটি অতি মনোরম দেখিয়া অনেক সময় বাবাজী মহাশয় ঐ মঠে যাইয়া থাকেন। এমন কি, এক একদিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিবার সময় হয় ত রাত্রে ঐ মঠেই শয়ন করিয়া থাকিতেন।

—o—

গদাধরদাসের পুনর্জ্জন্ম

একদিন বাবাজী মহাশয়ের মনে কি খেয়াল উদয় হইল—ললিতাদাসীকে বলিলেন, “দেখ, কাল অনেক বাবু ভক্তদিগকে প্রসাদ পাইবার জন্য বলিব মনে করিয়াছি; অতএব যাহাতে খুব শীঘ্র শীঘ্র ঠাকুরের ভোগের যোগাড় হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।”

ললিতা। আজ্ঞে কত লোক হইবে?

বাবাজী। লোকের হিসাবে তোমার কোন প্রয়োজন নাই। দুই মণ কৃষ্ণভোগ চাউলের অন্ন হইবে এবং সেই পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্য চাই। একা তোমাকে রান্না করিতে হইবে। ছোলার ডা'ল্, আলুর ও ছানার রসা প্রভৃতি চারি পাঁচখানা তরকারী ও লুচি পায়স হইবে।

ললিতা। রান্নার জন্য আমার সহিত আর একজনকে না দিলে বেলা অতিরিক্ত হইয়া যাইবে যে!

নানারূপ আপত্তির পর বাবাজী মহাশয় অগত্যা কুসুমমঞ্জরী দাসীকে সঙ্গে লইয়া দশটার সময় ভোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ললিতা দাসী বাজার হইতে সমস্ত জিনিসপত্র যোগাড় করাইতে লাগিলেন। সেদিন রাত্রে বড় হরিশ বাবুর বাড়ীতে সদলে বাবাজী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ। এদিকে বৈকাল বেলা হইতে চা'ল ডা'ল প্রভৃতি আমানিয়া হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় রাধাকান্ত দেবের আরতি দর্শন করিয়া সকলে পঙ্গতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এই সময় বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য গদাধর দাস নামক জাজপুর নিবাসী একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব মঠের ইন্দারার নিকট হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাবা! আমার সর্পাঘাত হইয়াছে, প্রাণ যায়! আমাকে রক্ষা করুন।" শুনিয়া সকলেই শশব্যস্তে সেস্থান হইতে বৃদ্ধকে ধরিয়া আনিলেন। অঙ্গনে আসিতে না আসিতেই বৃদ্ধ বাবাজী কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িলেন—উঁহার বর্ণ নীল হইয়া গেল—হস্ত-পদের সন্ধিসকল শ্লথ হইল—জিহবা প্রায় পাঁচ অঙ্গুলি পরিমাণে বাহির হইয়া পড়িল। পূজ্যপাদ অবধৌত জ্ঞানানন্দ স্বামীজীর শিষ্য গোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক ও কৃষ্ণানন্দ স্বামীজী একগোছা পাটের দ্বারা উঁহার পায়ের গোছা বাঁধিয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় উঁহার অবস্থা দর্শনে সকলকে নাম করিতে বলিয়া উঁহার পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিলেন। বাঁধন খুলিয়া দিবামাত্র সে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। উপস্থিত সকলেই বিমর্ষ। বাবাজী মহাশয় গদাধরকে সংকীর্ত্তনের মধ্যস্থলে শয়ন করাইয়া খুব জোরে নাম ধরিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে নামের এক অপূর্ব্ব রোল উঠিল। চারিদিকের লোকসকল চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঠাকুরের অঙ্গনমধ্যে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। যতদূর পর্য্যন্ত

নামের ধ্বনি গিয়াছে, ততদূর হইতে লোকসকল আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সংকীর্ত্তনকারিগণ ঠিক আলতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকলেরই মনের ধারণা—বৃদ্ধ গদাধর দাস মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গদাধর দাসের মস্তকে বাম পদ দ্বারা সজোরে এক লাথি মারিয়া আবার ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পদস্পর্শ পাইবামাত্র গদাধরের যেন অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কৃষ্ণানন্দ স্বামীজী একটু বিস্মিত হইয়া কেবল বাবাজী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন, এমন সময় অলক্ষিত ভাবে বাবাজী মহাশয় পুনর্ব্বার গদাধরের মস্তকে এক পদাঘাত করিলেন। যেমন পদাঘাত অমনি গদাধর সসম্ভ্রমে উঠিয়া বাবাজী মহাশয়কে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কিন্তু এবার সংকীর্ত্তনের মধ্যস্থানে গিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। গদাধরদাস সুযোগ পাইয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে স্থির করতঃ তুলিয়া কীর্ত্তনে নাচিতে বলায় তিনি অতি অপূর্ব্বভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্! যে গদাধর দাস কখনও এক পা নৃত্য করিতে জানেন না, তিনি আজ এমন সুমধুর ভাবে নৃত্য করিতেছেন যে, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে নাম সমাপ্ত হইল। তখন গদাধর দাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আজ আমার নির্দ্ধার্য্য মৃত্যুদিন ছিল। আমার একখানি কোষ্ঠী আছে, ঐ কোষ্ঠীখানির ফলাফল সমস্ত সত্য হয়। তাহাতে লেখা আছে—একষট্টি বৎসর বয়সে সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ পায়ের পশ্চাৎ ভাগের শিরার উপর সর্পাঘাত হইয়া প্রাণ বহির্গত হইবে। আমি এদেশের অনেক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগকে উহার প্রতিকার করিবার

জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু সকলেই বলিয়াছেন যে, আমার আর ভোগকাল নাই। ঐ একষট্টি বৎসরই শেষ ভোগ। তাই আমি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার দিনটি ঠিক মনে ছিল ; কিন্তু আমি কাহাকেও কিছু বলি নাই। আজ যেমন ইন্দারার কাছে গিয়াছি, অমনি কোথা হইতে ঐ সাপটি আসিল ভগবান্ জানেন—ঠিক দক্ষিণ পায়ের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিল। আমি তখনই বুঝিলাম যে আমার জীবন এই পর্য্যন্ত। কি আশ্চর্য্য! আপনি আমাকে দৈবের অগোচর ভাবে বাঁচাইলেন!"

বাবাজী। পাগল! ও কথা বলিতে নাই। নাম নামী অভিন্ন; এই নাম হইতেই তোমার সর্ব্ব-আপদ শান্তি হইয়াছে।

গদাধর। বাবা! আমি ত প্রত্যক্ষ দেখিলাম, আপনি আমাকে ফিরাইয়া আনিলেন। আমি আপনার ওকথায় ভুলিব কেন?

বাবাজী। বাবা! প্রভুর কার্য্যে দাসের উপর আরোপ করিতে নাই; উহাতে অপরাধ হয়।

গদাধর। আমি যদি প্রতারণাবাক্য বলি তবে ত আমার দোষ হইবে?

বাবজী। তোমার সেই কোষ্ঠীখানি আছে কি?

গদাধর। আজ্ঞে আছে বই কি।

বাবাজী। আচ্ছা কাল দেখা যাইবে। তুমি সম্প্রতি নিমন্ত্রণে যাইবে কি?

গদাধর। আজ্ঞে আমি আপনার, এ দেহ আপনার, যাহা অনুমতি করেন তাহাই করিব।

বাবাজী। তবে চল, মহাপ্রসাদ পাইলে শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় তোমার সমস্ত ভাল হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া নাম করিতে করিতে বড় হরিশবাবুর বাড়ী মহাপ্রসাদ পাইতে গেলেন। গদাধরও সেই সঙ্গে গেল। পরদিবস প্রাতে একজন উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাঁহা দ্বারা গদাধর দাসের কোষ্ঠী গণনা করান হইল। বাস্তবিক গত রাত্রের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত উহাতে লেখা আছে। ঐ দিনের পর আর উহার আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিণ করা হয় নাই। সকলে অবাক্! এরূপ কোষ্ঠীর ফল খণ্ডন কেহ কখন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। গদাধরের সেই ক্ষতস্থানে একটু মাত্র বেদনা তিন চারি দিন পর্য্যন্ত ছিল; কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের দুইটি চক্ষু রক্তবর্ণ এবং মস্তিষ্ক এতই গরম হইল যে, তিনবার স্নান করিয়াও রাত্রে নিদ্রা হয় না। নানারূপ যত্নে তিন দিন পরে শরীর সুস্থ হইল। গদাধর দাস দুই বৎসর পুরীতে থাকিয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিলেন। তথায় আড়াই বৎসর জীবিত থাকিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে দেহ রক্ষা করিলেন।

—০—

অটলদাসের সহিত মিলন

একদিন বেলা অনুমান বারটার সময় একটি গৌরবর্ণ যুবক আসিয়া মঠে উপস্থিত হইল। যুবকটি শিক্ষিত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু কি যেন অন্বেষণ করিতে আসিয়াছে। কাহাকেও কিছু বলা কহা নাই—কেবল সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ আশ্রমের কর্ত্তা কে? সকলেই বলিতেছেন, "আপনি বিশ্রাম করুন—মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন, কর্ত্তা আসিলে দেখা হইবে।" যুবক কিন্তু তাহাতে তত রাজী নয়। কি করে! অগত্যা স্নান করিয়া মহাপ্রসাদ পাইল। বাবাজী মহাশয়ের সেদিন অন্যস্থলে নিমন্ত্রণ থাকায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন আশ্রমবাসী, আগন্তুক যুবকটিকে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। যুবকটি তখন ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সম্মুখে উপবেশন করিল। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার নাম কি?"

যুবক। আজ্ঞে আমার নাম অনাথবন্ধু দাস।

বাবাজী। তোমার নিবাস?

অনাথ। আজ্ঞে কলিকাতার ভবানীপুর।

বাবাজী। কোন চাকরী করিয়া থাক কি?

অনাথ। আজ্ঞে আমি বি, এ পাশ করিয়া আর কোন চাকরী করি নাই, প্রভু কি করাইবেন তাহাও জানি না। সম্প্রতি আমার গুরুদেব শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া না কি পুরীধামে আপনার নিকট

আছেন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনিই কি এই আশ্রমের কর্ত্তা?

বাবাজী। বাবা! তুমি শিক্ষিত, তোমার ঐরূপ কথা বলা উচিত হয় নাই; কারণ জীব ভগবানের ক্রীড়ার পুতুল। জীব কখনও কর্ত্তা হইতে পারে না। জোর করিয়া কর্ত্তা সাজিলেও সেটা ভুল।

অনাথ। কেন? আমাদের যে কতকগুলি স্বাধীন শক্তি আছে, তদ্দ্বারা আমরা কি স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে পারি না?

বাবাজী। বাবা! আমাদের কি কি স্বাধীন বৃত্তি বা শক্তি আছে, যা তুমি বুঝেছ একবার আমাকে বুঝাইয়া দাও দেখি!

অনাথ। কেন? আমরা ইচ্ছা করিলে অপরের উপকার করিতে পারি, আবার অনিষ্টও করিতে পারি। জ্ঞান-উপার্জন, তীর্থপর্য্যটন, অর্থাদিসংগ্রহ, সদ্ব্যয় বা অসদ্ব্যয় ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই ত দুইটি শক্তি অর্থাৎ ভগবৎ-ইচ্ছা এবং নিযেচ্ছা বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ রহিয়াছে।

বাবাজী। জীব সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষের অণু অংশ লাভ করিয়াছে, যাহার বলে 'আমি আমার' এই প্রভুত্ব জ্ঞান করিয়া থাকি। ভগবানের যেরূপ শক্তি আছে, জীবেরও সেইরূপ শক্তি আছে। ভগবান্ যাহা যাহা করিতে পারেন, জীবও সেই সমস্ত করিতে পারে। তবে তিনি পূর্ণ পূর্ণরূপে করিতে সমর্থ; জীব অণু পরমাণুরূপে করিতে সমর্থ। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, এই যে জীবের স্বাধীনতা বা ঈশবরত্ব, অথবা ইচ্ছাশক্তি, ইহা সম্পূর্ণ পরাধীন কি না। আমি ইচ্ছা করিলেই কোনও কার্য্য করিতে পারি কি? ইচ্ছা করিলেই যদি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যাইত, তবে লোক দরিদ্র থাকিত না? স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে সন্তান-উৎপত্তি হয়; কিন্তু কত লোক বহু বহু কামনা করিয়াও একটি সন্তান লাভ করিতে পারিতেছে না কেন? আবার হয় ত একস্থানে সন্তান না হইবার জন্য

কত চেষ্টা ক'রছে ; কিন্তু কই কৃতকার্য্য হ'তে পারছে কি ? একজন বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য কত চেষ্টা ক'রছে—কত অর্থব্যয় ক'রে মাষ্টার পণ্ডিত রাখছে ; কিন্তু তার কোনই জ্ঞান হচ্ছে না ; আবার এক জনের হয় ত সামান্য চেষ্টাতেই সুন্দর জ্ঞান জন্মেছে। আমরা যে দেহ দ্বারা অপরের ইষ্ট অনিষ্ট করিব, সেই দেহের উপর আমাদের নিজ কর্তৃত্ব আছে কি ? তুমি ইচ্ছা ক'রে তোমার বাল্য বা কৈশোর অবস্থা নিয়মের অতিরিক্ত দু'দিন রাখতে পারতে কি ? আবার এই যৌবনকাল নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত এক মুহূর্ত্তও রাখবার শক্তি আছে কি ? যখন দাঁত ওঠে নাই, তখন বহু চেষ্টা ক'রে ওঠাবার কারও শক্তি ছিল কি ? আবার যখন উঠল তখন বাধা দেবার বা যখন পড়ে যাবে তখন রাখবার ক্ষমতা কারও আছে কি ? এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যে জীবের কোনও স্বাধীনতা নাই। আপাততঃ দেখলে বোধ হয় যেন জীবই কার্য্য করছে ; কিন্তু ভেবে দেখলে সে ভ্রম থাকিতে পারে না। আমি হয় ত একজনের ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যদি আমার দেহ অচল হয় বা প্রাণবায়ু বাহির হয়ে যায়, কি করতে পারি ? তবেই দেখ, এই স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলবে, না সম্পূর্ণ অধীনতা বলবে ? এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে আচার্য্যগণ বলেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

'জীব কৃষ্ণনিত্যদাস।' জীবের বিন্দুমাত্র নিজের কর্তৃত্ব নাই।

অনাথ। জীবের স্বতন্ত্র কার্য্যকারিত্ব শক্তি না থাকলেও মানসিক বৃত্তি ত আছে। মানসিক ইচ্ছা ত আর কাহারই অধীন নহে ? যেমন কোনও বলবান জীব দুর্ব্বল জীবের উপর অত্যাচার করছে। সে

তাহার কোনরূপ শারীরিক প্রতিকার করতে না পারলেও তার মানসিক ইচ্ছা ত নিশ্চয়ই হচ্ছে ?

বাবাজী। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। এই মন ও বুদ্ধি জড় পদার্থ। চৈতন্য শক্তি ভিন্ন উহারা কোনই কার্য্য করতে সমর্থ হয় না। আমরা ভ্রমান্ধ জীব, সহজে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী ভগবৎসত্তা উপলব্ধি ক'রতে না পেরে মনের বা বুদ্ধির উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে সেটা আমাদের ভুল ; জীবের যত কিছু কার্য্য সবই ভগবৎ-সত্তার অধীন। চৈতন্যশক্তি না থাকলে মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গণ কোনও কার্য্য ক'রতে সমর্থ হয় না।

অনাথ। আচ্ছা ! সংসার পরিত্যাগ ক'রে বৈরাগ্য না ক'রলে কি ভগবানের উপাসনা হয় না ?

বাবাজী। কে ব'লল যে সংসার না ছাড়লে ভগবানের উপাসনা বা ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না ? গোপীগণ বা ব্রজবাসীগণের মধ্যে কয়জন গৃহ-ত্যাগী ছিলেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, জনক, পৃথু প্রভৃতির কি ভগবানের উপাসনা বা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় নাই ? সংসারত্যাগ ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতি কারণ হ'তে পারে না। তবে উপাসনা করা চাই। ভগবানের আরাধনা ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতি কারণ এ কথা সত্য। সেই আরাধনা যার যেরূপে সুবিধা হয় সে সেইরূপে ক'রে থাকে। সংসারে থেকে যার সুবিধা হয়, সে কেন সংসার পরিত্যাগ ক'রে বৈরাগী হবে ? আরও দেখ, সংসারে থাকলে অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ত আর চিন্তা ক'রতে হয় না। কাজেই আমার মতে সংসারে থাকলে আরাধনার অনেক সুবিধা হয়।

অনাথ। তবে আপনি সংসার পরিত্যাগ করেছেন কেন ?

বাবজী। বাবা! আমি দেখলাম, আমার পক্ষে এই সুবিধা; কারণ বেশ খেতে পাওয়া যায়। লোকের নিকট খুব প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, তাই পেটের দায়ে বৈরাগ্য।

অনাথ। এই যে আমার মত যুবক ছেলেরা, ইহারা কেন সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে? ইহারা যদি সংসারে থাকিয়া অর্থাদি উপায় দ্বারা দুঃখী দরিদ্রের নানারূপ উপকার করিত, তবে জগতের কত মঙ্গল হইত! এ বিষয়ে আপনার উপদেশ দান করা উচিত। সকলেই যদি এইরূপ বৈরাগ্য করিবে তবে পিতামাতা ভাই বন্ধু যে অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইলেন, তাহার সার্থকতা হইল কই?

বাবাজী। বাবা! ভগবান্ যাহাকে যে মুহূর্ত্তে যাহা করাইবেন, সে তদতিরিক্ত কিছুই করিতে সামর্থ হয় না। তুমি আসিয়াছ একজনকে বৈরাগ্যপথ হইতে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য। প্রভু যদি ইচ্ছা করেন এবং প্রভুর কৃপায় তাহার বৈরাগ্য যদি খাঁটি হয়, তবে হয় ত তাহাকে লইয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে তোমাকেও এই পথে রাখিয়া দিতে পারেন।

অনাথ। আমি কখনই এ পথে আসিব না। কারণ যাঁহারা এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখাইলেন, তাঁহাদেরও ত কিছু উপকার করা চাই। সংসারে সৎপথে থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করিলেই হইল। সংসার ছাড়া আমার গুরুদেবের মত নহে।

এইরূপে সে দিন গত হইল। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় স্নানাদি শেষ করতঃ নামকীর্ত্তন করিতে করিতে সদলে মন্দিরে গমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত অনাথবাবুও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গমন করিবামাত্রই জগন্নাথদেবের দর্শন হইল। আজ বাবাজী মহাশয়ের সংকীর্ত্তন যেন অন্য রকম; কেবলই দর্শনজাতীয় ভাষা বা তদ্জাতীয় কথা, সমস্ত সাধন হইতে ভক্তিমার্গে সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব,

মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ইত্যাদি। অনাথবাবু কিন্তু ক্রমেই যেন কেমন হইয়া যাইতেছেন! তিনি এতদিন যে ভাবে চলাটা জীবনের উন্নতির সোপান মনে করিয়াছিলেন, ক্রমেই সেটা যেন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি যে ভাবে সংসার-আশ্রম করিতে যাইতেছিলেন, এবং অন্যকে উপদেশাদি দিতেছিলেন, সেটা যেন তাঁহার ভুল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের সেই সর্ব্বদর্শন সম্বলিত শাস্ত্র ও যুক্তি পূর্ণ এক একটি কথা যেন তাঁহার হৃদয়ে বাণবৎ বিদ্ধ হইয়া কুসংস্কাররূপ শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে লাগিল। ক্রমে চোখে জল আসিল— অতি ব্যাকুলভাবে সংকীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন; সংকীর্ত্তন-অন্তে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমার বন্ধন মোচন করুন, আমার আর সেই সংসার-কূপে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হইতেছে না" ইত্যাদি নানারূপ কাতরোক্তি শ্রবণে বাবাজী মহাশয়ের হৃদয় দ্রব হইল। অনাথবাবুর বিশেষ আগ্রহে তাঁহাকে নিতাই-গৌরাঙ্গ মন্ত্র প্রদান করিলেন। অনাথবাবু চিরজীবনের মত বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। আর তাঁহার সংসারে ফিরিয়া যাওয়া হইল না; যাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণব সেবা, গুরু-সেবা ও ভগবৎ-সেবা কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে বাবাজী মহাশয় প্রথমে অনুমোদন করিলেন না; কিন্তু আনন্দবাবুর সনির্ব্বন্ধ ব্যাকুলতায় বিচলিত হইয়া তাঁহাকে ভেক দিয়া দিলেন। আশ্রম ত্যাগের পর উঁহার নাম হইল **অটলবিহারী দাস**। অটল সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেন। তাঁহার গুরুনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি অতুলনীয়

অটল শিক্ষিত লোকের নিকট বলিতেন, "দেখ ভাই, তোমরা বাবাজী মহাশয়ের কথায় অন্ধবিশ্বাস করিও না। বেশ্ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া লও। বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম কেবল অন্ধবিশ্বাসের বা অশিক্ষিতের ধৰ্ম্ম বলিয়া মনে করিও না। বাবাজী মহাশয় কাহাকেও প্রলোভন দেখাইয়া বৈরাগী করান, এ কথা মনে করিও না। যাহারা বৈরাগ্য করে, তাহারা বিশেষরূপে বুঝিয়া সুঝিয়াই করে। তাহার দৃষ্টান্ত আমি নিজে।" এইরূপে অটলদাস শিক্ষিত সমাজেও বিশেষ আদরের পাত্র হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ-সুখ যে কত আনন্দপ্রদ, তাহা তিনি বিশেষরূপে লোককে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

এইরূপভাবে কিছুদিন যায়, একদিন বাবাজী মহাশয় অটলদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা অটল! যাঁহার আদেশ বা কৃপায় তুমি শ্রীধামে আসিলে, তাঁহাকে কোনরূপ খবর দিয়াছ কি?"

অটল। আজ্ঞে কই তা ত কিছুই দিই নাই। দিলেই আবার সংসারের নানারূপ ঝঞ্চাট আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং আমার মতে তাঁহাদিগকে না জানানই ভাল।

বাবাজী। তাহা হইলে তোমার মতে কি বৈরাগ্যটা সংসারকে না জানাইয়া গোপন করাই দরকার?

অটল। আজ্ঞে তা বই কি? সংসারের লোক জানিলেই নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। যত নির্ঝঞ্চাটে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

বাবাজী। যখন প্রকাশ হইবে তখন কি করিবে? এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা! তুমি বৈরাগ্য জিনিষটি এতই দুৰ্ব্বল মনে করিয়াছ যে সামান্য একটু বাধা পাইলেই পরাস্ত হইয়া যাইবে? অন্য কোনও বস্তু হইলেও হইতে পারে; কিন্তু বৈরাগ্য কখনও লুকাইয়া হয় না। যে বৈরাগ্য বাধাবিঘ্নকে লুকাইয়া করা হয়, আমার বিশ্বাস—উহা কখনও

স্থায়ী হইতে পারে না। যদি প্রকৃতই মনে বৈরাগ্য আসিয়া থাকে, তবে তোমার গুরুদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক কৃপা ভিক্ষা চাও, বস্তু দৃঢ় হইবে। ধ্রুব যখন বনে গমন করেন, তখন নারদ তাঁহার বৈরাগ্য পরীক্ষার জন্য কত মতে প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন! ধ্রুব ত বালক, কই দেবর্ষি তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন কি? যাক্, কাব্যতীর্থ মহাশয়কে একখানা পত্র দাও।

বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে অটল নিজের যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করিয়া কলিকাতায় একখানি পত্র দিলেন। কিছুদিন পরে উঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিপদ বাবু শ্রীধামে আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে অটলকে এবং কাব্যতীর্থ মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতাকে একসঙ্গে কলিকাতায় লইয়া যান। দৈবচক্র এবং মহৎ শক্তিপ্রভাবে তাঁহারও মতিপরিবর্ত্তন হইয়া গেল; একদিন বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা! আমার আর সংসারে যাইবার ইচ্ছা নাই, বড়ই তীর্থভ্রমণের সাধ হইয়াছে।" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁটিয়া, না রেলপথে যাইবার বাসনা?"

হরিপদ। আজ্ঞে সে সব আমি জানি না, আমি আপনার চরণে ভার দিলাম, এখন আপনার যেরূপ ইচ্ছা!

বাবাজী মহাশয় আর কিছুই বলিলেন না। তিন চারিদিন যায়, একদিন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা! আমার মনে বড়ই বাসনা হইয়াছে যে আমি একটু তীর্থ ভ্রমণ করি, আপনি আমায় এমন একটি বিশ্বাসী লোক দিন, যে আমাকে একটুযত্নপূর্ব্বক সকলস্থান দর্শন করাইয়া আনে। আমি তাহার সকল ব্যয়ভার বহন করিব।" বাবাজী মহাশয় অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিলেন— "হা নিতাই! তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, কখনও কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখ না। আহা মরি দয়ার বালাই যাই!" বলিয়া হরিপদ বাবুকে বৃদ্ধার

সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে পাঠাইয়া দিলেন। দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয় এই সংবাদে বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! যাহাকে পাঠাই সেই আর ফিরিয়া আসে না! আচ্ছা, এইবার আমি নিজে গিয়া একবার দেখি যে, সেখানে কি কাণ্ড হইতেছে।" বলিয়া একটু ক্রুদ্ধভাবে পুরী আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত আলাপ ব্যবহারে এবং অটল ও উঁহার তৃতীয় ভ্রাতার অবস্থা দর্শনে যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। চার পাঁচদিন মঠে থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করতঃ বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন।

এই হইতেই কাব্যতীর্থ মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। এনন কি তাঁহার গর্ভধারিণী যদি কখনও স্নেহের বশে পুত্রের বৈরাগ্য হেতু বাবাজী মহাশয়ের প্রতি কোনওরূপ কটাক্ষ করিতেন, অমনি তিনি বলিতেন, "মা! আপনি জানেন না, যদি কখনও সেই মহাত্মার দর্শন পান তখন দেখিবেন—তাঁহার অমানুষিক শক্তি। আমি অনেক দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু ওরূপ মহাপুরুষ দর্শন আমি আর কোথাও পাই নাই। পূর্ব্বজন্মের বিশেষ সুকৃতি এবং মাতাপিতার আশীর্ব্বাদ না থাকিলে অমন মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রয় ঘটে না। এমনই আশ্চর্য্য! মূর্ত্তিখানি দেখিলেই মনপ্রাণ গলিয়া যায়। আর সংসারের কথা মনে থাকে না। ইচ্ছা হয় চিরজীবনের মত ঐ শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া জন্ম সফল করি। অপরের কি কথা? দেখা অবধি সর্ব্বদাই যেন তাঁহার মধুর মূর্ত্তিখানি আমার হৃদয়ে জাগরূক হইতেছে। মনে হয় কখন্ আর একবার দর্শন পাইয়া জীবন ধন্য করিব!

ইতি তৃতীয় খণ্ড

চরিত সুধা

অর্থাৎ

শ্রীল শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের

জীবন-চরিত

শ্রীধাম নবদ্বীপ, "শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ" হইতে

শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত